ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেমস্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ

(১৩৩৪ ভাদ্র হইতে ১৩৩৫ শ্রাবণ)

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ— আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৷৷০ টাকা
ভিঃ পিতে ১৸৹ আনা।

জেলা হাওড়া, পোঃ আন্দুল-মৌড়ী
মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন" হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের
সম্পাদিত

কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৷৷০ দেড় টাকা

ভিঃ পিতে ১৸৵০ মাত্র।

ভক্তিকার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

"ভক্তি"

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

(২৬শ বর্ষ ১ম হইতে ১২শ সংখ্যা)

সূচীপত্র

(২৬শ বর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ)

আগামী বর্ষ হইতে ভক্তির কলেবর ও প্রবন্ধ নির্ব্বাচনাদির বিশেষ উৎকর্ষ করা হইবে। ভক্তগণ নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধব গণের মধ্যে ভক্তির বহুল প্রচার করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ভক্তি

ভাদ্র ১৩৩৪
শ্রীজন্মাষ্টমী

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

—————*—————

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

জগৎগুরো জগৎবন্ধো জগৎপিতা জগৎস্বামি!
জ্বালায় জ্বলে শীতল হ'তে তোমার পদে নমি আমি॥

হে সর্ব্ব-মঙ্গলাধার চিরশান্তিদাতা! তোমায় নমস্কার, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ তাপেই আমি সর্ব্বদা সন্তাপিত, বড় শীতল জানিয়া আজ তোমার ঐ রাতুলপদে শরণ লইলাম। তুমি কৃপা করিয়া ভক্তি ও শান্তি প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

তুমি সকলকেই যে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পিতা মাতা যেমন পুত্রের মঙ্গলের জন্যই স্বভাবানুসারে কাহাকেও মিষ্টবাক্যে, কাহাকেও বা কটুবাক্যে, কখনও লালন, কখনও পীড়ন করিয়া সৎপথে আনয়ন করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ সম্পদ ও বিপদ, শান্তি ও অশান্তির মধ্যদিয়া সকলকে মঙ্গলের পথেই লইয়া

যাইতেছ। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ তোমার এই চিরমঙ্গলময় ভাব আমি-বুঝিতে পারিলাম না। মোহ-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত হইতেছি, তথাপি চৈতন্যোদয় হইতেছে না। তুমি সর্ব্বশক্তিমান, দীনের প্রতি কৃপা করিয়া হৃদয়ে সাধন-শক্তি সঞ্চার করিয়া দাও এবং কৃপারজ্জু ধরিয়া তোমার দিকে টানিয়া লও—এমন ভাবে বিভোর করিয়া রাখ যে, যে ক'টা দিন সংসারে থাকিব, যেন তোমার হইয়া সংসারে থাকিয়া মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হই।

আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমার মত কাঙ্গালের সাধ্যমত উপকরণে "ভক্তি" ডালি সাজাইয়া তোমার উদ্দেশে দিয়া আসিতেছি, জানি না এ ডালি তোমার সেবার উপযুক্ত হইতেছে কি না। জানি বা না জানি, তোমার সাড়া পাই বা না পাই, যে কয়দিন সামর্থ রাখিবে, সে কয়দিন আমি এই ভাবে তোমার উদ্দেশে যাহাতে "ভক্তি" অর্পণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তুমি করুণাময়, তুমি শান্তিময়, তুমি সর্ব্ব-মঙ্গলাধার। এই ভজন সাধন বর্জ্জিত দীনহীনের প্রতি কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক মনোবাসনা পূর্ণ কর।

সহৃদয় পাঠকগণ! আজ বড়ই আনন্দের দিন। আজিকার এই শ্রীজন্মাষ্টমীর দিনেই কংসের কারাগারে সুদৃঢ় নিগড়-নিবদ্ধা দেবীপ্রতিমা শ্রীদেবকীর গর্ভাকাশে পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদয় হইয়া নিখিল সাধক-হৃদয়ের অন্ধতম নাশ করিয়া ছিলেন। আজ সেই দিন, যে দিনের যেপুণ্য আবির্ভাব-লীলায় শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু জর্জ্জরিত এই মর্ত্ত্যধামও অমরধামবাসী দেববৃন্দের সুখপ্রদ বিহারস্থান হইয়া ছিল। আজিকার এ শুভদিনে আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচরণে মস্তক লোটাইয়া বলি—

"কস্তুরীতিলকং ললাট পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণি ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥"

দীন— শ্রী—

শ্রীশ্রীজন্ম-লীলা

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত)

জনমযে ব্রজরাজ কুমার;
বহে প্রখর সমীর অনিবার।
ঘন বরিখে ঘন
গভীর গরজন
চঞ্চল সৌদামিনী সার।
নাচত ময়ূরী
গাওত শুক-সারী
ব্রজ বালক নাচে ঘুরি ঘুরি আর;
অচ্যুত—আনন্দ হেরি নন্দকুমার।

———

আত্ম-সমর্পণ

(শ্রীযুক্ত প্রভাকর চক্রবর্ত্তী কাব্যনিধি লিখিত)

জীবনের যত কাজ, শিরে তোলা যত বোঝা,
ঠেলিয়া ফেলিতে চাই, চাইযে দাঁড়াতে সোজা !
কই প্রভু দূরে যায়—মাথার পাষাণ-ভার।
নুয়ে পড়ে ক্লান্ত দেহ, নাহি কি উপায় আর ?
দিনে দিনে বাড়ে বোঝা, যাহা পাই তুলে লই।
বাসনা অনল জ্বালি, জ্বলে পুড়ে সারা হই ॥
কোথা প্রভু দয়াময়, তুলে লও সব ভার।
পায়ে রাখি শ্রান্ত মাথা, লভি শান্তি একবার !!

(২)

বিজনে নদীর ধারে, আমিই চলেছি একা।
চলে গেছে কত সাথী, পড়ে আছে পথরেখা ॥
অদূরে গরজে ওই, শ্বাপদ রিপুর দল।
কামনা-করিণী-মত্তা, ক'রে ওই কোলাহল ॥
সংযম-সায়ক * দিয়ে, বিঘ্ন সব কর দূর।
ভক্তির তড়িদালোকে, আলো কর হৃদিপুর ॥
ভাসাও জোয়ারে তরি, জাগাও বিবেক মাঝি !
প্রেমের তুফানে ভেসে, শুভযাত্রা করি আজি ॥
লইও ভিড়ায়ে তরি খেয়াশেষে পদতলে,—
জীবনের যত ভুল, ক্ষমা পাবে আঁখিজলে !!

—•—

* সংযম-সায়ক অর্থাৎ সংযমরূপ বাণ বা শর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা

(শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ বিশ্বাস লিখিত)

আমরা বিশেষজ্ঞগণের মুখে শুনিয়া থাকি, জ্ঞানীর ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। যোগীর পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বাহির জুড়িয়া আছেন, তিনি অন্তর্যামী পুরুষ। আর ঐশ্বর্য্য-মার্গের যিনি ভক্ত, তাঁহার ভগবান্ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ, লক্ষ্মী তাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেমিক ভক্তের ভগবান্ নিরাকার নহেন,তাঁহার নিত্য নব নব আকার আছে ; তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন, সবিশেষ,—ভক্তগণ তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী নহেন, একটী খাঁটি মানুষের মত সাবয়ব। তাঁহার হস্তও চারি খানি নহে, দুই খানি, তাহাতে লীলাপদ্ম থাকিতে পারে, কিন্তু শঙ্খ চক্র গদা যে নাই তাহা নিশ্চয়, তবে কুলনাশা সরলা বাঁশের বাঁশীটী যে আছে,তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই শ্রীভগবানের ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা গুপ্ত, তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত। তিনি বড় বাধ্য, বড় বশম্বদ, বড় রসিক। তিনি ভক্ত পিতার বাধা মাথায় বহিয়া থাকেন,—ভক্ত মাতার রজ্জুতে এই ননীচোরা স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়িয়া রহেন, ভক্ত সখা খেলায় জিতিয়া তাঁহার কাঁধে পর্য্যন্ত উঠিয়া লন, আর প্রিয়তমার শ্রীচরণ কমলে পতিত হইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন না। ভগবান যে এইরূপ হইতে পারেন বা এইরূপ একজন রসিক ভগবান আছেন, তাহা বসুধার মুকুটমণি স্বরূপ এই ভারতবর্ষেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কারণ এই পুণ্য-ভূমির মধুর বৃন্দাবনেই তিনি দ্বাপরের শেষে পরিকরগণের সহিত আবির্ভূত

হইয়াছিলেন। অন্যান্য জাতির নিকট এই স্বয়ং ভগবানের কথা উপন্যাসের মত একটা কিছু বোধ হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট ইহা সত্যের সত্য। যাহারা হাতে করিয়া তাঁহাকে সর-ননী খাওয়াইয়াছে, যাহাদের হাতে তিনি সত্য সত্যই নাচিয়া গিয়াছেন, তাহারা কেমন করিয়া সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ-গোপালের কথা উড়াইয়া দিবে? হিন্দুদের কিছু না থাকিলেও এক শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহাদের গৌরব অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সর্ব্বকারণ কারণ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—অনাদিরাদি-শ্রীগোবিন্দের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে হিন্দুর দ্বারে উপস্থিত না হইয়া কাহারও উপায় নাই। এই ভগবৎ রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিবার ভার জগতের মধ্যে এক মাত্র মহা ভাগ্যবান্ হিন্দুগণের উপরই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা যে দুর্ব্বোধ বাঁকা ঠাকুরের কথা আরম্ভ করিয়াছি, তিনি তাঁহার চির-প্রিয়তমা রাধা ঠাকুরাণীর সহিত নিত্যই নানাবিধ নূতন ও মধুর লীলা করিয়া থাকেন। এইসব লীলা তাঁহার বৃন্দাবনবাসের সময় প্রকটিত হইয়াছিল,—কিন্তু মানব সমাজে তিনি বিশেষরূপে প্রচার করিয়া যান নাই। এই রসিকশেখর অবশেষে মহা করুণায় সেদিন আমাদেরই নদীয়ায় রাধা ভাবকান্তি অঙ্গীকার করতঃ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলার দ্বার জগতের হাটে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই খুলিয়া দিয়াছেন,—তাঁহার করুণায় গুহ্যাদপি গুহ্যলীলা এখন মর্ত্ত্যবাসী মানব সমাজে বিশেষরূপেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রাকৃত চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও নশ্বর ব্যষ্টিদেহ এবং সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে যেরূপ অবিনশ্বর আত্মা নিত্য বর্ত্তমান আছেন, সেইরূপ এই দৃশ্যমান চরাচরের পশ্চাতে প্রকৃতির অতীত ভগবানের নিত্যধাম বিরাজমান আছে,—এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার নিজমুখে গীতাতে শুনিতে পাই—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা—১৫।৬

জ্যোতির্ম্ময় এবং বস্তু প্রকাশক বলিয়া যাহারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ, সেই সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নি যে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় স্থানকে প্রকাশ করিতে পারে না, এবং যেখানে গেলে আর এই মৃত্যুময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ;— তাহাই আমার পরম ধাম।

এই ধাম সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়,—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো-
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

যেস্থানে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ব্রজসুন্দরীগণ কান্তা, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত, বৃক্ষ সকল কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণস্বরূপা ও জল অমৃতময়। যে স্থলে কথা সমস্তই গান, গমনই নাট্য, বংশীই প্রিয়সখী, চিদানন্দ জ্যোতি এবং তাহাই নিত্য পরম আস্বাদ্য। যে স্থলে সুরভিগণের দুগ্ধভাণ্ড হইতে সুমহতী দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, যে স্থানে নিমেষার্দ্ধ পরিমিত সময়ও বৃথা অতীত হয় না, আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজনা করি। পৃথিবীতে কতিপয় বিরলপ্রচার সাধু যাহাকে "গোলোক" এই নামে অবগত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন, এতাদৃশ সাধুগণ পৃথিবীতে অতীব বিরল এবং দুর্লভ।

এই দিব্য চিন্তামণি ধামে—এই কামধেনুর রাজ্যে,—এই কল্পতরুর দেশে বাঞ্ছাকল্পতরু রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণতম শক্তি শ্রীরাধার

সহিত বিজড়িত হইয়া কল্পতরু-শাখাবদ্ধ রত্নহিন্দোলায়—ভক্তগণের হস্তে নিত্যই ঝুলিতে ঝুলিতে মধুর হইতে সুমধুর লীলামৃত রস বর্ষণ করিয়া থাকেন। নিত্য বৃন্দাবন ধামে—ক্রমান্বয়ে ছয় ঋতুর উদয় হইলেও, তাহারা প্রত্যহই শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত উদিত হইয়া থাকে, তাই লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—হর্ষ-বর্ষাগমে নিত্যই বর্ষার উদয় হইয়া থাকে, তথায় নিত্যই রাধাকৃষ্ণের ঝুলন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বর্ষা ঋতুতেই এই পরমানন্দপ্রদ লীলা বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

আমরা এই জগতে দেখিতে পাই, শোকে দুঃখে তাপে দুশ্চিন্তায় যাহারা জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের না আছে আমোদ প্রমোদ, না আছে নৃত্য গীতি,—তাহারা আনন্দ হইতে অনেক দূরে। কিন্তু সংসারের আবিলতা এবং কুটিলতা যাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, সেই সরল প্রাণ নির্ম্মল হৃদয়—বালক বালিকাগণ আমোদ প্রমোদ না হইলেই থাকিতে পারে না,—সময়ে অসময়েই তাহারা নাচিয়া গান করিয়া, কিম্বা ঐরূপ একটা কিছু করিয়া থাকে,—আনন্দময় তাহারা, সুযোগ পাইলেই একটু আনন্দ করিয়া লয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায়, শ্যামল প্রান্তরের বটবৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া "স্বস্তি" "স্বাগত" রবে রাখাল বালকগণকে আহ্বান করিতেছে। তাহারা—ধেনুগণকে ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছে। প্রিয়সখা রাখালরাজ ঝুলনে বসিল, রাখালগণ তাহাকে ঝুলাইতে ঝুলাইতে রসের গানে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দিল। তাহারা মাঠের রাখাল হইলেও,—ইংলণ্ডের অন্ধ বালকের মত বড় গলাতেই বলিতে পারে—"While thus I sing I am a King." প্রীতিরাজ্যের একটি নিয়ম এই,—যে যাহাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, সে-ই তাহাকে ঝুলাইতে চায়। মাতা তাহার সন্তানটিকে বড় ভালবাসে, তাই সে তাহাকে

আরামের দোলার উপর চড়াইয়া দোলায়, আর গুন্‌গুন্‌ রবে কতই না প্রীতিকর গান গাহিয়া থাকে।

একটু আনন্দময় হইলে কিম্বা একটু আনন্দের আভাস পাইলে প্রীত্যাভাসের সম্বন্ধ বশতঃই—প্রাকৃত নরনারী প্রিয়জনকে সুখের দোলায় ঝুলাইতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই ঝুলনই জগতে একরূপ দুর্লভ। আর হাড়-মাংসের সহিত যাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই,—যাঁহারা পরানন্দেরই দিব্য প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহাদের ঝুলনলীলা কিরূপ তাহা তাঁহারাই জানেন, আর আভাসে কিঞ্চিৎ জানেন তাঁহারা—যাঁহারা এই বহির্জগৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া লীলাস্মরণে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

তাপের গ্রীষ্ম চলিয়া গেল, রসের বর্ষা আসরে নামিল, নীরদ দৃষ্টি পথ জুড়িয়া বসিল, তাহার অকালে দামিনী হাসিয়া উঠিল, ময়ূর ময়ূরী নাচিতে নাচিতে ডাকিয়া উঠিল "কেও কেও"। শ্যামল বনে শ্যামসুন্দর গৌরাঙ্গী রাধার করকমল ধরিয়া—প্রিয় গোপীজনের হিন্দোলার উপর উপবেশন করিলেন, বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, সখীগণের করকমল চালনে জয় জয় ধ্বনির মধ্যে—প্রীতির হিন্দোলা অঘটন ঘটাইয়া ফেলিল,—ভূমির উপরই রসামৃতসিন্ধুর সৃষ্টি করিল।

এই রস বৃন্দাবনেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ঝুলন নাই—হইতেও পারে না। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাও একটি ক্ষুদ্র হিন্দোলায় উঠিয়া রসভঙ্গ করেন না। এই বন্য গোপ গোপীর লীলা-খেলায় বৈকুণ্ঠের নারায়ণও যোগদিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা দ্বারকা প্রভৃতি হাতী ঘোড়ার রাজধানীতেও কাব্য-কাননের এই মনোহর লীলা প্রকটিত করেন না। প্রীতির গহনবনে প্রেমময়ী বনবাসিনী রসিকা গোপীজনের দ্বারাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার এই হৃৎকর্ণরসায়ন রসের খেলা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

আমাদের ঘরের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের লীলারস অশেষ বিশেষে আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত বঙ্গীয় মহাজন কবিগণ—প্রেমভক্তির নেত্রে লীলা দর্শন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড দুর্লভ পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চক্ষু কর্ণ না থাকিলেও; শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইলে অন্ততঃপক্ষে সুদুর্লভ ঝুলনের একটু আভাসও দর্শন হইতে পারে।

তবে সংসারের সমুদয় কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া—বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া, আসুন সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, ক্ষণকালের জন্যও আমাদের বৃন্দাবনের পথ প্রদর্শক মহাজনবৃন্দের পশ্চাতে দাঁড়াই।

হর্ষ-বর্ষায় ঐ শুনুন উদ্ধবদাস কি বলিতেছেন—আষাঢ় গিয়াছে, শ্রাবণ আসিয়াছে, আর যমুনার তীর যেন সুখদান করিতেই উদ্যত হইয়াছে। এমন সুন্দর রাত্রি কি আর হইবে? সুধার চাঁদ আর রসের মেঘ ইহাকে সুখময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আবার মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ বহিতেছে, অধিক কি মূর্ত্তিমান সুখেরই যেন ইহাতে উদয় হইয়াছে;—

"আষাঢ় গত পুন মাহ শাওন, সুখদ যমুনা-তীর।
চাঁদনী রজনী সুখময় সুখোদয়, মন্দ মন্দ মলয় সমীর॥"

শূন্য সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছে, রসে রসে তরুগুলি সরস হইয়া প্রকৃষ্টরূপে ফুল্ল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঢল ঢল জলধর গগনে গর্জ্জন করিতেছে, দামিনী তাহার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া উঠিতেছে; উভয়ের প্রীতিসঙ্গমে যেন বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ হইতেছে—

"পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরু,
গগনহি গরজে গভীর।

ঘোর ঘটা ঘন,　　　দামিনী দমকত,
বিন্দু বিন্দু বরিখত নীর ॥"

এই সরস দৃশ্যের ভিতর আমরা এখন গোবিন্দদাসের সঙ্গে কিছুদূর চলিয়া দেখি—

"নবঘন কানন মোহনকুঞ্জ।"

কুঞ্জ তরুতে ফুল ফুটিয়াছে; আর সেই সব ফোটা-ফুলে অলি কুল মধুর রস আস্বাদন করিবার জন্য গুন্ গুন্ করিতেছে—

"বিকসিত কুসুম মধুকরগুঞ্জ ॥"

এই শোভন কুঞ্জে বিরস বা নীরস কিছুই নাই। যেমন নবীন তরু, তেমন তাহার কচি কচি ডালগুলি, সেইসব ডালে একটীও প্রাচীন বা শুষ্ক পত্র নাই,—নব নব পল্লবগুলি কিবা শোভার বিস্তার করিয়াছে—

"নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।"

তাহাতে কাকজাতীয় কোন কটুভাষীর সাড়া শব্দ নাই! যাহারা রসবর্ষণ করিতে সিদ্ধকণ্ঠ, সেইসব শারী শুক কোকিলগুলি কেবল রসের গানেরই চরাচর মুখরিত করিতেছে—

"শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥"

যাহার ফুলে বসিয়া মধুকর গুন্ গুন্ করিতেছে, যাহার পল্লবে শারী শুক পিক রসের উপর রসবর্ষণ করিতেছে,—সেই ললিত ডালে ঝুলিতেছে কি দেখিয়াছেন? ঐ যে প্রাণ মন আন্দোলনকারী বড় অপরূপ হিন্দোলা! ইহা সাধারণ হাটবাজারের দোলনা নহে, অনন্য-সাধারণ যত্নে যে অমূল্য রত্ন মিলে, এ সেই তাহারই হিন্দোলা।

"তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল!"

ঐ "রতন-হিন্দোলা"য়—বসিলেন কাহারা দেখিতেছেন? যাঁহাদের অলৌকিক 'রূপ-লাবণ্যের এক কণিকায় ত্রিলোক পাগল হয়, যাঁহারা

না বালক বালিকা,—না যুবক যুবতী। যাঁহারা অনন্ত কাল ধরিয়া—নিত্য কিশোর-কিশোরীরূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পূর্ণশক্তি শ্রীরাধিকা প্রিয়তম প্রাণাধিক ভক্তগণের বহু যতনের রতন-হিন্দোলায়—মধুর মধুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন—

"তা'পর বৈঠলি কিশোরী কিশোর ॥"

আর দেরী নাই, ঝুলন আরম্ভ হইল—ঐ দেখুন,—যাঁহাদের সিদ্ধহস্তে আদিপুরুষ এবং আদিপ্রকৃতি চিরদিন ঝুলিয়া থাকেন, সেই নিত্যসিদ্ধা ব্রজরমণীগণ কতই না রঙ্গে ভঙ্গে জীবনের জীবন কিশোর কিশোরীকে ঝুলনায় দোল দিতেছেন—

"ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর।'

প্রীতি-রাজ্যের এই ঝুলনদৃশ্য দর্শন করিয়া—আমাদের অগ্রবর্ত্তী কবি শিবরাম কি বলিতেছেন সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। গগনের যে চাঁদ নিখিল নর-নারীকে পাগল করিয়া থাকে, অগণন তারাগণের সহিত সে আজ বৃন্দারণ্যের যুগল চাঁদকে দেখিয়া পাগল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সকলেই আনন্দে আত্মহারা।

গগনহিঁ মগন মগন রজনীকর
আনন্দ করত নেহারি ॥

কোমল-হৃদয় বারিদগুলি আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে? ভাবে তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইল, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া—গর্জ্জন করিতে করিতে ঝুলনের দৃশ্যস্থলটী ঘিরিয়া ফেলিল। আর কি তাহারা প্রেমময় প্রেমময়ীর ঝুলন দর্শনে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? তাই তাহাদের প্রেমাশ্রুবিন্দুপাত আরম্ভ হইল—

"বারিদ গরজি সব ঘেরল
বুন্দু বুন্দু করু পাতা"

হিন্দোলার আন্দোলনে মলয় সমীরণ ছুটিয়া আসিল, সে যেন রুদ্ধশ্বাসেই দুইজনের উপর মৃদু মৃদু বহিয়া সেবা করিতে লাগিল—

"কহ শিবরাম মলয় চলু দুহুঁ পর
মৃদু মৃদু করতঁহি বাত ॥"

আমরা এখন কবি জগন্নাথের চক্ষুতে চক্ষু দিয়া দেখিতেছি, আত্মহারা সখীগণের আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই,—তাহারা আনন্দে করতালি দিয়া কেবল যুগলকে ঝুলাইতেছে—

"ঝুলায়ত সখীগণ করতালি দিয়া।"

ঝুলনে প্রেমময়ীর নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই,—ভয় তাহার পরাণ বঁধুয়ার জন্য, পাছে বা সে পড়িয়া যায়, তাই—

"সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া" ॥

ঝুলন যে চরমে উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই,—দুই জনেরই বসন খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, বিশেষ শ্রমের নিদর্শনস্বরূপ স্বেদবিন্দু দুই জনের শ্রীঅঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মুখচন্দ্রে তাহা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। কে বলে এ স্বেদবিন্দু ?—এ যে অমিয় ঝরিয়া পড়িতেছে,—

"বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদবিন্দু।
অমিয়—ঝরয়ে যেন দুহু মুখ-ইন্দু ॥"

সখীগণের আত্মসুখ নাই, যুগলের সুখেই সুখ। দুইজনের শ্রম দেখিয়া দরদিনীগণের বড় দরদ হইল;—ঝুলাইতে তাঁহাদের আনন্দ হইলেও আর তাঁহাদের হাত সরিল না, তাঁহারা তখন শ্রম দূরীকরণ মানসে চামর হস্তে প্রীতিসেবা করিতে লাগিলেন—

"হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম,
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন ॥"

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রেমসেবা দর্শন করিয়া—ভক্ত ভ্রমর উতলা হইয়া পড়িল, ভক্ত কোকিল গলা ছাড়িয়া দিল, তাহাদের মর্ম্মস্থল হইতে গগন পবন ভেদ করিয়া "জয় রাধাকৃষ্ণ জয় রাধাকৃষ্ণ" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—

"ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥"

ইহার চেয়ে শুভ দর্শন এবং শুভ শ্রবণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার "দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণের চরণার বিন্দে॥" আমার এমন শুভদিন কবে হবে, যে দিন নয়ন ভরিয়া সখীগণ-বেষ্টিত দুইজনকে বৃন্দাবিপিনে দর্শন করিব।

"কহে জগন্নাথ কবে হব শুভ দিনে।
সখী সঙ্গ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥"

এই যুগল সেবা-দর্শনে বৈষ্ণবদাসের অধিকার, আমরা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সখীগণের মধ্যে দুইজনকে একটু দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। নৃত্য কীর্ত্তনে, হাসাহাসি ভাসাভাসিতে, করাকরি ধরা-ধরিতে ঝুলন থামিল। তখন—

"ঝুলনা হইতে, নামিলা ত্বরিতে,
রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে,
রতন মন্দির মাঝ॥"

সেবাপরায়ণা সখীগণের চামর বীজন চলিতে লাগিল,—কেহ সুবাসিত জলে, মুখ দুখানি ধৌত করিয়া নিজের বসন দিয়া মুছাইতে লাগিল—আর ছল ছল লোচনে চাহিয়া রহিল—

"সুচামর লই, বীজন বীজই,
সেবাপরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে,
বসনে মোছাঞা দেখি ॥"

কেহ কেহ প্রীতির থালায় প্রীতির মেঠাই লইয়া সম্মুখে ধরিল—

"থারি ভরি কোই, বিবিধ মেঠাই,
ধরি দুহুঁ সনমুখে।"

আনন্দ-ভোজন শেষ হইতে না হইতেই—তাম্বুল-সেবিকাগণ রসের তাম্বুল লইয়া উপস্থিত,—নিজ হাতে তুলিতে শ্রম হইবে, তাই তাহারা নিজেরাই বদনের ভিতর তুলিয়া দিল—

"তাম্বুল সাজাঞা, কোন সখী লঞা,
দোঁহার বদনে দিল।"

অন্যদিকে শয়ন মন্দিরে পীরিতির পালঙ্কে—কুসুমশয্যা পাতা শেষ, ধীরে ধীরে রাধাশ্যাম তাহার উপর গিয়া বসিলেন—

"কুসুম তলপে, অলপে অলপে,
বসিলা রাধিকা শ্যাম।"

বহু ঝুলনে শ্রম হইয়াছে, শ্রমের পর আবার—প্রীতির ভোজন কম হয় নাই, তারপর চামর চলিতেছে, গন্ধবর্ষণ হইতেছে,—তাই—যুগল চক্ষু রসালসে ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া আসিল,—রাধামাধবের এই সম্মিলন দর্শনে—অন্যের কথা দূরে থাক, যে কাম নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর মোহ বিস্তার করিয়া থাকে, সেই কামও মোহিত হইয়া পড়িল—

"অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত,
হেরিয়া মোহিত কাম ॥"

বিশেষরসজ্ঞা সখীগণ তখন রাধা মদনমোহনকে—ফুলশয্যায় শয়ন করাইলেন—

"দেখি সখীগণে, কতই যতনে,
শুতায়ল দুহুঁ তায়।"

বৈষ্ণবদাসের প্রতি গুরুরূপা সখীর ইঙ্গিত হইল,—সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া—যুগলচাঁদের চরণ-সেবা করিবার জন্য মনোরথে চাপিয়া বেগে ধাবিত হইল—

"সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে,
এ দাস বৈষ্ণব ধায়॥"

জীবের সৌভাগ্য ইহার উপর আর কি হইতে পারে? আমরা এখন উপসংহারে মনোহর দাসের সিদ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া—ব্রহ্মাণ্ডভেদী জয়ধ্বনি তুলিয়া বলি—

"জয় রাধে শ্রীরাধে জয় জয় রাধে গোবিন্দ রাধে।
ঠাকুর হামারি নন্দকি লালা ঠাকুরাণী শ্রীমতী রাধে॥"

নববর্ষে প্রার্থনা

(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী লিখিত)

কোথা ভক্তবৃন্দ এ নব বরষে সকলে মিলিয়া এস হে,
হরি হরি বলি' সকলের পায়ে মস্তক নোয়ায়ে দিব হে।

---

* শ্রীজন্মাষ্টমী স্থানাভাবে এবার প্রকাশ হইল না আগামী মাসে প্রকাশ হইবে। (সঃ)

নাহিক ভকতি নাহি জানি স্তুতি দুর্ম্মতি অতি অভাজন,
আমার সাধন আমার ভজন তোমাদেরই ঐ শ্রীচরণ।
শুন নিবেদন অনাথ শরণ! আমি নাহি চাহি অন্য ধন,
(শুধু) এই আকিঞ্চন, থাকি যেন সদা 'ভক্তি'তে নিমগন।
ভকত বৎসল! অগতির গতি! কাতরে করি এ মিনতি,
সম্পদে বিপদে প্রতি পদে যেন 'ভক্তি'তে রহে মতি।
(যেন) অনিত্য বিষয়ে কাটে না কাল নববর্ষে এই প্রার্থনা,
ভক্তিভরে যেন বলি হরি হরি কুপথেতে মন যায় না।

আর নিবেদন—

প্রণতি দীনের এ নব বর্ষে
আর নিবেদন চরণে।
(দাসের) সকল সময়ে সকল করমে
চাহিও করুণা-নয়নে॥
নিদ্রা আলস্য অসার গল্পে
(যেন) যায় না বর্ষ চলিয়া।
(যেন) তব প্রিয় নাম জপি অবিরাম
সকল কুসঙ্গ ছাড়িয়া॥
নব বরষের ভক্তিভাব সহ
বারম্বার করি বন্দনা।
নাম-তত্ত্বে মোরে কর সমাহিত
বিতরি অপার করুণা॥

———

ভক্ত ধনুর্দ্দাস

(অবধূত শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা লিখিত)

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন কর্ত্তা শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের শিষ্যবর্গের মধ্যে ধনুর্দ্দাস তাঁহার একজন বিশেষ কৃপাপাত্র। ধনুর্দ্দাসের জ্ঞান বৈরাগ্যের নিদর্শন প্রশংসনীয়। তাঁহার অনাসক্তি, তাঁহার গুরুভক্তি, তাঁহার ভগবানে নির্ভর, তাঁহার অবিচলনীয় বিশ্বাস সাধন-জগতে অনুকরণীয়।

একবার শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। শত সহস্র যাত্রী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে দর্শন করিবার জন্য গরুড়স্কন্ধে উদগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান। সকলেরই দৃষ্টি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের দর্শন জন্ম ব্যাকুল। কেহ কাহারও দিকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না, কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে না। সকলেই একমাত্র ভগবদ্দর্শনের জন্য অনন্যমনে দণ্ডায়মান। কতক্ষণে শ্রীবিগ্রহ মন্দির হইতে বাহির হইবেন, সেইজন্য সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিপুল জনতা। লোকে লোকারণ্য, বাদরের জলস্রোতের মত জনস্রোত মন্দিরাভিমুখে বহমান। গরুড়োৎসবের বিরাট জনসঙ্ঘ কেবল দর্শনীয়, বর্ণনীয় নহে।

এই সুবিপুল জনতার মধ্য দিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একজন দীর্ঘাকৃতি মহাবলশালী পুরুষ, এক পরমাসুন্দরী যুবতীর মস্তকে, একটি সুসজ্জিত বৃহৎ ছত্র ধারণ করিয়া সুবিপুল জনতার মধ্য দিয়া, গরুড়স্তম্ভের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যুবতীর অঙ্গে বহু মূল্যবান বসন ভূষণ। পুরুষটী এক মনে এক ধেয়ানে যুবতীর মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছে। লোকের উপহাসের দিকে তাহার

লক্ষ্য নাই—শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের প্রতিও লক্ষ্য নাই,—আত্ম সম্মানের প্রতিতো লক্ষ্য নাই-ই—সুবিপুল জনতার সৌন্দর্য্যেও তার ভ্রুক্ষেপ নাই;—লক্ষ্য কেবল যুবতীর বদন মাধুরিমায়; লক্ষ্য কেবল যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আর বিভোর কেবল যুবতীর তুষ্টি সাধনে। পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐ যুবতীর নাম হেমাম্বা আর ঐ পুরুষটীর নাম ধনুর্দ্দাস।

ধনুর্দ্দাস, যত জনতার মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার প্রতি বিপুল জনতার দৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। নানাজনে নানারূপ কটাক্ষ করিতে লাগিল। নানারূপ নিন্দা নানারূপ সমালোচনা উত্থিত হইতে লাগিল। ধনুর্দ্দাস এক ভাবেই চলিতে লাগিল। তাহার মন প্রাণ বুদ্ধি বিবেচনা একমাত্র যুবতীর অঙ্গ-সঙ্গে সমর্পিত। তার ভাবে সে বিভোর;—তার মোহে সে মাতোয়াল।

হেমাম্বা ধনুর্দ্দাসের বিবাহিতা পত্নী নহে; তাহার প্রেমিকা। ধনুর্দ্দাস যেমন হেমাম্বার মোহে উন্মত্ত, হেমাম্বাও তেমন ধনুর্দ্দাসের অনুগতা। ক্রমে এই সংবাদ রামানুজের নিকটে পৌছিল। রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এইরূপ লজ্জাজনক ভাবে ঐ যুবতীর সঙ্গে জনসঙ্ঘের মধ্যে চলিতেছ কেন?

ধনুর্দ্দাস বলিল, ইহা লজ্জাজনক কি প্রশংসাজনক, তাহা চিন্তা করিতে আমার অবসর নাই। আমি ঐ মুখ খানির মত মুখ আর দেখিতে পাই না। স্বর্গ মর্ত্ত অন্বেষণ করিয়াও ঐ রূপের তুলনা পাই না। আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ,—সরোবরের ফুটন্ত কমল,—ঐ সৌন্দর্য্যের নিকটে আমার বিচারে দাঁড়াইতে পারে না। আমি উহার কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনি অপেক্ষাও মধুর শুনি;—উহার প্রেমের নিকটে সাগর মন্থনের সুধাকেও আমি উপেক্ষা করি। উহা রূপের মূর্ত্তি,—প্রেমের প্রতিমা,—এবং গুণের সমুদ্র। তাই আমি বিশ্ব ভুলিয়া উহাকেই জীবনের লক্ষ্যভূত করিয়াছি।

রামানুজ একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি তোমাকে হেমাম্বা অপেক্ষা সুন্দরী দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি উহাকে ত্যাগ করিতে পার?

ধনুর্দ্দাস বলিল—হেমাম্বা অপেক্ষা সুন্দরী সংসারে অসম্ভব!

রামানুজ। সম্ভব অসম্ভব আমি বুঝিব। যদি দেখাইতে পারি, তুমি হেমাম্বাকে ছাড়িতে পার কি না?

ধনুর্দ্দাস—ছাড়িতে পারি কি না, তাহা না দেখিলে বলিতে পারি না। যদি হেমাম্বার চেয়ে সুন্দরী পাই, তবে ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি।

রামানুজ বলিলেন, আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করিও। আমি তোমাকে একটী সৌন্দর্য্য দেখাইব।

সন্ধ্যা আসিল, শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে আরতির বাদ্যোৎসব আরম্ভ হইল। ধনুর্দ্দাস হেমাম্বাকে সঙ্গে করিয়া রামানুজের নিকটে গমন করিল। সকলে আরতির সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন? আজ মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কারে সাজান হইয়াছে। মণিমুক্তা-বিজড়িত সুবর্ণালঙ্কারের উপর আলোক বর্ত্তিকার কিরণ পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সে রূপের সিন্ধু দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে।

রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে বলিলেন, "দেখ দেখি ঐ সৌন্দর্য্য হেমাম্বার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না? ঐ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলে হেমাম্বাকে তুমি ভুলিতে পার কি না?" ধনুর্দ্দাস ধীর নয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিল। রামানুজের কৃপা সে বহুক্ষণ হইতেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। তাহার দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল;—দিব্য ভাবের অভিব্যক্তি হইল। সে ঐ ত্রিলোকমোহন সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইতে প্রস্তুত হইল। হেমাম্বা তাহার সাধনার সঙ্গিনী হইল। রামানুজ উভয়ের পথপ্রদর্শক গুরু হইলেন। উভয়ে উপদেশমত সাধনায় উপবেশন করিল।

রামানুজের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতেন তাঁহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি বলা হইত। ধনুর্দ্দাস শূদ্র ছিলেন। রামানুজ প্রত্যহ স্নান করিয়া আসিবার সময় ধনুর্দ্দাসের হাত ধরিয়া সখ্যভাবে গৃহে আসিতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শূদ্র ধনুর্দ্দাসকে স্নানান্তে হাত ধরিয়া গমন অপবিত্রকর। সিংহাসনাধিপতি-গণকে ইহাতে হতমান করা হয়। রামানুজ সকলের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিলেন। সিংহাসনাধিপতিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে মনস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের গৃহে এক দিন রাত্রিকালে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যগণ তখন নিদ্রিত। তাঁহাদের পরিধেয় বসন দড়ীর উপরে ঝুলিতেছিল তিনি প্রত্যেকের বসনের কোণ হইতে কৌপিন পরিমিত বসন কাটিয়া লইলেন। বাহির হইবার সময় ইহার বসনের ফালি উহার শিয়রে, উহার বসনের ফালি তাহার শিয়রে রাখিয়া দিলেন। প্রভাত হইলে সিংহাসনাধিপতি শিষ্যগণ জাগ্রত হইলেন। নিজ নিজ বসনের কোণা কাটা দেখিয়া সকলে ক্রোধে অধীর হইলেন; নিজেরা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিলেন। পরস্পর মারামারি করিতে উদ্যত হইয়া রোখারুখি করিতে লাগিলেন। রামানুজ নীরবে সমস্ত দেখিলেন ও শুনিলেন। শেষে অনেক বলিয়া কহিয়া সকলকে শান্ত করিলেন

দুই চারি দিন গত হইল। ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ধনুর্দ্দাস প্রত্যহ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রামানুজের নিকটে থাকেন। সন্ধ্যার পর গৃহে গমন করেন। একদিন রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে কৌশল করিয়া সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিলেন। এবং চারি পাঁচটি ছাত্রকে হেমাম্বার অলঙ্কার চুরি করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

হেমাম্বা তখন আপন গৃহে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, জপ করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, ধনুর্দ্দাস কতক্ষণে আসিবে। এমন

সময় রামানুজের ছাত্রগণ চুপে চুপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। হেমাম্বা সকলকেই চিনিত, সে চমৎকৃতা হইল। হঠাৎ ছাত্রগণের আগমনে সে ভাবনায় পড়িল। সিংহাসনাধিপতিগণ তাহার নির্জ্জন কক্ষে কেন আসিলেন! সে নিদ্রিতের মত পড়িয়া রহিল। এবং ছাত্রগণ কি করেন তাহা দেখিতে লাগিল।

ছাত্রগণ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং অতি সাবধানে অলঙ্কার খুলিতে লাগিলেন। হেমাম্বা তখন বুঝিল, তাঁহারা কোন অভাবে পড়িয়াই অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছেন। একে ব্রাহ্মণ, তার উপর প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুদেবের ছাত্র. তাহাদের অভাব, হেমাম্বা বাম পার্শ্বে শুইয়া ছিল। তাহার দক্ষিণপার্শ্ব উপরে ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের সমস্ত অলঙ্কার ছাত্রগণ খুলিয়া লইলেন। হেমাম্বা তখন বাম পার্শ্বের অলঙ্কার খুলিবার সুবিধার জন্য পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। যেন ঘুমাবেশেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। ছাত্রগণ ভাবিল, "যা রে! ঘুম ত ভাঙ্গিয়াছে!" তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। অলঙ্কার লইয়া রামানুজের নিকটে উপস্থিত হইল। রামানুজ অলঙ্কার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ধনুর্দ্দাসকে গৃহে যাইতে বলিলেন।

ধনুর্দ্দাস গৃহে গমন করিল। রামানুজ তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ শিষ্য সঙ্গে করিয়া ধনুর্দ্দাসের গৃহের বাহিরে, সংগোপনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমাম্বার বহু মুল্যবান অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় ধনুর্দ্দাস কিরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্যই সকলের এইরূপ গোপনানুসন্ধান।

ধনুর্দ্দাস গৃহে আসিয়া দেখিল হেমাম্বার অর্দ্ধেক গায় গহনা নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হেমাম্বা সমস্ত বলিল এবং অবশিষ্ট অলঙ্কার না লইয়া যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্দাসও বলিতে লাগিল, "তুমি কেন পাশ ফিরিতে গেলে? যদি পাশ ফিরিতে না যাইতে

নিশ্চয়ই তাঁহারা তোমার সমস্ত অলঙ্কার নিতে পারিতেন। না জানি তাঁহারা কোন্ অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে বাহির হইয়াছেন। দেবদেব রঙ্গনাথের কৃপায় আমাদের কোন অভাব নাই। আর বৃথা অলঙ্কারের ভার বহিয়া আমাদের প্রয়োজন কি? এক কর্ম্ম কর, কাল প্রভাতে উঠিয়া সমস্ত অলঙ্কার তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়া আসিও।” হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাস উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল।

তখন রামানুজ আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, “এই তোমাদের ধনুর্দ্দাস্! তোমাদের সামান্য সুতার কাপড়ের এক বিঘৎ কোণা কাটায় তোমরা শৃগাল কুকুরের মত ঝগড়া করিয়াছিলে। ইতর ছোটলোকের মত মারামারি করিতে কোমর বান্ধিয়াছিলে। আর ধনুর্দ্দাস ও হেমাম্বার বহুমূল্য মণি কাঞ্চনের অলঙ্কার তোমরা চুরি করায় তাহার দয়া ও বৈরাগ্যের উক্তি শ্রবণ কর। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কি ধনুর্দ্দাস ব্রাহ্মণ একবার চিন্তা কর। কাহার পায়ে কে প্রণাম করিবে, একবার বিচার কর। কে কত পবিত্র হৃদয়, আমি স্নানান্তে কাহার হাত ধরিলে পবিত্র হইতে পারি, একবার অনুভব কর। জগৎ গুণের পূজা করে, শক্তির পূজা করে। যে যত গুণবান, যে যত বৈরাগী, ত্যাগী ও ভক্তিমান, সে-ই তত শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র। মানুষ কোন নির্দ্দিষ্ট কুলে জন্মিলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। ভগবান ভক্তের ঠাকুর;—জ্ঞান বৈরাগ্যের পুরস্কার দাতা। জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির এমনই কিছু মহিমা যে, জগৎ বিমুগ্ধ হয়। তোমরা অহঙ্কার ভুলিয়া স্বভাবের পরিবর্ত্তন কর, পূজ্য হইবে, মান্য হইবে, আদর্শ হইবে, হৃদয়ে নিত্যানন্দ জাগ্রত হইবে।”

তারপর হেমাম্বাকে বলিলেন, “আমি পরীক্ষা করিবার জন্য তোমার অলঙ্কারগুলি নিয়াছিলাম। এই সে সকল গ্রহণ কর, তোমার অঙ্গেই অলঙ্কার শোভা পায়।”

তখন সিংহাসনাধিপতিগণ লজ্জিত হইল, শিক্ষা লাভ করিল। আর মনে মনে বলিতে লাগিল—"গুণেরই সমাদর ; শক্তিরই অর্চ্চনা।"

গান

(শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার পাল লিখিত)

হরি! আমি যে তোমায় ভালবেসেছি।
ঠিক সরল শিশুর মত, সরল হাসির মত
আমি যে তোমায় ভালবেসেছি॥
কি হবে জ্ঞানে—কি হবে কর্ম্মে, চাহি না তো যেতে সে সব মার্গে,
আমি, সারা দেহভরি ল'য়েছি ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম বড় গো ভার যে,
আমি, আঁধারে ভক্তি পেয়েছি বলিয়া সুখ-স্রোতে আজ ভেসেছি॥
ব্যাস আদির ব্রহ্মভাব হৃদয় মাঝারে ধরিয়া
আমি তো, চাহি না থাকিতে ধরায় ওগো সকলের পিছে পড়িয়া ;
আমি, আপনার মনে আপনার প্রাণে গাহিতে-গাহিতে তোমারি গান,
ভকতির বলে বিকাইব তব রাতুল চরণে ভগবান,
ত্রিবেণী তোমার চরণতীর্থে ত্রিদিবে করিব বলিয়া স্নান,
সব আশা ছেড়ে তোমার সেবিকা ভক্তির প্রতি চেয়েছি॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এ সব করি না কামনা,
"শুধুই আমার হইবে তুমি"—এইটী প্রাণের বাসনা—
এমন করিয়া তোমায় দিতে ভক্তি ছাড়া গো আমার করে,
আর কে গো পারে এ ঘোর আঁধারে সংসার-কারা-উপরে,
আপনার ক'রে দিতে পারে তোমা শুধুই ভক্তি অমরে-নরে,
তাই তো আজিকে সকল ত্যজিয়া ভক্তির-অভয়-কর ধরেছি॥

ভক্তি ও প্রেম

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

অনেকে ভক্তিকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে বৈচিত্র্যময় বিশ্বের অন্তর্গত পরস্পর বিভিন্ন প্রত্যেক ব্যষ্টির যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ—সাধারণতঃ তাহাকেই বুঝায়। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম শব্দের অর্থ হইতে 'এই বিচিত্র বিশ্বকে যাহা ধারণ করিয়া আছে' এই ভাবটিও পাওয়া যায়। কে এই বিচিত্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে? ইহার একমাত্র উত্তর,—নিরপেক্ষ উত্তর, এই বিশ্বকেন্দ্র স্থিত আকর্ষণ শক্তি! উহাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সাধকের নিকট পরিচিত। বিশ্বকেন্দ্র এবং প্রকাশিত বিশ্বের বিভিন্ন ব্যষ্টি, ইহাদের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই ওই শক্তি,—সচ্চিদানন্দ শক্তি; উহা মহাভাবরূপা। উহা পাইবার যে উপায় বা সাধনা তাহারই নাম ভক্তি। ওই শক্তির অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ দুইটি অবস্থা আছে; অন্তর্মুখে সচ্চিদানন্দময়ী, এবং বহির্মুখে জগৎপ্রসবিনী মহামায়া। সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি কেমন? ইহার উত্তরে অপৌরুষেয় বেদ বলেন,—

"আনীদবাতং স্বধয়া তাদকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস।"

অর্থাৎ, পূর্ব্বে স্বধাসহ এমন একটী প্রাণ বর্ত্তমান যাহা অবাত প্রাণিত অর্থাৎ আমাদের মত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আপন সত্তাকে মূর্ত্ত করে না, এতদ্ব্যতীত আর কিছু নাই! ওই স্বধা বা আপনাকে প্রকাশ

অথবা ধারণ করিবার শক্তিই সচ্চিদানন্দময়ী। প্রণবে এই যুগল সত্তারই সূক্ষ্ম বিকাশ!

"সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ॥" (চৈঃ চঃ)

ওই যে যুগলতত্ত্ব, উহা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-বর্জ্জিত। আবার বিশ্ব-বিকাশ মুখে বা বহির্মুখে ওই সত্তাই পিতৃত্ব মাতৃত্ব মণ্ডিত হইয়া পরস্পর বিভিন্ন হইয়া জগৎপিতা ও জগন্মাতা রূপে প্রকাশ হয়। তত্ত্বের এই দুইটী ভাব আশ্রয় করিয়া একই উপায় ভক্তি প্রধান দুই ভাবে প্রকাশমান। একভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, অপর ভাবে শাক্ত সম্প্রদায় সাধনা করেন। কিন্তু উভয়েরই গমন ভক্তি পথে। সুতরাং ভক্তি কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে; ইহা উপায় মাত্র,—এবং বিশ্বজনীন উপায়। ভক্তি পথে সাম্প্রদায়িকতা নাই,—থাকিতে পারেও না।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই যে ভক্তি-পথের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ইহাই সার্ব্বজনীন পথ, কোন সম্প্রদায় বিশেষের পথ নহে। এই পথে চলিয়া যাহা লাভ হয়, উহাই ধর্ম্ম,—প্রেমই ধর্ম্ম।

বিশ্বের বিশিষ্টতাই বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ। এই বিভিন্নতার মাঝখানে আমি একমাত্র প্রেমকেই ধর্ম্ম বলিলে, বিভিন্নতায় অনুপ্রাণিত বিশ্বাসী মানব অবশ্যই আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবেন। কারণ প্রত্যক্ষ্যভাবে কেহই এই একমাত্র বিশ্ব-ধরিতৃ প্রেমকে বহির্মুখে দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহাদের নিকট এমন একটা অসম্ভব-প্রায় (সত্য করিয়া অসম্ভব নহে) কথা বলিলে, যদি কেহ আমাকে আক্রমণ

করেন, তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভব বলিয়া আমার তাহাতে অভিযোগের কোন কারণ নাই। কিন্তু ওই ভয়ে এই অনুভূত সত্যকে গোপন করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। তাই আজ উচ্চরবে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'ভাই বিশ্ববাসী, বিশ্বে একটি মাত্র ধর্ম্মই আছে,—এবং উহা প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা বিভিন্ন হইয়া ওই একমাত্র ধর্ম্ম প্রেমকে বিভিন্ন সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত বোধে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত করিলেও, প্রেমই একমাত্র ধর্ম্ম, ইহাই সত্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বকেন্দ্রের সহিত বিশ্বের যে এক সম্বন্ধ, উহা বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ এই দুই পথে প্রকাশিত; একটি বহির্মুখ পথ—যে পথে বিশ্বের বহুত্বের প্রকাশ, এবং অপরটি অন্তর্মুখ পথ—যে পথে বিশ্বের বহুত্ব সেই একমাত্র কেন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই সত্ত্বায় সত্ত্বাবান। একটি বিরহ, বিয়োগ বা বিপ্রলম্ভ রস, অপরটি মিলন, যোগ বা সম্ভোগ রস। উভয়েই কিন্তু রস,—উভয়েই প্রেম। উহাতেই বিশ্বের প্রকাশ, উহাতেই বিশ্বের বর্ত্তমানতা, আবার উহাতেই বিশ্বের শেষ গতি। বিশ্বকেন্দ্রই শ্রীবিশ্বনাথ, যিনি নিয়ত আপন শক্তি এই প্রেমে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন! তাই তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলি। এই কৃষ্ণ প্রেমযুক্ত—তুরীয় যুগল—শ্রীরাধাগোবিন্দ! বিকর্ষণ পথে এই যুগলই বিভিন্ন হইয়া বিশ্ব-প্রকাশ মূল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-মণ্ডিত বিশ্বপিতা-বিশ্বমাতা! বিশ্বপিতা বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়ার ভিতর দিয়া আপনার বহুত্ব বিশ্বে ঢালিয়া দিয়া—আপন ভাব হারাইয়া অভাবগ্রস্ত, তাই ভিখারী! এখন প্রকৃত (পুরুষ) প্রকৃতিতে স্থিত, সত্য প্রেমের (বিকর্ষণ শক্তির) ভিতর দিয়া বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান, এবং প্রেমেই (আকর্ষণেই) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই বিশ্বরহস্য! তবে কি এখন আর তুরীয় যুগল নাই? পাঠক ভাই, এ সন্দেহ করিবেন না। এ বিশ্ব তাহার একাংশ মাত্র,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন

মেকাংশেন স্থিতো জগৎ”,—অবশিষ্টাংশ এখনও তুরীয় যুগল রূপে,—শ্রীরাধা-গোবিন্দরূপে আছেন! আপনাদের কৃপা পাইলে, আপনাদের শুনিবার ইচ্ছাই আপনাদের করুণা,—সেই কৃপা পাইলে, এই অধম লেখক রূপ গ্রামোফোন-রেকর্ডে যে স্বরগ্রামরূপ সত্য নিহিত আছে তাহা লীলাময় শ্রীবিশ্বনাথ বাজাইয়া আপনাদিগকে শুনাইবেন! ইহাতে লেখকের কোন কৃতিত্ব নাই! আপনাদের চাওয়া এবং লীলাময়ের দেওয়া এই দুইয়ে মিলিয়া প্রাপ্তি সম্পূর্ণ বা সফল হইবে। তিনি নিয়তই দিতেছেন, কিন্তু আমরা চাই না বলিয়া পাইয়াও পাই না!

জগতে আমরা তৃষ্ণাকুল হইয়া কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি না কোথায় এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি; অভাবও মিটিতেছে না,—ভিক্ষা করাও ঘুচিতেছে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিরূপে সেই অভাববোধ স্থূলে অভিব্যক্ত। এই অভাবের তাড়নায় যেখানে ভক্ষ্য-পেয়াদির সংস্থান দেখিতেছি সেই ধনী সকলের দ্বারে দ্বারে প্রত্যহই ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইতেছি। কোনদিন পর্য্যাপ্ত মিলে, কোনদিন অল্প মিলে, কোনদিন বা মিলেই না। যে ধন রূপ ভক্ষ্য-পেয়াদির আমি ভিক্ষুক, যে ধনীর দুয়ারে যাই, তিনিও তাহা প্রিয়বোধে সংগ্রহ করিয়াছেন। ধন তাঁহারও প্রিয়,—সুতরাং ধনের প্রিয়া তিনিও আমিও, এতদুভয়ের মধ্যে সাপত্ন্যভাব উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। যদি ধনী ভিক্ষুককে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত বিতাড়িত প্রহৃত বা অত্যাচারিত হইলেও ক্ষুধার তাড়নায় ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হওয়া আমার বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম্ম হইয়াছে। এ ধর্ম্ম সামান্য ধর্ম্ম,—বিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম। ইহার ফল কখন অনুগ্রহ কখন নিগ্রহ। এ ধর্ম্মের সাধনা কেমন? ধনীর দুয়ারে বহু ভিক্ষুকের সমাবেশ, প্রবল দুর্ব্বলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে, পরস্পর কলহ-বিবাদ, একের অগ্রগমনে বাধাপসারণ-নিমিত্ত সবল

কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের জীবন বলিদান পর্য্যন্তও সাধিত হইতেছে! "পুত্রং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি"—ইত্যাদি বাসনাময় এবং বিদ্বেষ-বৈশিষ্ট্য-সাধনাময় জগতের ধর্ম্ম! পাঠক ভাই, অনুগ্রহ করিয়া মনে করিবেন না, আমি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ছলে অপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি শুধু জাগতিক ধর্ম্মের বিচিত্র বিকাশের একটি আলেখ্য তুলিয়া ধরিলাম। ইহাও ধর্ম্ম, তবে সামান্য ধর্ম্ম বা বিচিত্র ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য বা গুণ। ইহার পরিণাম কি? একদিন ধনীর দ্বারে প্রত্যাখ্যাত, বিতাড়িত, এবং শেষে অত্যাচারিত হইতে হইবে। তখন নিরাশ্রয় হইয়া পক্ক ফল যেমন বৃক্ষাশ্রয়বিচ্যুত হইয়া প্রকৃত ধরণীর আশ্রয়ে পতিত হয়, তেমনি যে সামান্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আমরা রহিয়াছি, ওই আশ্রয় হারাইয়া সত্য যে ধর্ম্ম (ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) তাহারই আশ্রয়ে পতিত হইয়া প্রকৃতরূপে আশ্রয় লাভ করিব। ইহাই সত্য ধর্ম্ম, ইহাই ভাগবদ্ধর্ম্ম, ইহাই প্রেমধর্ম্ম, ইহাই বিশ্বধর্ম্ম।

ভিক্ষুক আমি, আমাকে এই ধনের এ ধর্ম্মের সন্ধান কে দিবে? প্রথম দিবেন ধনী নির্য্যাতনরূপী করুণা করিয়া। তারপর দিবেন দৈবজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ, যখন সকলই অদৃষ্ট বলিয়া সেই অদৃষ্টসত্ত্বা আরও কত দুঃখ আমার জন্য রাখিয়াছেন জানিবার জন্য শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে তাঁহার দুয়ারে উপনীত হইব তখন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি একই প্রেমের বিকার মুখী গতিতে বিরহ, বিয়োগ বা বিপ্রলম্ভ রসেই বিশ্ব স্থিত। যদিও এখন আমরা কিছু বুঝিতেছি না যে, এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় বিরহ একটি রস, কিন্তু যে দিন সে সৌভাগ্য হইবে, শ্রীবিশ্বনাথের আকর্ষণ বুঝিব, সেদিন এ আমি আর বিভিন্ন থাকিবে না অংশত্ব উজ্জ্বল হইয়া অনুরাগময় ভাবতনু গ্রহণ করিবে। সেই সৌভাগ্য লাভের উপায় এই ভক্তি। শ্রদ্ধায় ইহার প্রথম প্রকাশ, সাধুসঙ্গে যাঁহারা

ভক্তি পথে বিচরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সহকারিতায়—ইহার আনুসঙ্গিক পুষ্টি ; তদনন্তর ভজন ক্রিয়াতে ইহা মূর্ত্ত বা অভিব্যক্ত। এই ভজনক্রিয়ার ফল কি ? অনর্থনিবৃত্তি। এইখান হইতেই প্রাপ্তি আরম্ভ, ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেমলাভ।

এ জগতে এত দুঃখ কেন ? অনেকেই এই প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন ? "কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?"—ইহাই জিজ্ঞাসা। এক কঁথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে,—'আমি বিপ্রলম্ভ রসে ডুবিয়া আছি বলিয়া, উহার স্থূল প্রকাশ সকল আমার নিকট দুঃখরূপে প্রতিভাত'। আমি যদি রস বুঝিতাম, তাহা হইলে দুঃখের হেতু বুঝিতাম, আর দুঃখিত হইতাম না।

জগতে দুঃখের সংখ্যা বহু নহে। একই দুঃখের বহু আক্রমণই বহু দুঃখরূপে বোধ। দুঃখ কি ? তৃপ্তির অভাব। আজ আমার একমুষ্টি অন্নের প্রয়োজন, দুঃখ ওই একমুষ্টি না পাওয়াতে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এক মুষ্টির সংস্থান হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আমার দুই মুষ্টির প্রয়োজন উপস্থিত হইল। সুতরাং প্রথম প্রয়োজনের পূর্ণতা সাধিত হইলেও আমার অতৃপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল। কেন এরূপ হয় ? আমার অভাব ক্রমশঃই বাড়ে কেন ? শ্রীভগবৎ শক্তির অংশকণা জীব বিভিন্ন ভাবে—স্ব-স্ব-প্রধানভাবে কখনই সম্পূর্ণ নহে বলিয়া, এবং সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অভাবের বিরাম হয় না বলিয়া। তাই বিচ্ছিন্নতায় প্রতিষ্ঠিত মনের আপন অভাব পূর্ণ করিবার পথে—তাহার সম্পূর্ণ হইবার পথে বহু বাসনা বা কামনার অধীন হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকলের বিরাম নাই। যে মুহূর্ত্তে সে আপন অংশত্ব বুঝিয়া অংশীর ভাবে বিভাবিত হইবে, তখনই তৎসহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া, আপন অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া, অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিলাভ করিবে।

শ্রীভগবৎ শক্তির আকর্ষণই সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টারূপে অভিব্যক্ত। তবে যতক্ষণ তত্ত্ববোধ না হইতেছে, ততক্ষণ ওই চেষ্টা বহির্মুখে বিশ্বাংস লইবার লালসা, বাসনা বা কামনারূপে প্রস্ফুটিত। ইহাই কাম, এই কামে বিশ্ব মুগ্ধ। সেই প্রেমই এখানে কামনাময়। তাই এখানকার—বহির্মুখের ধর্ম্ম কর্ম্ম কাম্য। কামের চেষ্টা 'আমি পূর্ণ হইব'। তত্ত্ববোধ হইলে পর মানব দেখে 'তুমি পূর্ণ হইবে' এবং 'তোমাকে পূর্ণ হইতে হইলে, তোমার আমাকে প্রয়োজন',—'সেই প্রয়োজন সাধনই আমার সাধনা',—'আমি তোমার হইলে তুমি পূর্ণ হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়া পড়িবে।' আমাদের সকল অভাবের তৃপ্তি এই খানে, 'আমি তোমার হইয়া।'

বাহ্য পরিচয়ে পাঠক ভাই, আপনি বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর,—অথবা যোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী,—কিম্বা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, যাহাই হউন না কেন, আপনাকে সত্য করিয়া তৃপ্তি পাইতে হইলে এই প্রেমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্য আশ্রয় নাই !!!

স্ব-স্ব-প্রধানভাবে সামান্য ধর্ম্মের সাধনায় ক্লিষ্ট হইয়াও যখন মানব তৃপ্তি-লাভে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন সে তাহার জ্ঞানাতীত অদৃষ্ট শক্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই শ্রদ্ধা তাহাকে সাধু সমীপে উপস্থিত করিয়া থাকে। সাধু বলিতে আমরা সাধন-পথ-বিচরণ-শীল অথচ শ্রীভগবন্নিষ্ঠ রুচি সম্পন্ন অনুরক্ত ভাবময় জীবন মহাত্মাগণকেই বুঝিব। ভক্তি যদিও উপায়মাত্র, তথাপি ভক্তের জীবনে উহা একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহাকে ত্যাগ করে না। সেই জন্য অনর্থ নিবৃত্তি হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সাধনলব্ধ বৃত্তিগুলিকে সাধ্যভক্তি ও প্রেমভক্তি বলা হইয়া থাকে।

সাধন ভক্তির দুই প্রকার প্রকাশ দেখা যায়। এক বৈধী, অপর

রাগানুগা। বৈধী ভক্তি মুখ্যা না হইলেও ইহা হইতে অনুরাগ লাভ হইতে পারে, সুতরাং মাত্র শাস্ত্র-শাসন-হেতুজ হইলেও ইহা গৌণী ও মুখ্যা ভক্তির সন্ধিস্থল। অনুরাগজ ভক্তিই মুখ্যা 'রাগানুগা' আখ্যায় অভিহিত। শ্রদ্ধাও সকলের একরূপ হয় না; কেহ শাস্ত্র যুক্তিতে নিপুণতালাভ করিয়া এবং তত্ত্ব সাধনাদি বিচার করতঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন, কেহ বা শাস্ত্রাদিতে নিপুণ না হইয়াও দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত, আবার কাহারও শাস্ত্রাদিতেও নিপুণতা নাই, শ্রদ্ধাতে বিশেষ দৃঢ় নহে। সুতরাং সাধুসঙ্গ মাত্রই সকলের ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় না; বিশ্বাসপূর্ণ দৃঢ় শ্রদ্ধান্বিত চিত্তেই ভজনক্রিয়ার আবশ্যকতা অগ্রে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভজনক্রিয়াই সাধনভক্তি।

যিনি প্রবর্ত্ত সাধককে ভজনক্রিয়ার উপদেশ দান করেন এবং নিয়ত তাহাকে ভজনে উৎসাহিত করেন, তিনিই ভজন তরণীর কর্ণধার শ্রীগুরু। শ্রীগুরুদেব সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী একাদশভাবে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্মরণীয় বস্তু বা তত্ত্ব উপদেশ করেন। সাধকের (১) সম্বন্ধ, (২) বয়স, (৩) নাম, (৪) রূপ, (৫) যুথপ্রবেশ, (৬) বেশ, (৭) আভরণ, (৮) বাসস্থান, (৯) সেবা, (১০) পরাকাষ্ঠা এবং (১১) পাল্যদাসীভাব, এই একাদশ ভাবের অনুকূল ভজনাঙ্গগুলিই সাধনীয়। শ্রীগুরু সেবা, মন্ত্র জপাদি, শ্রীভগবল্লীলা-গুণ-রূপ নামের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি এবং স্মরণ-পরিচর্য্যাদি,—এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ তিথিতে শ্রীভগবদুদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা ভাবের আনুকূল্য সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবন্নিবেদিত নির্ম্মাল্য গ্রহণে সাধকের অনুসরণীয় ভাবে সহায়তা সাধিত হয় বলিয়া ইহাও বিশেষ ভজনাঙ্গ। মালা-তিলকাদি ধারণে সাধকচিত্তে নিজভাব স্মরণের পোষকতা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
২য় ও ৩য় সংখ্যা } ভক্তি { আশ্বিন ও কার্ত্তিক
১৩৩৪

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

—— * ——

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

তোমার করুণা অমিয় ধারায়
নাশিয়া সকল বিঘ্ন বাধা।
তোমার চরণ সেবিকা ভকতি
ছাব্বিশে আজ পড়েছে বাঁধা॥

ইচ্ছাময়! দেখিতে দেখিতে তোমার শ্রীচরণ আশ্রিতা ভক্তি তোমার করুণা ধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া—পঁচিশ বৎসর শেষ করিয়া ছাব্বিশে পদার্পণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেবক হিসাবে আমাদের উপরও যে কর্ত্তব্যের বোঝা কিছু গুরুতর ভাবে চাপাইয়াদিলে সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু আজ এই নব বর্ষারম্ভের প্রথমেই তোমাকে দু'টো প্রাণের গোপন কথা না

বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। নানাভাবে নানা সময় তোমাকে অনেক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছি, আর কিছু বলিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু দিন দিন জীবনটা যে স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আর চুপ করিয়া থাকিতেও পারিতেছি না।

অনেক রকমে আমাকে নাচাইলে, মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধন জন যখনই যাহা চাহিয়াছি আশাতিরিক্ত দিয়াছ। ভোগও করিয়াছি, কিন্তু সত্য বলিতে কি, শান্তি পাই নাই বরং জ্বালার উপর শতগুণ জ্বালা বাড়িয়াই গিয়াছে; তাই আজ অন্য কিছু না চাহিয়া কেবল এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে তোমার পথে লইয়া চল। কপটাচারির কাপট্য পরিশোভিত আপাতমধুর বাক্যে ভুলিয়া যেন তোমাকে না ভুলি। ভ্রষ্টাচারির ভ্রষ্টাচারের ক্ষণিক ভোগলালসার আপাত মধুর আকর্ষণে ভুলিয়া যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট আচার হইতে ভ্রষ্ট না হই। বাহিরে হৈচৈ করিয়া একটা কেউ কেটা হইবার বাসনা আর নাই। সত্য সত্যই প্রাণের কথা তোমাকে বলি, এখন আমাকে এমন সঙ্গ দাও, এমন সুযোগ দাও যাহাতে যেকটা দিন ভবে থাকিব, তোমার সেবা করিয়া যেন জীবনে কিছু কাজ করিয়া যাইতে পারি। যদি মনে কর আমা দ্বারা এজনমে তাহা হইবে না, তাহা হইলে যেভাবে—যে জনমে তোমার পদে অকপটে প্রাণ সঁপিয়া, একেবারে তোমার ভাবে মসগুল্ হইয়া থাকিতে পারি সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দাও। শুধু বৃথা কাজে জীবনের ভার বহন করিয়া লাভ কি ?

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, দিন দিন অসৎ সঙ্গের প্রাবল্যে আমার ভোগের লালসা বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। ভোগের লালসা থাকুক কিন্তু সেটা অনিত্য বিষয়ভোগে নিযুক্ত না থাকিয়া তোমার লীলা-গুণ-রস-সুধাভোগে নিযুক্ত হউক।

বড় দুঃখে বলিতে হইতেছে, জানি না এ তোমার খেলা—না আমার দুর্ভাগ্য। যেখানে যাই, যাহাকে দেখিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া কিছু জ্বালার কথা বলি, সেখান হইতেই তাহার বিনিময়ে নানা প্রকার অসৎ ভাবের বোঝা হৃদয় ভরিয়া লইয়া আসি। আমার সরলতার বিনিময়ে কপটতা পাই, আমার জ্বালার বিনিময়ে শতগুণ জ্বালা পাই, আমার অভাবের বিনিময়ে অভাবের পাহাড় বুকের উপর চাপিয়া বসে। আর কেন প্রভু, এভাবে খেলাধুলা করিয়া জীবন আর ক'দিন থাকিবে? যদিও জীবন থাকে কিন্তু অন্তঃসার শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা গোল মিটাইয়া ফেলিলেইত চুকিয়া যায়। আমি আর পারি না—

এখন—এই নিবেদন তব কাছে,
আর যে ক'টা দিন বাকি আছে,
যেন কপটতা ভুলে　　তোমার গুণ গেয়ে
কাটাই আনন্দ জীবনে।

দীন—শ্রী—

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

(শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ বিশ্বাস লিখিত)

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" গীতা ৪ ৯

এই চির-পবিত্র হিন্দুস্থানের মাটীতে স্বয়ং শ্রীভগবানের ইচ্ছায়। তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি দ্বারা অনেক অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সর্ব্বকারণ-কারণ কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ যে জননীগর্ভ হইতে

আবির্ভূত হইয়া এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশের দৃশ্যপটে তাঁহার সর্ব্বোত্তম নরলীলা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, এই মর্ত্ত্য মানব সমাজে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক গুরুতর ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণায় আসে না। এই জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই ভগবানের কথা অল্প-বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। কেবল একমাত্র হিন্দুগণই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে পারেন, কেবল ঘোষণা করা নহে,—অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াও বলিতে পারেন—"যিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁহার এই রূপ, এই আকার, এই বয়স, এই গুণ, এই কর্ম্ম ইত্যাদি। তিনি আমাদের সর ননী মাখন খাইয়াছেন, আমাদের বসন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, নাচিয়াছি, গান করিয়াছি। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ—আত্মার আত্মা। তিনি আমাদের এত বাধ্য, এত অনুগত যে, আমরা তাঁহাকে একহাটে কিনিয়া অন্যহাটে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে দূর হইতে আভাসে কেবল দেখা নহে,—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ দ্বারা তাঁহার রূপ রস গন্ধস্পর্শ শব্দ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি,—তাঁহার সহিত করিতে আমাদের কিছুই বাকী নাই। তাঁহার হাতে আমরা, আমাদের হাতে তিনি। তাঁহার গুহ্যাদপি গুহ্য দ্বারের চাবি আমাদের হাতেই আছে,—আমরা যে কেবল তাঁহার সেই দ্বার খুলিয়া দিতে পারি তাহা নহে,—প্রার্থীকে দান পর্য্যন্ত করিতে পারি।" ভগবান সম্বন্ধে জোর করিয়া এরূপ কথা বলিবার বুকের পাটা একমাত্র হিন্দুরই আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের যে সবে-ধন নীলমণির কথা বলিতেছি,—তিনি স্বয়ং ভগবান বলিয়া অবতার নহেন,—কিন্তু অবতারী।

যিনি সকল অবতারের মূল, তাঁহাকে অবতারী বলা হয়। অবতার নানাবিধ, যথা—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার। শ্রীকৃষ্ণ এই সব অবতার-পর্য্যায়ভুক্ত নহেন বলিয়া—আমাদের রসিকচূড়ামণি জয়দেব তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যে না বসাইয়া সকলের আদিকারণরূপে সকলের উপরে উচ্চাসন দিয়াই ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে প্রণাম করিয়াছেন,—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি-কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

প্রলয়-বারিধিমগ্ন বেদ সকলের উদ্ধারকারী মীনাবতার,—স্বকীয় পৃষ্ঠদেশে জগতের ভার বহনকারী কূর্ম্মাবতার,—দন্তাগ্রে ভূমণ্ডলের উদ্ধর্ত্তা বরাহাবতার,—হিরণ্যকশিপুর সংহার কর্ত্তা নৃসিংহাবতার,—বলির ছলনাকারী বামনাবতার,—ক্ষত্রক্ষয়কারী পরশুরামাবতার, রাবণ সংহর্ত্তা রামাবতার, লাঙ্গলধারী বলভদ্রাবতার,—সর্ব্বভূতে কারুণ্যবিস্তারকারী বুদ্ধাবতার এবং ম্লেচ্ছগণের সংহর্ত্তা কল্কি অবতার,—এই দশাবতার-বিগ্রহধারী পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার।

অপৌরুষেয় শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়। আমরা শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে শুনিতে পাই "কৃষ্ণ বৈ পরমদৈবতম্।" গীতায় স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখেই গান উঠিয়াছে—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"
"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্বনি উঠিয়াছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"।

এই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের নিত্যধাম হইতেছে গোলোক বৃন্দাবন। নিত্যধাম এই প্রপঞ্চের মত প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের অধীন নহে। স্বর্লোক পর্য্যন্ত প্রলয়ের অধীন, প্রলয় কালেও মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য বা ব্রহ্মলোক বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মহাপ্রলয়ের সময় এই সমুদয়ও নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মার দিবাবসানে প্রলয় এবং তাঁহার শত বৎসর পরিমিত আয়ুশেষে মহাপ্রলয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ। ৭১ দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, ১৪ মন্বন্তরে এক দিন। তাহা হইলে ৭১ × ১৪ = ৯৯৪ দিব্যযুগে ব্রহ্মার এক দিবস। ৯৯৪ দিব্যযুগকেই মোটামুটি সহস্রযুগ বলা হয়। সহস্রযুগে এক দিন এবং সহস্রযুগে এক রাত্রি—

"সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥" গীতা ৮।১৭

ব্রহ্মার এক দিনে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হন। অন্য দ্বাপরে যুগাবতার আসেন সত্য কিন্তু স্বয়ং তিনি আসেন না। যে দ্বাপরে তিনি আসেন, সেই সময় যুগাবতার তাঁহার মধ্যেই অংশরূপে বিরাজ করেন। সমুদয় সনাতন শাস্ত্র মন্থন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি চারি যুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

ঐ চরিতামৃতেই আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে আবার দেখিতে পাই—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।
ভার-হরণ কাল তাতে হৈল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥"

ভগবান্ বলিলেই সাধারণতঃ মানুষের মনে হয়—"তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন,—তিনি পাপ পুণ্যের বিচারক,—ধর্ম্মাবতার-জ্ঞানে দূর হইতে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ খুলিয়া পীরিতি করা দূরে থাকুক, —তাঁহার অন্দরের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিবারও উপায় নাই। তিনি আমার উপাস্য বটে কিন্তু আমার সহিত তাঁহার কোন প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না; তবে শাস্ত্রানুসারে বিধি মত ভজন সাধন

করিলে,—দেহাবসানের পর সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সার্ষ্টি এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইতে পারি।" কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল—নিত্যকায়া মনুষ্য আমার এবং আমার বিভিন্নাংশ অনিত্য ছায়া মনুষ্যের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকি থাকিতে দিব না, সে আমার সন্ধান না জানিতে পারে কিন্তু আমি তাঁহাকে আমার সন্ধান দিতে পারি,—সে আমার নিকট না আসিতে পারে কিন্তু আমি তাঁহার নিকট যাইতে পারি। স্বয়ং আমি আমার প্রিয় মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার রূপ গুণ কর্ম্ম ভাব প্রভৃতি সবই দেখাইব। আমার নিত্যসিদ্ধ ভক্ত প্রিয় পরিকরগণের আচরণ দেখিয়া জগতের লোক জানিবে, আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের নিকট অজিত হইলেও, প্রীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকি,—আমি স্বতন্ত্র ভগবান হইলেও ভক্তিগুণে ভক্তের অধীন হই; আমাকে যে যত প্রাণ খুলিয়া আপন জ্ঞানে ভালবাসে, আমি তাহার তত বাধ্য হইয়া পড়ি। প্রীতির প্রহার খাইয়া আমার যত সুখ হয় প্রীতিহীন পূজা অর্চ্চনায়ও তত সুখ হয় না।—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শ্রদ্ধাভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা—করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভূত বিহার॥ (চৈঃ চঃ আদিলীলা)

ইহাই—অবতারী কৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য কারণ। সেই সময় যুগাবতার প্রভৃতি সকলেই তাহার মধ্যে অবস্থান করে;—অংশীর মধ্যে সকল অংশই থাকিতে বাধ্য। কাজে কাজেই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যুগোপযোগী সমুদয় কার্য্যই তাঁহাকে করিতে দেখা যায়। গোপ গোপীর বৃন্দাবনের বাহিরে তাঁহার রাজনীতিক হস্তে পদ্ম ব্যতীত শঙ্খ চক্র গদাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি সখা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য বীর ভক্তগণকে লইয়া—ভূভার-হরণ করিয়াছেন এবং ছিন্ন ভিন্ন আর্য্য সমাজে শান্তি এবং ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রই হইতেছে কাটাকাটি এবং মারামারির কোলাহলময় সংসার। মর্ত্ত্য মানবজাতিকে মৃত্যু-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃত রাজ্যে তুলিবার জন্য এইখানে দাঁড়াইয়াই তিনি গীতামৃত দান করিয়াছেন। এই গীতার গুহ্য বিষয় ব্রহ্ম জ্ঞান, গুহ্যতর বিষয় পরমাত্ম যোগ, গুহ্যতম বিষয় শুদ্ধা ভক্তিযোগ। এই গুহ্যতম ভক্তিযোগই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এবং ইহাই—গীতা উপনিষদের সারাৎসার উপদেশ। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় এই যে, এই রাজপথে উঠিয়া লোক তাঁহাকে ব্রজবাসী গোপগোপীর মত আপনার হইতে আপন ভাবিয়া ভক্তি করুক, যে ভক্তি করিবে সে

নিশ্চয়ই তাহাদের মত তাঁহাকে লাভ করিবে। ইহা আমাদের মনগড়া কথা নহে,—তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ॥"

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥" গীতা—১৮।৬৫

বদ্ধজীব আমরা হাড়মাংসের খাঁচায় আবদ্ধ,—জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়িয়া জীবনে মরণে কেবল যোনিতে যোনিতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি,—যোনি আমাদের মনের প্রধান বিষয়। তাই জন্মপ্রসঙ্গ উঠিলেই আমাদের মনে শুক্রশোণিত এবং স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমের কথা আসে। মায়িক নরদেহ স্ত্রীর রজ এবং পুরুষের বীর্য্য সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান এবং ভগবানের অবতার বলিয়া যাঁহারা খ্যাত, তাঁহাদের দেহ কিন্তু ঐরূপে উৎপন্ন হয় না,—তাহা অপ্রাকৃত এবং নিত্য। খৃষ্টান জগতে যিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই জগদ্বরেণ্য খৃষ্টের দেহ মেরিমাতার গর্ভে শুক্রশোণিত যোগে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা বাইবেলের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ভাগবতের প্রকৃত পাঠকগণেরও ইহা জানিতে বাকী নাই যে, ত্রিকাল-সত্য শ্রীকৃষ্ণ-দেহ সপ্তধাতুতে গঠিত নহে,—তাহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভগবানের তটস্থা শক্তির পরিমাণ বিভিন্নাংশ বদ্ধজীবের দেহ, নাম ও আত্মা বিভিন্ন,—দেহ ও নাম নির্দ্দিষ্ট কালেই চলিয়া যায়, নিত্য আত্মা থাকে। ভগবানের নামে দেহে ও আত্মায় কোন বিভিন্নতা নাই,—যেই নাম সেই দেহ, সেই আত্মা। সবই বিভিন্ন দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার যত কিছু সবই সচ্চিদানন্দ ঘন। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নামে পার্থক্য নাই বলিয়াই বঙ্গের মহাজনগণ বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছেন—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥"

তাঁহার দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও বিচার করিলে দেখা যায়—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে তাহাদের বিশেষ বিশেষত্ব আছে। মানুষ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়, শুনিতে পায় না,—কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রিয়ই কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে। আমরা ব্রহ্ম সংহিতা হইতে স্পষ্ট ইহা জানিতে পাই—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জয়ন্তি।
আনন্দচিন্ময় সমুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ॥

যাঁহার বিগ্রহ জ্ঞানময় আনন্দ স্বরূপ নিত্যোজ্জ্বল এবং যাঁহার অঙ্গ সকল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতের দর্শন-পালনাদি কার্য্যে সততই সমর্থ,—তাদৃশ আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"হস্তোহপি দ্রষ্টুং শক্নোতি চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি তথান্যদন্যদপ্যঙ্গমন্যৎ।"

অর্থাৎ তাঁহার নয়ন যে কেবল দেখিতে সমর্থ তাহা নহে, হস্তও দেখিতে সমর্থ এবং চক্ষুও পালন করিতে পারগ, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্গও অন্য অন্য কার্য্য-সাধনে সমর্থ।

তিনি যথাদৃষ্ট সসীম নরদেহের মধ্যেই অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। দুধের গোপাল একদিন হাই

তুলিলেন, আর মা যশোদা দেখিলেন তাহার মুখের ভিতর দৃষ্টাদৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রজে মাধুর্য্যের প্রাধান্য বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই এই ঐশ্বর্য্য গুপ্ত হইল। আবার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের প্রকৃষ্টস্থল কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের নিকট সীমাবদ্ধ নরদেহে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন— আমি অনিত্য মনুষ্য বটে, কিন্তু আমার দেহটী শুক্রশোণিতের প্রাকৃত দেহ নহে,—এই অনিত্য ভাণ্ডেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, সত্য সত্যই আমি কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। অন্যদিকে কথা উঠিতেছে, তবু ত আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর উদরেই দেখিতে পাই। একটী নরশিশু জন্ম হইতে যেরূপে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, তিনি ত সেই রূপেই গোকুলে বাড়িয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে ভক্তিশাস্ত্র এইরূপ বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির নাম যোগমায়া, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি হইতেছেন, গুণময়ী দৈবীমায়া। যোগমায়াকে কায়া বলিলে, আমরা গুণময়ী মায়াকে তাঁহার ছায়া বলিতে পারি। কায়াও ছায়াতে কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু একটী নিত্য অপরটী পরিবর্ত্তনশীল। ছায়া কখনও কায়ার ভিতরে প্রবেশ করে, আবার বাহিরে পড়ে। ব্যষ্টি দেহ এবং সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের কর্ত্রী হইলেন গুণময়ী মায়া। বদ্ধজীব এই দৈবী মায়ার অধীন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আর কর্ম্মফল ভোগ করে। নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার অধীন হইয়া ভৌম বৃন্দাবনে প্রকটিত হন। আমরা শ্রীচরিতামৃতে মধ্য লীলার ২১ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের শ্রীমুখে শুনিতে পাই—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে।"

কায়া-যোগমায়ার কার্য্যের সহিত ছায়াগুণময়ী মায়ার কার্য্যের কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই—বাহির হইতে প্রাকৃত চক্ষে কৃষ্ণের জন্ম কর্ম্মও একটি প্রাকৃত মনুষ্যের জন্ম-কর্ম্মের মত বোধ হয়, তাহা যে অপ্রাকৃত তাহা তিনি গীতায় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" * * *

শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার টীকায় "দিব্যম্" অর্থে "অপ্রাকৃতম্'ই লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া সম্বন্ধে অযুক্ত বহির্ম্মুখ জীবগণ সম্পূর্ণরূপেই অনভিজ্ঞ,—ভক্ত যোগীগণ সে বিষয় অবগত আছেন। অভক্ত অসুর প্রকৃতির লোকগণ গুণময়ী মায়া ভেদ করিয়া আত্ম-স্বরূপই দেখিতে পায় না, তাহারা মায়ার মায়া যোগমায়ার রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিবেন কিরূপে? তিনি যথার্থই বলিয়াছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥" গীতা—৭।২৫

ভগবান কৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি যোগমায়ার দ্বারা সম্যকরূপে আবৃত বলিয়া সকলের নিকট স্বরূপে প্রকাশিত নহি। যে মোহান্ধ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেই বা কি হইবে? সে আমার ভিতর বাহির কিছুই দেখিতে পায় না—আমার যে মানুষের মত জন্ম নাই,—তাহার জড়দেহ ধ্বংসের মত আমার চিন্ময় দেহের যে ক্ষয় হয় না,—অর্থাৎ আমি যে অজ অব্যয়—তাহা সে জানিতেপারে না।

মূঢ়জীব বলিতে পারে, কৃষ্ণ স্বরূপে তাহার জন্মের পূর্ব্বে ছিলেন

না,—তাহার সন্দেহ নিরসনের জন্য—জীববান্ধব অর্জ্জুন প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"একি কথা? সূর্য্যের জন্ম বহু পূর্ব্বে, আর তোমার জন্ম হইল সেদিন? এই তুমিই যে তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলে—তাহা কেমন করিয়া জানিব।

"অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥" গীতা ৪।৪

সখার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই প্রপঞ্চের উপর আমার এবং তোমার এইরূপ জন্ম অনেক বার হইয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান-ঘন মূর্ত্তি আমি সে সব জানি,—কিন্তু তুমি জান না। ত্রিকাল-সত্য লীলা-পুরুষোত্তম আমি ত্রিকালে একরূপই থাকি। আমি সকলের মূল কারণ, আমাকে কে জন্ম দিবে? আমি সত্য সত্যই অজ, আমার দেহের সহিত আত্মার কোনও ভেদ নাই,—যে দেহ সেই আত্মা,—তাহা অব্যয়—আমি অব্যয়াত্মা। প্রকৃতির অতীত আমি ভূত সকলের ঈশ্বর। তবে অজ হইলেও আমার যে জন্ম হয়, আমার নিত্য অব্যয় দেহেরও যে হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়,—ভূত সকলের ঈশ্বর হইয়াও যে আমি পঞ্চভূতের ফাঁদে পা দিই, তাহা আমার ইচ্ছা এবং করুণা। আর কি?—পরম করুণ, ইচ্ছাময় আমি, আমার ইচ্ছাপূর্ণ কারিণী শক্তি—আত্ম যোগমায়ার দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই মর্ত্ত-মানব সমাজের ভিতর নরলীলা প্রকটিত করিয়া থাকি।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" গীতা ৪,৬

এখন দুষ্টগণ শুনিয়া সাবধান হও, সাধুগণ আনন্দে নৃত্য কর—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সংসারে চিরকালই সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক আছে—দৈব ও অসুর।

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" গীতা ১৬।৬

যাহাদের ভিতর সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, প্রায়ই তাহারা দৈব, আর সত্ত্বগুণকে ঠেলিয়া যাহাদের ভিতর রজ ও তম গুণ কর্ত্তৃত্ব করে, তাহারা অসুর। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কখন দৈব প্রকৃতির লোক প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, আবার কখন অসুর প্রকৃতির রাক্ষস খোক্কসগণই প্রভু হইয়া বসে। প্রথম শ্রেণীর নিরীহ শান্তিপ্রিয় এবং ত্যাগী বলিয়া—তাহাদের আমলে মানব সমাজে শান্তিই বিরাজ করে। কিন্তু কালের গতিতে যখন অসুর লোকের পালা পড়ে,—তখন শান্তিময় রাজ্যে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়। ভগবানের উপর তাহাদের জাতক্রোধ, তাঁহার শক্তি দেব-দেবীর উপর তাহারা খড়্গহস্ত! গো-ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মণ্যদেবের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহাদের চক্ষুঃশূল! সাধু ভক্তগণ ভগবানের চিহ্নিত প্রিয়জন বলিয়া তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে তাহারা সর্ব্বদাই উদ্যত।

এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে দ্বাপর যুগের শেষে এই শ্রেণীর দুর্দ্ধর্ষ লোকেরই বাহুবল এবং বুকের পাটা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে এবং উৎপীড়নে গোমাতা জীর্ণ শীর্ণ, ব্রাহ্মণগণ যায় যায়, অধিক কি নিরীহ সাধুসজ্জনের তিষ্ঠানই দায় হইয়া পড়িল। তাহাদের অন্যায় অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে হইতে এমন সীমায় উঠিল যে, ধৈর্য্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ধরিত্রীদেবীও একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বজন-জননী এই অচলার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ধ্বনি উত্থিত হইল। এই ঘোর বিপদে উপর হইতে মধুসূদনের অভয়বাণী আসিল—"মাভৈঃ মাভৈঃ।"

অসুর-প্রকৃতির লোকের একজন প্রধান নায়ক হইলেন কংস। তাঁহার জ্বালায় সাধু নাগরিকগণ দেশ ছাড়া হইলেন, তাঁহার অনুচর এবং সহচরস্থানীয় নরপিশাচগণ শিষ্টগণের রক্তশোষণে বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

কংসের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল—বসুদেবের সহিত ভগিনীস্থানীয় দেবকীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে হঠাৎ বিনামেঘে তাহার শিরে বজ্রাঘাত হইল। স্পষ্ট আকাশবাণী—তাহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল…"দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান দ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে।" অনেক কাণ্ডের পর এই সাধুবিদ্বেষী অবিচারক রাজা—ন্যায়-ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ভাবী বিপদ আশঙ্কায় কেবল সন্দেহবশে সাধুকুল-চূড়ামণি নির্দ্দোষ বসুদেব এবং সতীকুলললামভূত দেবকী দেবীকে রাজকারাগারের এক ভীষণ অন্ধকার কক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

কালে কাল আসিল,—দেবকী দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া উঠিলেন। অন্ধকার-কারাগারে সেই দিব্য জ্যোতি দর্শন করিয়া কংস ঘোর বিভীষিকা দর্শন করিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন ডাকিয়া বলিল, আর দেরী নাই, কাল আসিয়াছে! সেই আতঙ্ক-সঙ্কুল কারাগারে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইল—দেবকী বসুদেবের শরীরে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল উঠিল—সাধুসাধ্বীর উপরে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার একেবারে চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল!

কারাগারের শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আমাদের দেব-দেবী—নিজের জন্য বিশেষ কিছু চিন্তা করিতেছেন না, চিন্তা কেবল তাঁহাদের আশা ভরসার স্থল সন্তান-সন্ততির জন্য। তাঁহারা নিরাশ্রয়, নিরুপায় নিঃসহায় করিবে কি, তাঁহাদের নিজের হাতে কিছুই নাই। যখন মানুষের আত্মরক্ষার আর কোন শক্তি থাকে না—তখন সে মূল আশ্রয় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সতী দ্রৌপদী

বসন টানিয়া টানিয়া যখন দেখিলেন নিজের চেষ্টায় লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব, তখন তিনি "হা গোবিন্দ তুমি যা কর" বলিয়া বসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের রাজবন্দী সাধুসাধ্বীও অনন্যমনে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অঝোরে ঝুরিতেছেন! ভাদ্র মাস, বাদরের সময়,—তাহাদের পাষাণভেদী ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়াই যেন সারা প্রকৃতি দিবানিশি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্রই এক মর্ম্মভেদি মহাবিলাপ কাব্য! কৃষ্ণ পক্ষ, ভীষণ অন্ধকার, মাঝে মাঝে অশনির ধ্বনি! এই ঘোর দুর্য্যোগে পাপ কারাগার হইতে আর্য্য দেব দেবীর বুক ফাটিয়া ধ্বনি উঠিতেছে—"হে অগতির গতি! হে সাধুসজ্জন-পরিত্রাণকারি! হে হরে! হে মুরারে! হে মধুকৈটভারে! এই জীবন সঙ্কটে এক তুমি ভিন্ন আর আমাদের উপায় কি? হে জ্যোতির জ্যোতি! হে কোটী কোটী রবি শশিবিনিন্দিত দেব দেব! এই ঘোর অন্ধকারে তুমি —কেবল তুমিই আমাদের একমাত্র আশা—একমাত্র ভরসা।"

আর্য্য সাধুসাধ্বীর এই ব্রহ্মাণ্ডভেদী আর্ত্তনাদে অঘটন ঘটন হইল, —এক অজ্ঞাত নাট্যকারের কটাক্ষেই যেন তমসাছন্ন জগৎ-রঙ্গমঞ্চে— অভিনব দৃশ্য প্রকটিত হইল,—মুহূর্ত্তের মধ্যেই ধরার মুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! এ লোকের দেশ কাল পাত্রে গোলোকের শোভা সম্পদ আসিল,—জলে স্থলে শূন্যে যাহা কোনদিন ছিল না, তাহাই দৃষ্টিগোচর হইল। তখন—

"শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
জয় জয় হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিক্ সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি॥"

ভয়ে—অসুর প্রকৃতির লোক কাঁপিয়া উঠিল,—সাধুগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল,—জলধরের আনন্দমন্দ্রে এবং অগাধ জলধির হর্ষোচ্ছ্বাসে চরাচর মুখরিত হইল। তখন—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিবপুষ্কলঃ॥ ভাঃ ১০।৩।৮

পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের, ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। তখন সত্য সত্যই—

"মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।"

মহাজনগণের কৃপায় আরও শুনিতে পাই—

"অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল জয়কার দেই দেবপত্নী সর্ব্ব॥"

সে সময়ে গগনেও চাঁদ উঠিয়াছে—কিন্তু সে চাঁদ—এ চাঁদের কাছে তুলনা করিলে কিছুই নয়—

"কত কোটি চাঁদ জিনিয়া উদয়।
এ দাস মাধবে কহে আনন্দ হৃদয়॥"

লোকে নিজ পুত্রের রূপ গুণে আত্মহারা হইয়া সেই প্রাণাধিক শ্রীমান্‌কে সোনারচাঁদ বলে, আমরা এই প্রাণের প্রাণাধিক—চাঁদের চাঁদকে কিসের চাঁদ বলিব স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদের আঁধার কারায় এই লোকাতীত লোকের চাঁদ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা উভয়েই স্তম্ভিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। বাহিরের লোক আমরা আর কি বলিব,—বসুদেব যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, তাহা ভাগবতের ভাষাতেই শ্রবণ করুন।—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।

শ্রীবৎসলক্ষং গলশোভিতকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োধসৌভগম্ ॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্ ।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ভাঃ ১০।৩।৯—১০

বসুদেব দেখিলেন, সেই বালক বড়ই অদ্ভুত—তাহার ডগমগ কমল লোচন ঢল ঢল করিতেছে, হাত দুইখানি নয় চারিখানি, তাহাতে আবার শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি অস্ত্র সকল উদ্যত হইয়া আছে। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন—ঝলমল করিতেছে. গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। পরিধানে পীতবসন,—বর্ণ নব নিবিড় জলধরের ন্যায় অতি মনোহর। মহামূল্য বৈদূর্য্য কিরীট ও কুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণ সকল—ঘন কুঞ্চিত কেশ কলাপে কি না অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিয়াছে। অত্যুত্তম মেখলা অঙ্গদ প্রভৃতি দিব্য ভূষণ সকল শ্রীঅঙ্গের উপর অলৌকিকভাবে ঝলমল ঝলমল করিতেছে। আ মরি মরি, কি শোভা।

কেবল পৃথিবীর নহে,—ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস খুলিয়াও,—কোথায়ও কস্মিন্‌কালে—আমরা এইরূপ পুত্রজন্ম দেখিতে পাই না। ভাগ্যবান জনক এবং ভাগ্যবতী জননী উভয়েই আবির্ভূত চাঁদমণিকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিয়া যথোপযোগী স্তবস্তুতি করিলেন, তিনিও এখানে মায়া না করিয়া দয়া করিয়াই তাঁহার নিজের এবং তাঁহাদের আমূল বৃত্তান্ত সকল ব্যক্ত করিলেন।

যাদুকর যেমন "লাগ ভেল্কি লাগ" বলিলেই ভেল্কি লাগিয়া যায়, এখানেও সেইরূপ "লাগ ভেল্কি লাগ" আরম্ভ হইল। চতুর্ভুজ ভগবানের স্থলে কাল মাণিকের মত—একটী মায়া শিশু দাঁড়াইলেন। চতুর্ভুজ

ভগবানের ভিতর হইতে এই দ্বিভুজ শিশু বাহির হইলেন, কি এই—চোরা শিশু আবির্ভূত হওয়াতে, চতুর্ভুজ ভগবানই তাঁহার ভিতর প্রবেশ করিলেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন। তবে আমরা এই দেখিলাম—এই মায়া শিশুর ইচ্ছা এবং আদেশানুসারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বসুদেব মুক্তপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে বুকে করিয়া গোকুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। রুদ্ধ কারাদ্বার মুক্ত হইল,—মায়াবী পুরুষের মহামায়ার গুণে সকলেই নিদ্রিত। তিনি সেই চিরস্মরণীয় নিশীথে—অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের ভিতর নন্দব্রজে গিয়া যশোদার শয্যায় নীলমণিকে রাখিলেন এবং তথায় আবির্ভূত মায়াকন্যাটীকে লইয়া—স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কারার দ্বার আপনা আপনি আবদ্ধ হইল, তিনি পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলে আবদ্ধ পড়িলেন। মা যশোদা যোগমায়ার প্রভাবে পুত্র হইয়াছে কি কন্যা হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই,—তবে একটী কিছু হইয়াছে, ইহাই তাঁহার আধ আধ জ্ঞান ছিল। তবে—

"নিশি অবশেষে, জাগি ব্রজেশ্বরী,
হেরই বালক মুখচাঁদে।
কতহু উল্লাস, কহই না পারিয়ে,
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥"

এই মহানন্দের সুপ্রভাতে, আমরা আমাদের সবে মাত্র দুটী চক্ষু কোন্ দিকে দিব স্থির করিতে পারিতেছি না। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই—"আনন্দময় রে বড় আনন্দময়।" যেহেতু আমাদের—"নন্দের মন্দিরে শ্যামচাঁদের উদয়" উপরে তাকাইয়া দেখি—

"স্বর্গেতে দুন্দুভিবাজে নাচে দেবগণ।"

আবার সর্ব্বত্রই শুনি সকলে কেবল হরি হরি ধ্বনি করিতেছে।

"হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥"

চরাচর ব্যাপী এই জগন্মঙ্গল হরিধ্বনির ভিতর ব্রহ্মলোকের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কৈলাসের পঞ্চানন শিব, স্বর্গের সহস্রলোচন ইন্দ্র—সকলেই বিশেষ ভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলেন—

"ব্রাহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।"

কিন্তু গোবিন্দকে হাতে হাতে পাইয়া গোকুলের গোয়ালার নৃত্যই সকলের উপরে উঠিয়াছে—

"গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।"

গো গোপ গোপী পূর্ণ—গোয়ালা পাড়ায় এই চির স্মরণীয় দিনে, "উঠ জাগ সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল,—যে যেখানে ছিল, সকলেই—কাহার যেন মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজরাজ নন্দের মন্দিরে ছুটিয়া আসিল—

"নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।"

কিন্তু তাহারা খালি হাতে আসিল না,…হাতে ধরিল নড়ি, কাঁদে করিল প্রীতির ভার প্রীতিরভার কাঁধে করায় পা যেন আপনিই থৈয়া থৈয়া নৃত্য করিয়া উঠিল—

"হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥"

সদানন্দমূর্ত্তি নন্দের আনন্দ আজ সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে,—তাহার আজ ঢলাঢলি ভাসাভাসির দিন। প্রাণগোপালেরপ্রিয় গব্যরসে আঙ্গিনা ভাসিয়া গেল, সেই রসের ভিতর গোবিন্দলাভহেতু তিনি যে তাণ্ডবনৃত্য প্রকটিত করিলেন, তাহার আর তুলনা কোথায়?

"নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।"

নন্দোৎসবের এই আনন্দবর্ণনার ভাষা নাই,—তাই—কবি শিবাই দাস ফাঁপরে পড়িয়া—কেবলমাত্র "বড় আনন্দ হইল, বড় আনন্দ হইল" বলিতেছেন—

"আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।"

এই আনন্দ সাগর হইতে আমি আর কূলে উঠিতে পারিলাম না, আমার মন যেন নন্দালয়ে সেই মনোমোহনের নিকট ভুলিয়া থাকিল—

"এ দাস শিবাইএর মন ভুলিয়া রহিল।"

আমাদের ভাগ্য গুণে অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন,—আজ জন্মগ্রহণ করিলেন, আনন্দ হস্ত পদ লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত অনঙ্গমোহন অঙ্গ ধারণ করিয়া দেখা দিলেন, এখন তবে সকলে মিলিয়া—

"ভজ গোবিন্দ গোপালা।
অধম উদ্ধারণ নন্দলালা॥"

আগমনী

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

আশাপথ চেয়ে আছি, এসগো মা, এস উমা!
অমানিশি গত হল, আকাশে হাসে চন্দ্রমা !!
নিবীড় জলদজাল, ক্রমে যে মা দূরে গেল,
নির্ম্মল শারদাকাশে ভাতিবে তোর প্রভা যে মা !!
অনুকূল চিহ্ন হেরি, আনন্দ চৌদিকে ঘেরি,
চাপিয়ে নয়নবারি বরষ যে যেপেছি মা !!
এস মা এস হাসিয়ে, এস এ' দীন আলয়ে,
শৌর্য্য-বীর্য্য-বিত্তা-ঋদ্ধি-সিদ্ধি তোমার ফুটা'য়ে মা !!

স্থির নীরবতা ঘন, তা'রি মাঝে ওই শুন,
গভীর উঠিছে ধ্বনি, জগত ডাকিছে "মা—মা" !!
সুষমা যতগো হাসে, নয়নে ততই ভাসে,
স্নেহ শক্তি একাধারে—প্রাণারাম ছবি সে মা !!
যত মা ভাবি সে ছবি, কি ভাব যে অনুভবি,
সেভাব ভাষাতে বেঁধে ফুটা'তে পারিনা গো মা !!
শুধুই অন্তর হ'তে, উঠে ধ্বনি "মা" রবেতে,
অন্তরে বাহিরে যেন বাজে "মা—মা" মধুরে মা !!
তুমি মহাশক্তি যে মা, কেমনে করি ধারণা ?
হৃদয়ে জাগা'তে ভাব শুধু এ' আবাহন মা !!
নাহি জ্ঞান, নাহি ভক্তি, চাইনা মা মোক্ষ, মুক্তি,
আনন্দসাগরে ডুবে থাকিতে দাও "মা" ও' মা !!
পূজিব কি দিয়ে বল, নাই মা চন্দন-ফুল,
আছে শুধু আঁখি বারি আছে মাত্র মন্ত্র "মা—মা" !!
কতজনে ছন্দোবন্দে বন্দে চরণারবিন্দে,
এদীন সন্তান মা তোর ডাকিছে "মা—মা" শুধু "মা" !!

শারদা আসিতেছেন ! শারদাকাশ নির্ম্মল করিয়া, তাহাতে আপন সাত্ত্বিকপ্রভা ফুটাইয়া, চারিদিকে আনন্দ ছড়াইয়া কাত্যায়নী যোগমায়া আসিতেছেন ! মানব, তুমি ডাক আর না ডাক, তিনি আগমনী,—আসিতেছেন ! আসিবেনই ত ! না হইলে রাসের আয়োজন কে করিবে ? যাহা নিত্য তাহার রোধ করিবে কে ? মানব, তুমি ভক্তিহীন, জ্ঞানগর্ব্বিত, তাই তোমার হাতে রাসের আয়োজনের ভার নাই,—তাই যোগমায়া নিত্যা আগমনী ! উনি কেবলই আসিতেছেন !

কিন্তু মানব, তুমি কি উঁহাকে আবাহন করিবে না ? তুমি কিসের

এত গর্ব্ব কর? ওই দেখ দেখি, মা আমার আসিতেছেন, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া কত কি ফুটিয়াছে!—শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি! এ সব দেখিয়াও কি তোমার গর্ব্বোন্নত ক্ষুদ্র মস্তক ভূতলাভিমুখী হইবে না? হইতেই হইবে! সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকে আগমনী দেখিয়া ডাকিতেছে! তোমাকেও ডাকিতে হইবে! তুমি যেমনই হওনা কেন তোমাকে দীন হইয়া—কাঙ্গাল হইয়া ডাকিতে হইবে!

বিশ্বভরা দেবীর মূর্ত্তিখানি—আ মরি মরি—কতইনা সুন্দর! শিব-তেজে-গঠিত-বদনা, বিষ্ণুতেজে-গঠিত ভুজশালিনী, ব্রহ্মতেজে-গঠিত-অনুপম-চরণা, অপরাপর-দেববৃন্দের-তেজঃপুঞ্জ-কলেবরা বিশ্বসাধনার-সমষ্টি-বিগ্রহ-ধারিণী ওই দেখ যোগমায়ার মনোরমা মূর্ত্তি! অশিবনাশিনী দুর্গতি রোধিনী দুর্গা আসিতেছেন, অসুর নাশিতে নাশিতে! প্রয়োজন, সকল অকল্যাণ দূর করিয়া রাসের আয়োজন! দেবী আসিতেছেন, অপ্রকৃতিস্থ বিশ্বকে প্রকৃতিস্থ করিতে!

মা আমার নিত্যা আগমনী! আগমনের বিরাম নাই! তবে কি মা এ বিশ্বে ছিলেন না? অসম্ভব! বিশ্বে তাঁহার অস্তিত্ব নিত্যই নূতন হইতেছে, সে অস্তিত্বকে অতীতে রাখা অসম্ভব; তাই তিনি কেবলই আসিতেছেন, তিনি আগমনী। বিশ্ব তাঁহাকে কেবলই পাইতেছে! কিন্তু রাখিতে পারিতেছে কি? না! তাই বিশ্বে স্বেচ্ছাকৃত বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে। কিন্তু ভক্তের মন্দিরে দেবীর বিসর্জ্জন নাই! যাহা আছে, তাহা ভক্তের অভিমান-বিসর্জ্জন, স্বাতন্ত্র্য-বিসর্জ্জন! তাই ভক্ত কুটীরে বিজয়াতেও উৎসব! প্রণাম-নমস্কার-আলিঙ্গন প্রভৃতি করিয়া ভক্ত সেদিন বিজয়ার বিশ্ব-বিজয়-উৎসব সাধিত করেন! অভিমান থাকিলে, স্বাতন্ত্র্য থাকিলে রাসদর্শন হইবে না যে!

দেবী আসিতেছেন কোথায়? ভক্তের কুটীরে আনন্দময়ীরূপে,

বিলাসীর শৌধমন্দিরে ত্রিভুবন বিলাসিনী রূপে, আর্ত্তের নিকট অভয়ারূপে, অসুর ভাবাপন্ন বলদৃপ্ত ধনমত্তের নিকট রণরঙ্গিনীরূপে, জ্ঞানগর্ব্বিতের নিকট শৌর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা ঋদ্ধি-সিদ্ধি-মণ্ডিতারূপে!

এস দেবী, এস! তুমিত আসিয়াই আছ,—আবার আসিতেছ! তুমি নিত্যা আগমনী, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এক করিয়া ফেলিয়া কেবলই উদয় হইতেছ! পুরাতনকে গ্রাস করিয়া কেবলই নূতন করিতেছ! এই তোমার 'যাওয়া'-হীন কেবলই আসা, এই তোমার আগমনীরূপই বিশ্বে নিরন্তর রসধারা বর্ষণ করিতেছে, করুণা ছড়াইতেছে! কে নিদ্রিত আছ, জাগিয়া উঠ, আগমনীর শুভ উদয় দর্শন কর!

এস দেবী, রাস রসসাধিনী ভক্তিরূপা সাধনা আমার! বঙ্গের মন্দিরে কুটীরে হর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বত্রই ভক্তিরূপে—সাধনারূপে প্রতিষ্ঠিতা হও! তুমি যে সুলভা, কেহ আবাহন না করিলেও আগমনী! বাঙলা যেন আর তোমায় বিসর্জ্জন না দেয়! ভক্তিহীন হৃদয়ে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। ব্রজ গোপ কুমারিদের মত সকলে প্রাণখুলিয়া বলুক—

"কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরীঃ।"
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

আগমনী গীতি

(শ্রীযুক্ত মঙ্গলা প্রসাদ গুহ পাত্র লিখিত।)

দেখ আসি পুরবাসী (আমার) এলোকেশী মা এসেছে।
(ও তাঁর) রূপের ছটায় দীপ্তি ঘটায়, দশদিক আলো করেছে॥
ঐ দেখ মা সিংহোপরে, দশ করে অস্ত্র ধ'রে
দেবগণে রক্ষিবারে—মহিষাসুরে নাশ করিছে॥

বীণাপাণি আর কমলা, দু'ধারেতে দুটী বালা ;
ঐ দেখ উপরে ভোলা—বাবা আমার ব'সে আছে ॥
বিঘ্ননাশন আর ষড়ানন, দেখ মোদের দাদা দুজন ;
রূপে তাঁদের আলো ভুবন—নন্দী দাদা মায়ের পিছে।
ওমা ও সর্ব্বমঙ্গলা "মঙ্গলা" তোর দাঁড়িয়ে আছে ;
কেমন মা তুই বল গো উমা কোলে তুলে নিলিনা যে ॥

———

শ্রীতুলসী

(শ্রীযুক্ত সদানন্দ শর্ম্মা লিখিত)

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই তুলসীকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে এমন অনেক গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের প্রাঙ্গনে তুলসী বৃক্ষ বিশেষে যত্নে নিত্য দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন। তুলসী-মাহাত্ম্যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।—

"দৃষ্ট্যাপৃষ্ট্যা তথাধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।
নবধা তুলসী দেবী ভজন্তি যে দিনে দিনে
যুগকোটী সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥"

যে হিন্দুর গৃহপ্রাঙ্গন তুলসী বৃক্ষে শোভিত নয়, হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নয়। বৈষ্ণবগণ তো বিষ্ণু অপেক্ষাও বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জলদান, তুলস

প্রদক্ষিণ, তুলসীতলে প্রণাম না করেন তিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবারই উপযুক্ত নহেন, সাধু মহাত্মাগণ নানাবিধ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসক সমান ভাবেই তুলসীর আদর করিয়া থাকেন। মোট কথা যিনি যে ভাবেই হউক তুলসীকে অনাদর করিতে পারেন না। তুলসী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিতে যাইয়া আমরা বলিয়া থাকি—

"যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাং পদে পদে॥"

তুলসী চয়ন করিতে যাইয়া বলি—

"তুলস্যামৃত নামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমিত্বাং বরদা ভব শোভনে॥"

আবার পূজার সময় তুলসীকে স্নান করাইতে যাইয়া শুধু জল ঢালিয়া চলিয়া আসিনা, সেখানেও বলিয়া থাকি—

"গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীম্॥

এই ভাবের নানা কথা আমরা শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি। তবে আজ কাল যে ভাবের রুচি লইয়া অমাদেরই ঘরের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানপত্র লইয়া আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমিক আচার ব্যবহারকে দূর ছাই করিয়া একটা কেউ কেটা হইয়া দাঁড়াতে চায়, সেই সব রুচি সম্পন্ন লোকের জন্য আমি ধর্ম্মের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া তাহাদেরই অধ্যাপক মণ্ডলী অথবা আজ কাল তাহারা যাহাদের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের উপর আসন দিতে যায়, সেই সকল শ্বেত দ্বৈপায়ন ব্যাসদিগের কথাই দুটো শুনাইব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র খুব বড়গলা করিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষের আচার ব্যবহার ভাল বলিতে পারেনা,কিন্তু যেমনি সাগরপারের সার্টিফিকেট অসিয়া তাহাদের আচার ব্যবহারের সুখ্যাতি ঘোষণা করিল অমনি তাহারাও বড় গলা করিয়া সেই সব পুরাতন বাঁধা বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

আমরা সচরাচর পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই যে, পল্লীভূমির নিরক্ষর মায়েরা নিজ কোলের দুলালের মুখে একটু তুলসীতলার মাটী, একটু তুলসী পাতার রস না দিয়া—গ্লাস গ্লাস ডাক্তারী ঔষধ গলায় ঢালেন না, তাহাতে ফল যে খারাপ হয় তাহা নয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইসব তুলসীতলার মাটী এবং তুলসী পাতার রস খেকো, পাড়াগায়ে ছেলেদের আজকালকার চল্‌তি ব্যারাম "ইন্‌ফ্যান্টাইন্ লিভার" একেবারেই হয় না।

আমার কয়েকজন বন্ধু একদিন তুলসীর মালা ধারণ সম্বন্ধে খুবই তর্ক বিতর্ক করিতে ছিলেন। আমি এ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় এই ভক্তিপত্রেই পূর্ব্বে যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রমাণ তাহাদিগকে শুনাইলাম,যদিও তাহারা তখন একপ্রকার তুলসী মালাধারণের উপকারিতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু আমার অসাক্ষাতে নানারকমে এসকল বিষয় তর্ক করিতে ছাড়েন নাই। এবার আমি শাস্ত্র যুক্তি দেখাইয়া আর তাহাদের বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না বড় বড় ইংরাজি শিক্ষিত ডাক্তার বাবুরা যাহা বলিয়াছেন তাহারই একটু আলোচনা করিব। একজন বড় ডাক্তার সেদিন বলিয়াছেন—

"তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে নিহিত আছে, ইহার কাষ্ঠের মালা ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎবেগ স্থির ভাবে রক্ষিত হয়, সুতরাং উহাতে যে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সহজেই আরোগ্য হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, আমি একটী পুরাতন হাঁপানি রোগীকে

তুলসীর মূল কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াই নিরাময় হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। তারপর তুলসীর মালা গলায় থাকিলে সহসা শরীরে কোন সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারেনা। রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীচ, প্রকাল, মণি মুক্তা প্রভৃতি মালারও যে গুণ নাই। তাহা নহে, তবে সকল জিনিসেরই এক একটী গুণ বর্ত্তমান। কিন্তু তুলসীতে অন্য সকলকার গুণত আছেই উপরন্তু একটী বিশেষগুণ অন্য সকল গুলি অপেক্ষা আছে তাই আমি অন্ততঃ রোগ প্রতিশেধের জন্যও সকলকে তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ করি। তুলসী কাষ্ঠধারী যে সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবি ও সৎপথাবলম্বী হয় তাহা বহু স্থলে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা গলায় মালা ধারণে অনিচ্ছুক তাঁহারা তুলসী কাষ্ঠ হস্তে অথবা কোমরে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারেন, তবে গলদেশে থাকিলেই উহার শক্তি অধিক প্রকাশ পায়।"

"তুলসীর রস জ্বর ও সর্দ্দি নাশক। প্রবল সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ সেবন করাইয়া আমি বহু রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি। দুই বেলা সেবন করিতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী, শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস এক তোলা পরিমাণ গরম করিয়া মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে কফজ্বর অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহা বহুস্থলে পরীক্ষিত।"

"তুলসীর রস শরীরের দুষিত রক্ত শোধন করিতে অদ্বিতীয়। ইহা বাত রক্ত ও গলিত কুষ্ঠ নাশক। কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্তকে সুস্থ থাকিতে হইলে তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রত্যহ তুলসীর রস দুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া গোমুত্র পান করিলে কুষ্ঠ ব্যাধি ভাল হয়।"

"তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে

মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া বাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন, এবং বাটীর চতুর্দ্দিকে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করুন মশক নিকটে যাইতে পারিবে না।"

"যাঁহাদের শরীরে নানাবিধ চর্ম্মরোগ আছে তাঁহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে।"

"যিনি দুই বেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাঁহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইতে থাকে। ইহা একটি কম রসায়ন নহে।"

"বীর্য্যস্তম্ভনে তুলসীর শক্তি অসীম। কিয়ৎ পরিমাণ কৃষ্ণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য স্তম্ভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ কি বলিতেছে শুনুন,—

শূরনং তুলসী মূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ
নমুঞ্চন্তি নরোবীর্য্য মে কৈকেন ন সংশয়।

"যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় হয়, তাহারা সপ্তাহে দুই দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মূল সেবন করিবেন দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত হইয়া আর অযথা শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেহে বিদ্যুৎ অবিচলিত রাখিতে তুলসীর মত আর বুঝি কাহারও শক্তি নাই।"

"তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণকালে, মটকার কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাঁধিয়া দেন, সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। ইহা বজ্র রোধক দণ্ড অপেক্ষাও গুণশালী। শাস্ত্রকার বলেন—যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয়?"

"রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বমন বন্ধ হয়। তুলসীতলের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, কেবল তুলসীতলের মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ মুক্ত হন, ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।"

"শ্বাস যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রস পান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী ঘৃতের সহিত প্রত্যহ দুইখান তুলসী মূল ভক্ষণ করিলে শরীরে আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে।"

এই ত একজন ডাক্তারের মত বলিলাম আরও বহু আলোচনা এ বিশষে হইয়াছে আমরা প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে ও সকলগুলি দেখাইয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না, কেবল স্বাস্থ্য সমাচার পত্রে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ বারের মত আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বেরা লিখিয়াছেন,—

"আমি নিজে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্ম নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রকাশ করিতেছি। বাটীর চতুষ্পার্শে তুলসী গাছ রোপণ করায় আজ প্রায় ৫ বৎসর মশার উশদ্রব খুব কমিয়াছে। পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় ধুনা গন্ধক ও কর্পূর জ্বালাইয়াও কিছুতেই উহার উপদ্রব নিবারণ করিতে পারি নাই; সন্ধ্যার সময় মশারির মধ্যে পড়িতে হইত। পরে একদিন বাটীর একটি লোককে মৌচাক ভাঙ্গিতে বলায় সে একটী পত্রযুক্ত তুলসী গাছ লইয়া মৌচাকে কিছুক্ষণ লাগাইতে থাকে। মৌমাছিগুলি কিছুক্ষণ পরে তুলসী পাতার আঘ্রাণ পাইয়া চলিয়া যাওয়ায় সে, স্বচ্ছন্দে মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া লইল দেখিয়া মনে হইল, যখন এত বড় মৌমাছি উহার আঘ্রাণে দূর হইয়া গেল, তখন মশা কেন না যাইবে। সেইদিনের ব্যপার দেখিয়া আমি আমার বাটীর

চতুষ্পার্শে কেবলই তুলসীগাছ দুই হাত অন্তর এক একটি রোপণ করি। পর বৎসর বর্ষার সময় উহার বীচি দ্বারা আরও অনেক গাছ জন্মিয়া স্থানটি জঙ্গলময় হইয়া গেল। তখন সেই বৎসর মশা অনেক কম দেখা গেল। এতাবৎ আর আমার বাটীতে মশার উপদ্রব তেমন নাই। সেইজন্য সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য এইটী প্রকাশ করিলাম। আশাকরি ভারতের প্রত্যেক গৃহস্থ যদি ঐরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে মশার উপদ্রব অনেক কমিয়া সকলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। হিন্দুমাত্রেই তুলসীগাছকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে এবং উহার নিকটে মল মূত্র ত্যাগ করে না। প্রত্যহ অন্ততঃ ২।৪ টা করিয়া পাতা খালি পেটে খাইলে যত রকমের কাশির ব্যারাম আছে, তাহার প্রতিষেধকরূপে কাজ করে। শাস্ত্রে তুলসীর অনেক গুণও আছে দেখা যায়। আজ কাল বিলাতী ঔষধের প্রচার হওয়ায় আর তুলসীকে কেহ খোঁজে না। কিন্তু সেকালের অশীতিপর বৃদ্ধ এখনও স্নানের পর তুলসী, বেলপাতা ও মহাপ্রসাদ না খাইয়া জলস্পর্শ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের স্বাস্থ্যের সহিত আজ কালকার নব্য বাবুদের মুরগী মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যও হার মানে।”

প্রাচীন শাস্ত্র যুক্তিকে অনেক সময় আমরা বুঝিতে না পারিয়া অথবা আমাদের সুখ সুবিধার অন্তরায় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকি, কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, যদি আমরা দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন ঋষিগণের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারে নিবিষ্ট থাকি তাহা হইলে আমাদের দুঃখত হয়ই না, উপরন্তু সুখের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে এই তুলসী সম্বন্ধে বহু আলোচনার বিষয় রহিয়াছে, আমরা আবশ্যক

হইলে সময়ান্তরে সেই সকলের যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ আসুন সকলে মিলিয়া সর্ব্ব-মঙ্গলদায়িনী শ্রীতুলসীদেবীর চরণে মস্তক লোটাইয়া বলি—

"বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥"

অনন্তদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী

(১)

তপনে তাপিত পথ চরণ তাপই।
মন যায় বিথাইয়ে হৃদয় বিছাই॥
ধরণী সাধন করি ধরণী হইব।
মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণ সজ্জাদি করিব॥
কহগো ললিতা সখি করি কি উপায়।
কৃষ্ণ দুঃখ সঙরিয়ে হৃদয় শুখায়॥
ললিতা কহয়ে যেই জগতের সুখ।
সুখময় তনু যার তার কিবা দুঃখ॥
কৃষ্ণপদ সুধা পশি ক্ষিতি তাপ হরে।
দরশে শীতল হয় কোটি দিবাকরে॥
কোটি গোপাঙ্গনা যার পাদুকা হইয়া।
পদতলে অনন্ত র'য়েছে ভুলিয়া॥

(২)

বঁধুয়ার গুণ শুনি, সুখী হ'য়ে কমলিনী,
ললিতারে দেন আলিঙ্গন।
তুহুঁ সে আমার সখী, আয়গো হৃদয়ে রাখি,
তুহুঁ জান বঁধুয়া মরম ॥
ললিতা কহয়ে ধনি, আমি দাসী কিবা জানি,
যার রূপে ভুলাইল তোমা।
এই মোরা ভাগ্য বাসি, ক'রেছ চরণ দাসী,
দোষের সমূহ করি ক্ষমা ॥
কাঁদি রাই বলে তবে, বঁধুরে মিলাতে হবে,
ললিতা কহয়ে যুক্তি কথা।
শাশুড়ীর কাছে গিয়া, কান্দি কান্দি কহ ইহা,
অনন্ত চলিল তব সখা ॥

(৩)

কান্দি কান্দি রাই, নিজ ঘরে যাই,
জটিলা দেখিয়ে তা।
মুখানি মুছায়ে, কহে ক্রোড়ে ল'য়ে,
কেন কাঁদিয়াছ মা ॥
স্বপনে দেখেচি, পতি অকুশল,
মনে কিছু সুখ নাই।
কহয়ে জটিলা, হইয়ে বিকলা,
সূর্য্য আরাধহ যাই ॥
কহয়ে কুটিলা, জান কত ছলা,
মিলিতে মাধব সাথ।

অসতী হইলি, কুলে কালি দিলি,
শুনি ধনী কহে বাত ॥
হও না ননদী, বাদ কি বিবাদী,
বলিলে বলিতে হয় ।
যদি সতী হ'তে, দেশে না রাখিতে,
কি গরবে এত কও ॥
ছিদ্র কুম্ভ জলে, আনিবারে গেলে,
সে কথা কি মনে হয় ।
অনন্ত উত্তর, খুঁড়িয়ে ডাগর,
হ'লে কি ডাগর হয় ॥

(৪)

কুটিলা কহয়ে আমি যাইব সংহতি ।
সূর্য্যের নিকট কিছু করিব মিনতি ॥
ললিতাদি সখী সঙ্গে কুটিলা চলিল ।
কুটিলা চলিল সঙ্গে বিষম জঞ্জাল ॥
বন প্রবেশিয়া ধনী কুটিলারে কয় ।
এই বনে বনদেবের হ'য়েছে আশ্রয় ॥
যতদিন সেই দেব বৈসে মোর হৃদি ।
ততদিন হৈতে মোর হইয়াছে ব্যাধি ॥
কুটিলা কহয়ে তবে অন্য পথে যাই ।
অনন্ত কহয়ে বনে আছে সর্ব্বদাই ॥

(৫)

পুনঃ সে কুটিলা বলে, সে দেব পাইবার কালে,
কি লক্ষণ করয়ে উদয় ।

রাই কহে সৌরভেতে, আমোদ করে এ চিতে,
সব তনু সিঞ্চিয়ে পড়য় ॥
(তখন) রাই অঙ্গ সঙ্গ হৈতে, কৃষ্ণগন্ধ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল তার নাসা।
তনুতে রোমাঞ্চ হেরে, রাধিকার পায়ে ধরে,
বলে রাখ হারাইলাম দিশা ॥
ভেঁই কহে "রুদ্র" বলি, দ্রুতগতি যাহ চলি,
সভয়ে পাইলে যাবে প্রাণ।
সেহ ভয়াতুর হৈল, দ্রুতগতি পলাইল,
অনন্তের হরিষ বিধান ॥

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ।

কুরেশের গুরুভক্তি

(অবধুত শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা লিখিত)

একবার যাদবপ্রকাশ গুপ্তভাবে রামানুজের প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাই আবার রামানুজের প্রাণনাশের উপায় উদ্ভাবিত হইল। এবার গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে নহে,—প্রকাশ্য রাজ বিচারে ;—অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ;—জন সাধারণের সম্মুখে। কাঞ্চিপুর চোল রাজ্যের অন্তর্গত। চোল রাজার নাম কৃমিকণ্ঠ। কৃমিকণ্ঠ গোঁড়ামীর মূর্ত্তি শিব-ভক্ত। গোঁড়ামী শূন্য সম্প্রদায় সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য। পরমেশ্বরের বিরাটত্বের অনুভূতির অভাবেই গোঁড়ামীর উৎপত্তি। শাক্ত

হউন, শৈব হউন, বৈষ্ণব হউন, গাণপত্য হউন, সৌর হউন, এমন কি খৃষ্টান মুসলমান হউন, যখনই দৃষ্টি স্বীয় সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ, তখনই অজ্ঞানতা। আমার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, আমার মন্ত্র ভিন্ন পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবার আর মন্ত্র নাই, পরমেশ্বর কেবল আমাদেরই বাধ্য,—মুক্তি মোক্ষ কেবল আমাদেরই ধর্ম্মবাক্সে আবদ্ধ,—আমরা না দিলে তাহা অন্য কাহারো পাইবার উপায় নাই—এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত,—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ-বুদ্ধি,— সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়ামীর ঈর্ষানল,—ঈর্ষানলের খাণ্ডবদাহন তখনই অন্তরে বাহিরে আবদ্ধ। চোলরাজ ক্রমিকণ্ঠ এই গোঁড়ামীর অন্তর্গত। তিনি শৈব ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধী।

ক্রমিকণ্ঠের রাজসভায় যাদবপ্রকাশের দল প্রবেশ করিল; রামানুজের অদ্ভূত প্রতিভার বিষয় বর্ণন করিল; রামানুজ করায়ত্ব হইলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য শৈব হইতে পারে তাহা ক্রমিকণ্ঠকে বুঝাইয়া দিল। রামানুজ নারায়ণের উপাসনা প্রচার করিলে—শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, শিবকে কেহ মুক্তিদাতা বলিয়া প্রত্যয় করিবে না;—শিবোপাসনা কালক্রমে উঠিয়া যাইবে। অতএব রামানুজকে রাজ সভায় আনিয়া শিবোপাসনা প্রচার করিতে আদেশ করা হউক।

ক্রমিকণ্ঠ রামানুজকে সসম্মানে আনিতে অনুচরসহ শিবিকা পাঠাইলেন। শিবিকা যথাসময়ে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইল। মহাবুদ্ধি কুরেশ সরল হৃদয় রামানুজকে গোপনে ডাকিয়া ক্রমিকণ্ঠের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন। এই আহ্বান সম্মানের জন্য নহে,—ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য নহে,—তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য। তিনি যাইয়া নারায়ণের মহিমা কীর্ত্তন করিলেই, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। গুরুভক্ত কুরেশ রামানুজকে একে একে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

রাজশিবিকা প্রত্যাখ্যান করাও বিপজ্জনক। কুরেশ তখন বলিলেন,

"আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়োজন নাই। আমাকে বা আপনাকে কৃমিকণ্ঠ বা তাহার সভাসদগণ কেহই চিনে না। আপনি আমার এই শুভ্র বেশ পরিধান করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করুন; আমি আপনার কষায় বসন পরিধান করিয়া কৃমিকণ্ঠের রাজ সভায় গমন করি। যাহা হয় আমারই হইবে। আপনি প্রাণ রক্ষা করুন, জগতের প্রভূত মঙ্গল হইবে।" রামানুজ তাহাই করিলেন। কুরেশের শুভ্র বসন পরিধান করিয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে কুরেশ রামানুজ সাজিয়া কৃমিকণ্ঠের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃমিকণ্ঠ পাত্র মিত্র নিয়া রাজ সভায় বসিলেন। রামানুজবেশী কুরেশকে উচ্চাসনে বসাইলেন। শেষে তাহার মুখে মুক্তিনাথ শিবমহিমা শ্রবণে উৎসুক হইলেন। কুরেশ শিবকে নারায়ণের পার্ষদ বলিয়া নারায়ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কৃমিকণ্ঠ আবার বলিলেন—"আমি শিবের মহিমা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি শিবের মহিমা কীর্ত্তন করুন।" কুরেশ আবারও শিবকে উপেক্ষা করিয়া নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন।" তখন কৃমিকণ্ঠ ব্যথিত হইলেন। কুরেশের ব্যাখ্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "শিবাৎ পরতরং নাস্তি।" কুরেশ বলিলেন, "দ্রোণমস্তি শিবাৎ পরং।"

দ্রোণ সাড়ে বত্রিশ সেরী বাট্‌কারা মাত্র। কুরেশের এইরূপ তুচ্ছীকৃত উক্তিতে কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইলেন। রাজা জানেন না যে, যাহার ব্যাখ্যায় তিনি ব্যথিত হইলেন ইনি রামানুজ নয়। তিনি রামানুজ জ্ঞানেই বলিলেন, "একবার এই শিবদ্বেষী দুর্ভাগা রাজকুমারীকে ব্রহ্মরাক্ষসের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছিল। * তজ্জন্য

* রাজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। লেখক।

ইহার প্রাণদণ্ড করিলাম না। ইহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেল।” জল্লাদগণ কুরেশকে এক প্রান্তরে নিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিল। কুরেশ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জল্লাদগণ এইরূপ আশীর্ব্বাদে দয়ার্দ্র হইল। তাহারা দুইজন কাঞ্চীপুর যাত্রী দেখিয়া তাহাদের হস্তে কুরেশকে গছাইয়া দিল এবং কিছু অর্থ দিয়া কুরেশকে কাঞ্চিপুরে পৌছাইয়া দিতে বলিল।

কুরেশ আবার শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। নিজের স্ত্রী ও পুত্র পরাশরের সঙ্গে শ্রীরঙ্গম হইতে কৃষ্ণাচলে আসিয়া ভগবান সুন্দর ভুজের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে সেখান হইতে যাদবাদ্রিতে রামানুজের নিকটে গমন করিলেন। রামানুজ কাঞ্চিপুরে আবার তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, “শ্রীশ্রীবরদরাজকে অর্চ্চনায় প্রসন্ন করিয়া চক্ষু লাভ কর।” কুরেশ অনন্তযোগ ভক্তিভরে বরদরাজকে প্রসন্ন করিলেন। বরদরাজ বর দিতে আবির্ভূত হইলে কুরেশ দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন—প্রথম বরে চতুর্গ্রামের পরমপদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় বরে চতুর্গ্রামের রাজগণের মুক্তি প্রাপ্তি। বলা বাহুল্য কৃমিকণ্ঠও এই চতুর্গ্রামেরই একজন নির্দ্দেশ কর্ত্তা।

কুরেশ বর লাভ করিয়া রামানুজের নিকট গমন করিলেন। রামানুজকে বর প্রাপ্তির কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন রামানুজ বলিলেন, “সকলের জন্য বর চাহিয়াছ, কিন্তু আমার জন্য কি চাহিয়াছ? এবার আমার জন্য তোমার চক্ষুদান প্রার্থনা কর। তোমার চক্ষু না থাকায় আমারও চক্ষু নাই।” কুরেশ আবার ভগবান বরদরাজের নিকটে আসিয়া চক্ষুষ্মান হইয়া গমন করিলেন। শেষে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণাচলে আসিলেন। ভগবান সুন্দর ভুজের উপাসনায় উপবেশন করিলেন।

কুরেশের পুত্রের নাম পরাশর। পরাশর প্রতিভার মূর্ত্তি পরম ভাগবত তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এক বিবরণ আছে। তাহার বয়স যখন

মাত্র চারি পাঁচ বৎসর, তখন এক মহা পণ্ডিত কাঞ্চিপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে অগন্য শিষ্য, জয় ডঙ্কা, তুরী ভেরী পনগ প্রভৃতি। সহর টলটলায় মান হইল। পণ্ডিতের আলোচনা সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির যশোকীর্ত্তন। সর্ব্বত্র লোক তাঁহার দর্শনে উদ্‌গ্রীব। তিনি গণনায় সিদ্ধ পুরুষ। আকাশের তারা, পাতালের বালি তিনি সমস্ত নির্ভুল করিয়া গণিতে পারেন। লোকের ভূত ভবিষ্যতের ত কথাই নাই। শিশু পরাশরের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ করিল।

পরাশর তখন ধূলোখেলা করিতেছিলেন। তিনি এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া পণ্ডিতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পণ্ডিতকে বলিলেন, "বলুন ত আমার হাতে কতগুলো ধূলো আছে?" পণ্ডিত বালকের প্রশ্ন শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিলাম।" মহাভক্ত কুরেশের পুত্র পরাশর শৈশবে এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। রত্নোদ্ভবের একমাত্র স্থান রত্নাকর—যথার্থ প্রতিভার উৎপত্তি স্থান সত্ত্বগুণময় ভগবদ্ভক্তের সংসারে।

যুগল-মিলন

(শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

হের এ নিকুঞ্জে মধুর যুগল মিলন রে!
রাধাশ্যাম,—রাধাশ্যাম, বল আনন্দ বদনে রে!!
দোঁহার ভাবে দোঁহে ভোর হসিত আনন রে!
নয়ন ভাসিছে যেন অমিয়া সাগরে রে!!
দেহভাব নাহি মনে, জ্ঞানের অতীত রে!

কোথা ছার এ সংসার ডুবিয়া গিয়াছে রে !!
অভাব নাহিক হেথা, প্রেমানন্দ পূর্ণ রে !
আঁধার ঘুচা'য়ে উঠে তুরীয় আলোক রে !!
জ্ঞান-যোগ-ধ্যানানন্দ প্রেমেতে মিশাল রে !
চরণ সরোজে হের জুটিল সকলি রে !!
মহা কারণ আনন্দে ভাসিছে সংসার রে !
দীনের দীনতা গেল হারা'য়ে আপনারে !!

ভক্তি ও প্রেম

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

(২)

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধের স্মরণ করিতে করিতে উন্মধ্যস্থ বিক্ষেপ সকল তিরোহিত হইয়া উহাতে নৈরন্তর্য্য সিদ্ধ হইলে তাহাকে ধারণা বলা হয় ; ধ্যেয় বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভাবনারই নাম ধ্যান ; ধ্যানে স্থৈর্য্যভাব সিদ্ধ হইলেই উহা অনুস্মৃতি বলিয়া কথিত হইতে থাকে। এই অনুস্মৃতিসহ ভজনকালে সাধকের নিত্যসিদ্ধ ভাব জাগ্রত হইয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া রসোপলব্ধি করাইয়া থাকে।

ভজনের পরিপক্কাবস্থায় শ্রীভগবৎকৃপায় তদীয় আকর্ষণ রতিরূপে প্রকাশমান বা উদিত হইয়া থাকে। তখন সাধকের চিত্তস্নিগ্ধকারিণী ভাবময়ী বৃত্তি স্ফুটনোন্মুখী হইয়া উঠে, এবং প্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ কতকগুলি

লক্ষণ তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, যথা—কান্তি (ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতা)' অব্যর্থকালত্ব (ভজনহীন বৃথা কালক্ষেপ না করা), বিরক্তি (শ্রীভগবৎসম্বন্ধশূন্য বিষয়ে আসক্তির অভাব বা অরুচি), মানশূন্যতা (অমানিত্ব প্রকাশ), আশাবন্ধ (শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস), ব্যাকুলতা, নামগানে সদারুচি, শ্রীভগবৎগুণবর্ণনে আসক্তি, শ্রীভগবল্লীলা বিশেষের প্রকাশ স্থলে প্রীতি প্রকাশ ও বাসের অভিলাষ পোষণ, ইত্যাদি। এই লক্ষণগুলিকে শাস্ত্র শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা জ্ঞাপক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই রতির পরিপক্কাবস্থায় সাধকের শ্রীভগবানের মমতাযুক্ত চিত্তবৃত্তিতে এক অপরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। বিঘ্নাদিদ্বারা হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে সাধকের চিত্ত স্নেহে দ্রবীভূত, অনুরাগে অন্ধ এবং প্রণয়ে বিশ্বাসপূর্ণ হইয়া থাকে। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন সেবনাদি দ্বারা এই ভাব অনুভাবিত ও উদ্দীপিত হইয়া আস্বাদ্য হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে 'রস' আখ্যায় অভিহিত করাও হয়। এই রসই প্রেম।

যাহা অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া রতিরূপ স্থায়ীভাব বিভাবিত ও উদ্দীপিত হয়, তাহার নাম বিভাব ; ইহা নানাবিধ হইয়া থাকে। অনুরাগ-সম্পন্ন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণই আশ্রয়, এবং শ্রীকৃষ্ণস্মারক বস্ত্রালঙ্কারাদিই উদ্দীপক হইয়া থাকে। ভাববিজ্ঞাপক নৃত্যগীতাদিকেই অনুভব বলা হয়।

চিত্তের এবং দেহের ক্ষোভক প্রকাশ্য ভাবগুলির নাম সাত্ত্বিকভাব, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়। যখন দেহে ইহাদের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই প্রকাশগুলিকে সাত্ত্বিকভাব বকার বলা হয়। এই সাত্ত্বিকভাব স্নিগ্ধ, দিগ্ধ বা মিশ্রিত, এবং রুক্ষ, এই

তিন প্রকারে হইয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধভক্তে স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব, জাতরতি ভক্তে দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব, এবং অজাতরতি ব্যক্তিতে কখন কখন অকস্মাৎ আনন্দবিস্ময়াদির উদয়ে রূক্ষ্ম সাত্ত্বিকভাব দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত প্রকম্পিত অথচ গোপনযোগ্য দুই একটি ভাবের উদয় হইলে উহাকে ধুমায়িত সাত্ত্বিকভাব কহে। কষ্টে গোপন করা যায় এমন দুই তিনটি ভাবের একত্র সমাবেশকে চালিত সাত্ত্বিকভাব বলা হয়। গোপন করা চলেনা এমন চারিপাঁচটি ভাব যুগপৎ উদিত ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বলে। এবং এককালে উদিত ও অত্যন্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত ছয় সাত বা আটটি ভাবের নাম উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। এই উদ্দীপ্তসাত্ত্বিক ভাবই মহাভাবোদয়ে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া সুদ্দীপ্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রকার এক বা একাধিক সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ অন্য কারণেও হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে আভাসমাত্র বলা হয়। মুমুক্ষুজনে সত্যাভাস হইতে, এবং কম্মি ও বিষয়ীজনে সত্ত্বাভাস হইতে এইপ্রকার ভাববিকার উৎপন্ন হয়। পিচ্ছিলচিত্ত মানবে নিঃসত্ত্ব ভাববিকার দৃষ্ট হয়, আর ভগবদ্বিদ্বেষীজনে প্রতীপ বা প্রতিকুল ভাববিকার দেখা যায়।

জাতরতি অনুরাগী ভক্তে সাত্ত্বিক ভাব ব্যতীত আস্বাদনপোষক আরও বহুবিধ লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে, উহাদিগের সাধারণ নাম ব্যভিচারী ভাব। প্রধান ত্রয়োত্রিংশতিটি লক্ষণে এই ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। যথা,— (১) নির্ব্বেদ (আত্মনিন্দা), (২) বিষাদ (অনুতাপ), (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি (নিজের অপকর্ষত্ব জ্ঞাপন), (৫) শ্রম (নৃত্যাদি এবং তজ্জনিত ঘর্ম্মাদি), (৬) মদ (ক্ষণিক মত্ততা), (৭) গর্ব্ব (শ্রীভগবদাশ্যাহংকার), (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), (১০) আবেগ (চিত্তসম্ভ্রম), (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি (মৃগীরোগ লক্ষণ প্রায়),

(১৩) ব্যাধি (জ্বর), (১৪) মোহ (মূর্চ্ছা), (১৫) মৃতি (মরণলক্ষণ প্রায়), (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য (জড়তা,) (১৮)ব্রীড়া; (লজ্জা), (১৯) অবহিত্থা (আকার গোপন), (২০) স্মৃতি (অনুভূত বস্তুর স্মরণ), (২১) বিতর্ক (অনুমান), (২২) চিন্তা, (২৩) মতি (শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ) (২৪) ধৃতি (ধৈর্য্য), (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা), (২৭) উগ্র (তীক্ষ্ণ স্বভাব), (২৮) অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), (২৯) অসূয়া (গুণে দোষারোপ), (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি (স্বপ্নদর্শন) এবং বোধ (জাগারণ)। ভক্তের চিত্তের গভীরতা অনুসারে এই সকল ভাবের প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। কখন গম্ভীর চিত্তে অপ্রকাশ অথবা অল্পপ্রকাশ, এবং কখন বা তরলচিত্তে অতিশয় প্রকাশ হইতে দেখা যায়। এই ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সাধারণতঃ ভক্তসঙ্গই স্বচ্ছ এবং শান্ত স্থায়ী ভাব লাভের কারণ হইয়া থাকে। আবার কখনও বা ভক্তসঙ্গ ব্যতীত শুধু ভজনের পরিপাকে সামান্য অথচ স্থায়ীভাব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

রস বা আস্বাদ্যভাব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ বিধায় বিভক্ত। ইহাদের এইরূপ বিভাগ থাকিলেও আবার পরবর্ত্তীরসে পূর্ব্ববর্ত্তী রসের সমাবেশ ক্রমে এক মধুরে সকলরসের সমাবেশ দৃষ্ট হয়, এবং তজ্জন্য ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলরস বলা হইয়া থাকে। শান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি, পরব্রহ্ম, নারায়ণ ও পরমাত্মা এবং শান্ত-দান্ত-শুচী বশী-প্রভৃতি-গুণ সম্পন্ন। দাস্যে তিনি প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল, সখ্যে তিনি বিদগ্ধ সুচতুর, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী, এবং বাৎসল্যে তিনিই কোমলাঙ্গ, বিনয়ী ও সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত রূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। মধুর রসে তিনিই আবার রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য এবং প্রেমমাধুর্য্যের আধার হইয়া রহিয়াছেন। এই মধুর শ্রীকৃষ্ণ সেবাপরায়ণা প্রেয়সী সহায়ে বা আশ্রয়ে সেবিত ও

আস্বাদিত হইয়া থাকেন। মধুররসে সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগাদি সকল অবস্থাই বর্ত্তমান।

মধুর রসের আস্বাদনে নাম, গুণ, নৃত্য, বেণুনাদ, বসন্ত কোকিলকাকলী নবীনমেঘ, ময়ূর কণ্ঠ, চন্দ্র প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব; এবং কটাক্ষ, হাস্য, শোভা, দীপ্তি, বিকার প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব কখন ধুমায়িত, কখন জ্বলিত, কখনও দীপ্ত, কখনও উদ্দীপ্ত, এবং কখনও বা সুদ্দীপ্ত হইয়া আস্বাদন পোষক হইয়া থাকে। প্রিয়তা রতি বা প্রেমই মধুর রসের স্থায়ীভাব।

মধুর রসাশ্রিত ভক্ত দাস্যরসাশ্রিত ভক্তের নিকট আপনার ভাব গোপন করিয়া রাখেন, কারণ উভয় রসের মধ্যে একটু প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ আছে। সখ্যরসের সহিত কোন প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ না থাকায়, সখ্য ভক্তের নিকট মধুর ভক্ত আপন ভাব গোপনও করেন না। বাৎসল্যরসের ও মধুররসের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ আছে, তবে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং সেইজন্য বাৎসল্যভক্তের নিকট প্রকাশ অপেক্ষা গোপনের ভাব বেশী। মধুর রসের লীলামাধুর্য্যাধার শ্রীকৃষ্ণ সকল রসের আধার বলিয়া মধুরভক্ত মাধুর্য্যের ভিতর দিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী সকলরসের অনুভব করিয়া থাকেন।

উজ্জ্বল মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-চূড়ামণি। নায়ক ব্যতিত মধুর রসের সম্ভাবনাই হয় না। প্রিয় ও প্রিয়া লইয়াই মধুর রসের অভিব্যক্তি উভয়ে যেন মধুর রসনদীর দুইকূল এবং উভয়ের মধ্যেই মধুর রসের প্রবাহ। 'নায়ক চূড়ামণি' বিশেষণে শ্রীগোকুল বৃন্দাবনের কৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন, কারণ এইখানেই তাঁহার রসলীলার পূর্ণতম বিকাশ, এই খানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম নায়কত্ব উজ্জ্বলভাবে বিকশিত। উহা প্রধাণতঃ চতুর্ব্বিধ, কখন গম্ভীর, বিনয়ী এবং মানদরূপে তিনি ধীরোদাত্ত নায়ক, কখন প্রেয়সীবশ, নিশ্চিন্ত, নবযৌবন সম্পন্ন এবং নৃত্যগীতকলাকুশল রূপে তিনি ধীরললিত

নায়ক, কখনও বা উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, ক্রুদ্ধ ও ছলপরায়ণ রূপে তিনি ধীরোদ্ধত নায়ক, আবার কখনও বা ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রদর্শী রূপে তিনিই ধীরশান্ত নায়ক। ইহাদের প্রত্যেক রূপে তিনি কখনও পতিভাবে, কখনও বা উপপতিভাবে প্রকাশমান। প্রত্যেক ভাবে আবার কখনও অনুকূল, কখনও দক্ষিণ বা সমদর্শী, কখনও শঠ, এবং কখনও বা ধৃষ্ট।

এই রসের আশ্রয়াবলম্বন নায়িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধা, তন্মধ্যে পরকীয়া ভাবেই রসোল্লাসের আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, কারণ স্বকীয়াভাব নিয়মনিবদ্ধ, পরকীয়াভাব নিয়মসীমা অতিক্রান্ত অসীম। এই দ্বিবিধ নায়িকার প্রত্যেকে আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের আবার ধীরতা, অধীরতা ও এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রভাবের ধীরাধীরতার দ্বারা ও ত্রিবিধ ভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অবস্থানন্তর ভেদে ইহাদের প্রত্যেকের আবার নিম্নোক্ত অষ্ট প্রকার প্রকাশ হইয়া থাকে, যথা,—অভিসারিকা, বাসকসজ্জ্যা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা (বঞ্চিতা), খণ্ডিতা (মানিনী), কলহান্তরিতা (তাপিতা), প্রোষিতভর্ত্তৃকা (বিরহিতা), ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা (আজ্ঞাকারী কান্তপ্রাপ্ত)। সপক্ষ-বিপক্ষা মুখ্যাদিভেদে নির্দ্দিষ্ট সখী বা সহচরীগণ ভাবরস পুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকেন। মধুর রসের ক্রমোৎকর্ষে প্রেম যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব অভিধেয় কয়েকটি অবস্থার অধীন হইয়া থাকে। প্রেমে যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহার নাম স্নেহ, স্নেহের আধিক্য হেতু যে বক্রতা বা কৌটিল্য, তাহার নাম মান; ঐক্যভাবনাময় সম্ভ্রমরহিত যে বিশ্বাস, তাহার নাম প্রণয়; প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যখন দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, সেই অবস্থার নাম রাগ; যে অবস্থায় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অনুভূতিতে নূতন ও অপূর্ব্ব ভাবে পরিদৃষ্ট হয়েন, তাহার নাম অনুরাগ; অনুরাগের উৎকর্ষে যখন প্রেমবৈচিত্ত বা বিচ্ছেদের অন্যবিধ স্ফূর্ত্তি ক্রিয়ান্বিত

হইয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম ভাব; এবং এই ভাবাবস্থার পরাকাষ্ঠা বা পরিবর্দ্ধিত অবস্থাই মহাভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই মহাভাব আবার রূঢ় এবং অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। যে অবস্থায় নিমেষমাত্র অদর্শনও অসহ্য হইয়া পড়ে, তাহার নাম রূঢ়ভাব; আর যে অবস্থায় কৃষ্ণদর্শন সুখের নিকট অপর সকল সুখই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধহয়, কৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ সকল প্রকার জ্বালা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে। এই অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন এবং মাদন এই দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। যে অবস্থায় নায়িকাতে সুদ্দীপ্ত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখিয়া নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন, তাহার নাম মোদন; এবং যে অবস্থায় নায়িকা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ দেখিয়া নিজে সর্ব্বভূতে অনন্ত হইয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই মাদন বলা হয়। অধিরূঢ় মহাভাবের প্রকাশ হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এমন কি যেখানে কিছুমাত্র চৈতন্যের বিকাশ আছে, তাহাতেই সাত্ত্বিক ভাব বিকারের কোননা কোনটি পরিস্ফুট হইবেই। এই মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধা, শ্রীরাধা ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন নায়িকাতেই কখনও ইহার উদয় হয় নাই। শ্রীরাধার মহাভাব প্রভাবে দ্বারকায় মহিষী আলিঙ্গনে আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণও বিরহসন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। দিব্যোন্মাদ এই মহাভাবের একটি বৃত্তিভেদ মাত্র।

স্থায়ীভাবের প্রথমাবস্থায় নায়কের জন্য নায়িকার যে উৎকণ্ঠাময়ীরতি, সঙ্গলাভের ইচ্ছাই যাহার বিশেষত্ব, উহার নাম পূর্ব্বরাগ। রসের প্রবাহ দুইটি পথে বহিয়া থাকে, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ, অথবা বিয়োগ ও সংযোগ কিম্বা বিরহ ও মিলন। পূর্ব্বরাগ এই বিপ্রলম্ভরসের একটী শাখা। ইহা দশবিধ লক্ষণে পরিস্ফুট হয়, যথা,—

"লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্রং ব্যাধিরুন্মাদো মোহমৃত্যুর্দ্দশাদশ॥"

লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। মান ও বিপ্রলম্ভ রসের একটি শাখা। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে থাকিয়াও তদ্বিরহের বোধই প্রেমবৈচিত্ত্য, ইহাও বিপ্রলম্ভ রসের একটি শাখা। বিপ্রলম্ভরসের চতুর্থ শাখা প্রবাস, এই অবস্থায় নায়ক ও নায়িকার মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকে। সম্ভোগ, সংযোগ বা মিলন নামক রসপ্রবাহ ইহাদেরই পরিপোষক। নায়ক শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্ব মিলনেই প্রতিষ্ঠিত মিলন ব্যতীত রসের কোন সার্থকতাই নাই। বিপ্রলম্ভের ন্যায় মিলনও চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরসের পর যে মিলন, উহার নাম সংক্ষিপ্ত মিলন, মানের পর অসূয়া-মাৎসর্য্যাদি রোষাভাস মিশ্রিত মিলনই সঙ্কীর্ণ মিলন; প্রেম বৈচিত্ত্যের পর সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ মিলন; এবং প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান মিলন। মিলনে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত প্রকার বিলাসমাধুর্য্যে নায়িকাকে নিমজ্জিত করতঃ তদীয় মনোরথে সমাসীন হইয়া রমণ বা আনন্দদান করেন বলিয়া মিলনের একটি নাম রমণ। এই প্রকার আত্মন্তবরূদ্ধসৌরভ রমণেই তিনি কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার একটিনাম রাম।

শ্রীগুরুনির্দ্দিষ্ট একাদশভাবে ভাবিত হইয়া তদনুকুল, শ্রবণ'কীর্ত্তন স্মরণাদির দ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণতম কৃষ্ণলীলাধ্যানে ভক্তের সিদ্ধভাব জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং তখন এই রসবিশেষের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেইকালে ভক্তের যে সকল ভাব লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সাধারণ জগতের কোন যুক্তিই তাহার একটিরও কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ নহে। উহা অচিন্ত্য ভাব প্রসূত তাই কথিত হইয়া থাকে,—

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়॥"

সুতরাং আমিও উহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার প্রয়াস আপাততঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শুধু উহাদের যথা জ্ঞান নামনির্দ্দেশ মাত্র করিয়াই, সচ্চিদানন্দময়ী সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীগুরু এবং তদীয় পদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের চরণবন্দনাদি করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করো গুরু বৈষ্ণবচরণে॥"

সম্পাদক মহাশয় এই দীন অধমকে ভক্তিদেবীকে সাজাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন। ভক্তিদেবীকে ভক্তই সাজাইবেন, এ অভক্ত কেমন করিয়া সে দুষ্প্রয়াস করিবে? যদি ভক্ত মহাত্মাগণ নিজগুণে আদর করিয়া এই ভক্তিদেবীকে তাঁহাদের হৃদয়াসনে বসাইয়া রাখেন, তবেই যথার্থ সজ্জা হইবে। দেখিবেন ত তাঁহারাই, সুতরাং অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন কি? প্রবন্ধের উপসংহার করিলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, ভক্তি ও প্রেমের কিছুই বলা হইল না। যদি কৃপাময় পাঠকবৃন্দের অযাচিত করুণা এই অধমের মস্তকে বর্ষিত হয়, তবে সেই অনন্ত রসসমুদ্রের পিযূষরস, শ্রীগুরুকৃপায় যাহা সন্ধান পাইয়াছি, তাঁহার কৃপায় মাঝে মাঝে এক এক বিন্দু ভক্তসমাজে ছড়াইবার আশা রাখি। হরে কৃষ্ণ রাম!

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(১২)

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত)

(ব্যাস-পূজা)

"ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর,
হেরি গোরাচাঁদের ছটা।
কত উঠে চিতে নারে থির হইতে,
প্রতি অঙ্গ নব পুলক ঘটা॥"—(নরহরি)

নিতাই ও নিমাইর চিত্ত একই ভাবের প্রেরণায় মিলিত হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ দেখিতেছেন যেন দুটী ভাই। দু'জনেই কৃষ্ণ কথা রসে বিহ্বল। আর ভক্তগণ সে আনন্দসুধা ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন।

নিমাই নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! কাল পূর্ণিমা তিথি ব্যাসপূজার দিন, আপনার ব্যাস পূজা কোথায় হইবে?"

নিতাই উঠিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরিয়া আনিয়া বলিতেছেন, "এই বামণার ঘরেই আমার ব্যাস পূজা হইবে।"

তখন প্রভু মধুর হাসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন- "পণ্ডিত! ব্যাস পূজা তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় ভার প'ড়বে দেখিতেছি!"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তোমার কৃপায় আমার কিছুই কষ্ট হইবে না, ঘরে ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি পূজার সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে, কেবল "পূজাপদ্ধতি" পুঁথি খানা চাহিয়া আনিতে হইবে!"

প্রভু শ্রীবাসের কথায় বড়ই প্রীত হইলেন। সকলে "হরি হরি ধ্বনি করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীবাসের গৃহাভিমুখে চলিলেন। এই শ্রীবাস অঙ্গনই প্রভুর অতি প্রিয় স্থান। দ্বারে কপাট পড়িল, আর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিতাই ও নিমাই হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিতাইর সহিত নিমাইর আজ প্রথম কীর্ত্তনানন্দ। দুই প্রভুরই আনন্দের অবধি নাই, দুই ভাইকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। হুঙ্কার গর্জ্জনে যেন ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে বোধ হইতে লাগিল। আবার কাহারও মূর্চ্ছা হইতেছে। প্রভুদ্বয় পরস্পর পরস্পরের চরণ ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উভয়েই সুচতুর, কেহই একার্য্যে সক্ষম হইতেছেন না। আবার প্রেমানন্দে উভয়ে গড়াগড়ি দিতেছেন। অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ভক্তগণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া স্থির করিবেন, কিন্তু সেই অধর প্রভুদ্বয়কে কে ধরিয়া স্থির রাখিবে?

দুইভাই উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে কোলাকুলি করিলেন, তখন প্রভুর বলরাম ভাব হইল। তিনি নৃত্য ত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় বেগে ছুটিয়া গিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন! তাঁহার দেহে ধবল দীপ্তি প্রকটিত হইল, তিনি "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া ভক্তগণকে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, আর নিতাইকে বলিলেন, "শীঘ্র আমার হল মূষল দাও!"

নিতাই "এই লও" বলিয়া তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিলেন, আর তিনিও তাহা পাইলেন বলিয়া শান্ত হইলেন! কিন্তু "মদ আনো" "মদ আনো" বলিতে বিরত হইলেন না।

ভক্তগণ তখন বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। কি করা যায়! তখন সকলে যুক্তি করিয়া ঘটে করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু ভক্তগণকে সেই জল কিছু কিছু দিয়া আপনি পান করিলেন। যেন প্রকৃতই বারুণী পান করিতেছেন! ভক্তগণ প্রভুকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বলরামের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রভু "নাড়া" "নাড়া" বলিয়া ডাকিলেন, এবং একটী বিচিত্র কথা বলিলেন, "আমি অদ্বৈত আচার্য্যকে নাড়া বলিয়া ডাকিতেছি! তাহার হুঙ্কারেই আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।" এবং—

"সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার॥"

ভক্তগণ আজ নিতাই সান্নিধ্যে নিমাইর চিত্তে নব নব ভাবের বিকাশ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

একটু পরে নিমাই বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, এবং শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি কি কিছু চাঞ্চল্য করিলাম?"

শ্রীবাস বলিলেন, "কই কিছু না।" তখন প্রভু ভক্তগণকে আলিঙ্গন দান করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন।

নিতাই শ্রীবাসের গৃহে রহিলেন, আর এই স্থানে থাকিয়া তিনি অনেক লীলা করিয়াছিলেন সে সকলই আমরা ক্রমে ক্রমে বলিব।

নিতাইকে বলিয়া নিমাই গৃহে গেলেন, এখন নিতাই একাকী। প্রভুকে দেখিয়া নিত্যানন্দ পরিপূর্ণ আনন্দ পাইয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান হারা ও দিশেহারা অবস্থা। প্রভুর ভগবান ভাব দেখিয়া অবধি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছেন।

নিতাই দ্বাদশবর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে বহুদিন অবস্থান করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন না। এখন নবদ্বীপে আসিয়া তিনি পূর্ণকাম হইয়াছেন। দণ্ড কমণ্ডলু শুষ্ক সন্ন্যাস ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র। নিতাই বুঝিলেন যখন তাঁহার অভিলষিত বস্তু পাইলেন তখন আর ইহাদের প্রয়োজন কি ?

তখন রাত্রিকাল—বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া আপনার দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

প্রাতে শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিত দেখিলেন, নিতাইর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু ভগ্নাবস্থায় নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রভুকে এই দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গার কথা জানান হইল। তিনি শ্রবণ মাত্র সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন।

নিমাই দেখিলেন নিতাইর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি আপন মনে উচ্চহাস্য করিতেছেন আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতেছেন। নিমাইকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ কি যেন বলিলেন। কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। প্রভু তখন নিতাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, আর আপন হাতে গঙ্গায় ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু ভাসাইয়া দিলেন।

চঞ্চল নিতাই গঙ্গায় নামিয়া আরও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তিনি জলে

কুম্ভীর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। আর গদাধর শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাহা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিতাই কাহারও কথা শুনিতেছেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে আহ্বান করিলে তিনি সত্বর উঠিয়া আসিলেন। নিমাইর আজ্ঞা পালনে নিতাই বড় সতর্ক। তিনি সর্ব্বাবস্থায়—"চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সস মানে।"

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিতাইর এ কিরূপ ব্যবহার, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ভগ্ন করিলেন কেন?

নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইয়াছেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণকানাই। যখন কানাইকে পাইলেন তখন আর বিধি রক্ষার প্রয়োজন কি?

"বুঝি তাঁর সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল।
তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল॥"

প্রভুকে পাইয়া নিতাই প্রেমোন্মত্ত, তাঁহার প্রেমধর্ম্মে ত শুষ্ক সন্ন্যাস চিহ্ন দণ্ড কমণ্ডলু থাকিতে পারেন না। তাই দণ্ড কমণ্ডলু ভগ্ন হইল আর প্রভু তাহা স্বহস্তে জাহ্নবী জীবনে ভাসাইয়া দিলেন। নিমাইকে পাইয়া নিতাইর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা বৃন্দাবন দাসের নিপুন তুলিকায় কেমন মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু?
কোথা বা বসন গেল—নাহি আদি মূল॥"

স্নানের পর নিতাই শ্রীবাসের বাড়ী আসিয়া ব্যাস পূজা করিতে বসিলেন। স্বয়ং শ্রীবাস পূজার আচার্য্য, ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা নৃত্য করিতেছেন এবং সুমধুর গীত গাহিতেছেন, পূজাস্থলে সম্মুখে ব্যাসাসন স্থাপিত, এক পার্শ্বে থরে থরে পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ দীপ, ও নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে, আর নিতাইকে লইয়া শ্রীবাস

মধ্য স্থলে বসিয়া আছেন। শ্রীবাস পূজা সমাপ্ত করিয়া ফুলের মালা নিতাইর হাতে দিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ!" এই মালা লও, ইহা মন্ত্র পড়িয়া ব্যাস দেবকে অর্পণ কর।

নিতাই তখন বাহ্য হারাইয়াছিলেন, তিনি এ জগতে নাই। শ্রীবাসের কথা শুনিতে পাইতেছেন কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রতি কথার উত্তরে কেবল "হাঁ" "হাঁ" বলিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন— শাস্ত্রের বিধান স্বহস্তে মালা দিতে হয়, ব্যাস দেব তুষ্ট হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন দিবেন। আমি মালা দিলে ত হইবে না?" নিতাই কিন্তু মালা হাতেই ধরেন না। শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ বলিলেন তখন নিতাই অবশের ন্যায় মালা হাতে লইলেন।

শ্রীবাস বলিলেন, "বল, নমো ব্যাসায়।"

নিতাই বলিলেন, "হাঁ" শ্রীবাস বলিলেন, "হাঁ কি?—বল নমো ব্যাসায়" কিন্তু নিতাই বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতেছেন—তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

নিতাই মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার উপরদিকে নৃত্য করিতেছিলেন। নিতাই যে অবশ চিত্তে তাঁহাকেই খুঁজিতেছেন তাহা বুঝা গেল। তখন ভক্তগণেরদ্বারা প্রভুকে ডাকান হইল।

শ্রীবাস প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু! তোমার শ্রীপাদ ব্যাস পূজা করিতেছেন না। মন্ত্রপাঠ না করিয়া কি যে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এ কি করিতেছেন, ব্যাস পূজা করুন।" ব্যাস পূজা হইতেছে কি, কি হইতেছে নিতাইর তাহা জ্ঞানই নাই। তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়া খল খল করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। নিমাই-

চাঁদ তাঁহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া আছেন। এতক্ষণ তিনি তাঁহার প্রাণের নিমাইকেই খুঁজিতেছিলেন। এখন সেই নিমাই তাঁহার সম্মুখে। তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। প্রভুকে নিকটে পাইয়া হাতের মালা প্রভুর গলায় পরাইয়া দিলেন।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের গলদেশে মাল্য অর্পিত হইলে তদ্দণ্ডে এক অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল। নিমাই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিমাইর এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি পরে নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম একবার দর্শন করিয়াছিলেন। পরে পুরীর রাজার সাহায্যে তিনি তাহা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপি আছেন।

এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি অপূর্ব্ব, কোটি সূর্য্যসম জ্যোতিশালী। ইঁহার "উর্দ্ধোত্থিত শ্যামভুজদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ ধৃত, রামরূপে ইনি যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা তাহারই নিদর্শন। মধ্যের নীলদ্যুতি হস্তদ্বয়ে মধুর মুরলী রহিয়াছে, শ্যাম-রূপে ইনি যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা তাহারই দ্যোতক। নিম্নের পীতকান্তি করদ্বয়ে দণ্ড কমণ্ডলু শোভিত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপের ইহাই সাক্ষাৎ চিহ্ন,—"তিনে এক, একে তিন অভেদ মূরতি।"

আমরা এখন বাজারে ষড়্ভুজ মূর্ত্তির নানারূপ চিত্রপট দেখিতে পাই, তাহার উদ্ভব এইরূপে হইয়াছিল।" (অচ্যুত বাবু)

"ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ।
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন॥
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন।

চৈঃ ভাঃ

নিতাই মূর্চ্ছিত, ভক্তগণও প্রভুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল

হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীনিমাই আপন ভাব সম্বরণ করিয়া নিতাইর নিকট বসিলেন। নিমাই, নিতাইর শ্রীঅঙ্গে আপন পদ্মহস্ত বুলাইয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ, সঙ্কীর্ত্তন কর, জীবকে প্রেমদান কর, তোমার যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিতরণ করিয়া জীব উদ্ধার কর। তোমার ত সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও? আমি ত তিলেক তোমা ছাড়া নই, তোমাকে ছাড়িয়া যে আমাকে ভজনা করে, তাহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নহি।"

নিতাইর বাসনা যে কত মহৎ তাহা প্রভু জগৎবাসীকে দেখাইলেন। নিতাইর বাসনা এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক।

প্রভুর হস্ত স্পর্শে নিতাই বাহ্য পাইলেন। নিতাই প্রেমে ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার দুই কমল নয়ন দিয়া নদী-স্রোতের ন্যায় অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতেছে। অসীম শক্তিধর নিতাইর পক্ষে ইহা একটুকুও অস্বাভাবিক নহে।

তখন—"সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিল বচন।
পূর্ণ হইল ব্যাস পূজা—করহ কীর্ত্তন॥"
তখন—"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত॥"
তখন—"নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঁই।
মহা মত্ত দুই ভাই কারো বাহ্য নাই॥"
তখন—"সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস পূজা মহোৎসব মহা কুতূহল॥"

এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ব্যাসপূজার নৈবেদ্য সকল প্রভু নিজ হস্তে ভক্তগণ মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

ফিরে চাও

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত)

হাজার পরাণ গুম্‌রে মরে
মেঘের ঘোম্‌টা চাঁদেরপরে
রুদ্র তেজে সরিয়ে দাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও।

শিশির ভেজা শেফালিটি
ধরার কোলে প'ড়ছে লুটি ;
কোমল করে তুলে নাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও।

যমের হাঁক আর পুত্র মুখ
টান্‌ছে দোঁহে ভাঙ্গছে বুক
মোহের বাঁধন খুলে দাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও।

মদ্যরসের মাদকতায়
মত্ত পরাণ আরও চায়
নিশার ঘোর ভেঙ্গে দাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও।

বিষয় বিষে আধ মরা আজ
কালের ইন্দ্র হান্‌ছে বাজ
পরশ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও।

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব আতুর
লক্ষ পতির বক্ষ ফতুর
ভক্তি প্রেমে ভরিয়ে দাও
ওগো দয়াল ফিরে চাও ॥

শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থে

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ লিখিত)

এবার গ্রীষ্মাবকাশে আমি সপরিবারে ৺সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণছলে কৃষ্ণনাম প্রচার উদ্দেশ্যে যে সকল তীর্থ দর্শন করিতে বৎসরাধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমি রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই সকল তীর্থ দুই সপ্তাহের মধ্যেই দর্শন করিয়া আসিলাম। কিন্তু দর্শন করিয়া আসিলাম, একথা বলা ঠিক নহে। সেকালে যাঁহারা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র তীর্থক্ষেত্রেও অন্ততঃ দুই এক দিবস করিয়া বাস করিতেন এবং সঙ্কল্পিত গন্তব্য স্থানে অন্ততঃ সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের প্রজা-পুঞ্জের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বিভিন্ন রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন, বিশেষতঃ তীর্থাদি স্থানে সাধুসজ্জনগণের সহবাসে ও তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে ভগবৎ প্রেমে প্রমত্ত হইতেন, তাঁহাদেরই তীর্থদর্শন সার্থক হইত। মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তিগণ রেলযোগে তীর্থাদি দর্শন করিয়া তাদৃশ লাভবান্ হইতে পারে না। যেরূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত লইয়া তীর্থক্ষেত্রে গমন করে, প্রায় সেইরূপ চিত্ত লইয়াই গৃহে ফিরিয়া আইসে। রেল কোম্পানীর অর্থভাণ্ডারে যথা-

যোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া কেবল্ কতকগুলি নূতন দৃশ্য দেখিয়া আইসে, এই পর্য্যন্ত। পুরাকালের তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য কিছুই সিদ্ধ হয় না।

যাহাই হউক দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা চাক্ষুষ সন্দর্শন করিয়াছি এবং লোকমুখে কিংবা পুস্তকাদির সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। আমি বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ৺রামেশ্বর তীর্থ উদ্দেশে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। সে দিবস সোমবার। সঙ্গে আমার সহধর্ম্মিণী, সহোদর ও তাহার পত্নী। বেলা প্রায় ৯টার সময় গো-শকটে আরোহণ করিয়া প্রায় ১০৷৷৹টার সময় ভাগীরথী তটে সমাগত হইলাম। খেয়ার নৌকা প্রস্তুত দেখিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে একাকীই পার হইয়া গেলাম। পার হইয়া খেয়াঘাটে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় বাঁগচড়া নিবাসী সুকবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি "ভারতবর্ষ" পত্রিকা হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি ৺রামেশ্বর তীর্থে গমন করিতেছি শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন—"পূর্ব্বে হইলে আমিও যাইতে চেষ্টা করিতাম।" আমি কহিলাম—"এখন হয় না?" তিনি কহিলেন—"এখন আর হয় না। যাহা হউক আপনারা ধনুষ্কোটী না দেখিয়া কখনও ফিরিবেন না— আর ফিরিয়া আসিয়া একটী বিবরণ লিখিবেন।" কিছুক্ষণ পরেই গো-শকটসহ আমার সহযাত্রীরা গঙ্গা অতিক্রম করিলেন।

আমি যখন একাকী ৺গঙ্গা অতিক্রম করিতেছিলাম, তৎকালে আমাদের নৌকায় জিরাট বা বলাগড় নিবাসী একব্যক্তি কর্ম্মকার তাহার স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে লইয়া পার হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, লোকটী শান্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুর গ্রাম হইতে তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া আসিতেছিল। পার হইতে হইতে লোকটী একটু গঙ্গাজল পান করায়, তাহার শিশু-কন্যা (বয়স ৩।৪ বৎসর) বলিতে লাগিল—

"বাবা, এই জল খাইলে, আবার জল খাইতেছ কেন?" কন্যার পিতা উত্তর করিল—"জল ত তোমরাই খাইয়াছিলে, আমি ত তখন জল খাই নাই।" কন্যাটীর অর্দ্ধপরিস্ফুট সুমধুর ভাষা আমার কর্ণে বড় ভাল লাগিল। বিশেষতঃ এই সময় ৪।৫ বৎসরের ন্যায় একটী শিশু-কন্যার কথা মনে করিয়া প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। এই কন্যাটী আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের। কন্যাটী আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময় সে বড়ই কাঁদিয়াছিল। কোনরূপে তাহাকে বুঝাইয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি। আমরা যে দূর দেশে যাইতেছি, সেখান হইতে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারিব কি না, এবং ফিরিতে পারিলেও গৃহে যাহাদের রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের সহাস্যমুখ আবার দেখিতে পাইব কি না ইত্যাদি চিন্তায় প্রাণটা মুহূর্ত্তের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু "মায়া" "মায়া", এই শব্দ দুই একবার মনে মনে উচ্চারণ করিবা মাত্র সমস্ত দুর্ভাবনা মন হইতে অন্তর্হিত হইল। বস্তুতঃ বহু দূর দেশে যাত্রা করিয়াছি মনে করিয়া মনে কোন প্রকার ভয় বা দুশ্চিন্তা আসিল না। যে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত থাকি, তাঁহারই পাদপদ্ম চিন্তায় সর্ব্বথা চিন্তামুক্ত হইলাম। মনে মনে গাহিতে লাগিলাম—

"কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথন যেখানে থাকি,
তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।"

ক্রমে আমার সহধর্ম্মিণী ও সহোদরেরা এপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুনরায় গো-শকটযোগে আমরা ষ্টেসন অভিমুখে ধাবিত হইলাম। প্রায় ৩ কোয়াটারের মধ্যে আমরা গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়া ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ট্রেণ আসিবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল আমাদের ষ্টেসনের বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে

হইল। ক্রমে যথাকালে ট্রেণ পৌঁছিলে আমরা সকলে এক কামরায় উঠিলাম। স্ত্রীলোক কয়েকটীকে একত্র এক বেঞ্চে বসাইবার অভিপ্রায়ে আমার সহোদর একটী নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাষার স্বর কিছু রুক্ষ হইয়াছিল। লোকটী কোনরূপেই উঠিতে চাহিল না। একটা গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সেই কামরার দূর প্রদেশ হইতে একটী সৌম্য মূর্ত্তি যুবা দ্রুতপদে আগমন করিয়া স্নেহের ভাষায় সেই লোকটীকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকটী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া চোক মুছিতে মুছিতে অন্য এক স্থানে যাইয়া বসিল। আমি বুঝিলাম মিষ্ট কথার কি অদ্ভুত শক্তি!—ভালবাসার কি অসীম পরাক্রম! ট্রেণ ছাড়িলে একটু পরে সেই কামরায় আর একটী ভদ্রলোক তাহার স্ত্রী ও শিশু-কন্যাকে লইয়া উঠিলেন। অপর একটী ষ্টেসণে ট্রেনের দ্বার খোলা পাইয়া সেই দ্বার দিয়া শিশুটী নীচে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অমনি তাঁহার অপরিচিতা আর একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। শিশুটী তখন কাঁদিতে লাগিল। মাতৃতুল্যা যে স্ত্রীলোকটী তাহাকে ধরিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—"আমি ত তোমাকে মারি নাই, তুমি পড়িয়া যাইবে বলিয়া তোমাকে খুব আস্তে আস্তে ধরিয়াছিলাম।" শিশুটীর জনক ও জননী মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটী প্রাচীন ব্যক্তি আপন মনে গান ধরিলেন—

"তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্।"

গান শেষ করিয়া আবার গাহিলেন—

"(আমার) এমন দিন কি হবে তারা,
(যবে) তারা, তারা, তারা ব'লে, দু'নয়নে প'ড়বে ধারা।"

মধ্যে মধ্যে দাঁতের মাজন, নস্য, অজীর্ণ রোগের ঔষধ ইত্যাদি দ্রব্য

লইয়া ফেরীওয়ালারা গাড়ীর মধ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিতে লাগিল। ক্রমে ব্যাণ্ডেল, সেওড়াফুলী, শ্রীরামপুর, বালী প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া, আমরা বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। তথা হইতে বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ম্যাড্রাস্ মেলে আরোহণ করিয়া ৺রামেশ্বর অভিমুখে রওনা হইলাম। হাওড়া হইতে রামেশ্বর ষ্টেসন পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩১ টাকা ৬ আনা। দূরত্ব প্রায় ১৫০০ মাইল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের উক্ত শ্রেণীতে তত অধিক ভিড় ভোগ করিতে হয় নাই। অন্যথা সুদীর্ঘ পথে তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন বড়ই কষ্টকর। নানা নদ-নদী এবং ভুবনেশ্বরাদি তীর্থ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ২টার পর খুর্দ্দা রোড জংসন ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তৎপরে ক্রমশঃ চিল্কা হ্রদের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া পরদিবস বেলা এগারটার সময় ভিজানিয়া গ্রামে উপনীত হইলাম। পরে বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় ওয়াল্টেয়ারে পৌঁছিলাম। এখান হইতে অন্য পথে কিয়ৎদূর গমন করিলেই কোকনদ বন্দরে উপনীত হওয়া যায়। এই কোকনদেই নাকি ভাগ্যবান্ শ্রীমন্ত সওদাগর জগজ্জননীকে "কমলে কামিনী" রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাষ্পীয় শকট সে পথে গমন না করিয়া বেলা সাড়ে পাঁচটার পর রাজমহেন্দ্রী ষ্টেসনে উপনীত হইল। এই স্থানের নিকটই প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তটে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত পরম ভাগবত সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই স্থান "বিদ্যা-নগর" নামে অভিহিত হইয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গোদাবরী নদী অতিক্রম করিলাম। এই নদী অতিক্রম কালে এমন বিষম ঝটিকা বহিতে লাগিল যে প্রবল গ্রীষ্মের পর সকলেরই ঠাণ্ডানুভব হইল এবং অসাবধান যাত্রীদিগের বস্ত্রাদি উড্ডীয়মান হইয়া নদী সলিলে পতিত হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা বেজওয়াডা জংসন ষ্টেসনে

পৌছিলাম। এ পর্য্যন্ত আমি অন্যান্য সহযাত্রিগণের সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। হাওড়া ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিয়াই দেখিলাম, আমাদের কামরাতে একটী কোট্‌প্যান্ট পরিহিত চসমাধারী স্থূলাকায় ভদ্রলোক একটী বেঞ্চের উপর আপন শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। বহুক্ষণ তিনি আশ্বস্ত ভাবে ছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ বৎসর। তাঁহার মুখাবয়ব দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। ক্রমশঃ

শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন মহোৎসব

আগামী ৬ই কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর রবিবার শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ৺পুরীধাম হইতে শুভাগমন উপলক্ষে বিরাট "স্মরণ-মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হইবে।

পানিহাটী বৈষ্ণব-জগতের পরমতীর্থ। শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের প্রেম-ভক্তিতে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ এখানে চিরতরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অদ্যাপিও সেই রাঘব-ভবন, সেই ৬০০শত বৎসরের প্রচ্ছায় শীতল শ্রীবটবৃক্ষরাজ, প্রভুর উপবেশনের সেই পিণ্ডা বা বেদী, সেই গঙ্গাবর্ত্ম প্রভৃতি প্রাচীন যুগের স্মৃতি-চিহ্নগুলি উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের মহামহিমা বিঘোষিত করিতেছেন। পতিতপাবন ভক্তবৃন্দ! আপনারা স্বদলবলে শুভাগমন করতঃ আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন ইহাই করজোড়ে প্রার্থনা।

আর একটি আনন্দ-সংবাদ;—এবারেও উৎসবের সহিত একটী 'বৈষ্ণব-প্রদর্শনী' হইবার সঙ্কল্প হইয়াছে; উহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুঁথি ও নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। গতবারে যথাসময়ে প্রদর্শনীর সংবাদ বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এজন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা ভক্তগণকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাইতেছি।

প্রদর্শনীর জন্য যদি কেহ প্রাচীন পুঁথি, শ্রীবিগ্রহের ও শ্রীমন্দিরের ফটো আধুনিক যুগের গৌরভক্তগণের ও বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণের, লেখকগণের, কীর্ত্তনগায়কগণের গোস্বামী প্রভুপাদ ও আচার্য্য বংশীয়গণের ফটো বা তাঁহাদের হস্তাক্ষর, বংশাবলী, স্মৃতিচিহ্ন এবং মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ, প্রাচীন বৈষ্ণব মাসিক-পত্র, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাচিত্র, বৈষ্ণব-সভা-সমিতির এবং শ্রীহরিসভার মুদ্রিত নিবেদনপত্র প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন, তবে সাদরে গ্রহণ করা হইবে ও প্রদর্শনীক্ষেত্রে সজ্জিত হইবে। (এ বিষয়ে প্রদর্শনীর সম্পাদকের সহিত পত্র-ব্যবহার করিবেন।)

পথ পরিচয়—পানিহাটী-গ্রাম কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে। ই, বি, আর, সোদপুর এবং ই, আই, আর কোন্নগর ষ্টেশন হইতে মাত্র ১ মাইল দূর। পূর্ব্বে পত্র পাইলে বিদেশীয় ভক্তগণের বাসা ঠিক করা হয়, নিবেদন ইতি।

ভক্তকৃপাপ্রার্থী
দীন সেবকগণ

ঠিকানা—সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির পানিহাটী পোঃ (২৪ পরগণা)

নিবেদন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পারিষদ, দ্বাদশগোপালের অন্যতম রত্ন, সুবর্ণ বণিক কুলোজ্জ্বলকারী, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের জীবনী সংগ্রহের জন্য আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থও প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে ভক্তগণকে বিতরণ করিতেছি। কিন্তু ইহাতে তাহাদের প্রাণপরিতৃপ্ত হয় নাই। যাহাতে দত্ত ঠাকুরের একখানি বিস্তৃত জীবনী সঙ্কলন করিতে পারি তাহার জন্য আজ আমরা ভক্তির পাঠকবর্গের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিবেদন করিতেছি যে, দত্ত ঠাকুরের সম্বন্ধে যাঁহার যাহা জানা আছে, (প্রবাদ বাক্যাদিও) কৃপাকরিয়া তৎসমুদায় এবং তাঁহার বংশধর বলিয়া যাঁহারা পরিচয় প্রদান করেন তাঁহারা স্ব স্ব বংশলতার সংবাদ যতদূর পর্য্যন্ত অবগত আছেন ততদূরই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া, আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী—শ্রীহরিদাসনন্দী
(শ্রীগৌরাঙ্গসেবক—সহঃ সম্পাদক)
৫০।৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

ভক্তি

অগ্রহায়ণ
১৩৩৪

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা।

জর জর তনুমোর দুঃখের নাহিক ওর
দাঁড়াতে পারিনা আর, খুলে দাও দ্বার।
সকলি ফুরাল হায় জীবন বিফলে যায়
মুখতুলে চাও নাথ, কাঙ্গালে এবার॥

দীনবন্ধুহে, তোমাকে বলিয়া আর কত জানাব। দীনহীন পতিতের একমাত্র ভরসাস্থল তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ দু'খানি। তাই, তুমি সকল জানিতেছ, সকল বুঝিতেছ একথা প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিয়াও যখন জ্বালায় জ্বলিয়া অস্থির হই তখনই তোমার উদ্দেশ্যে দু'একটা বেদনার কথা না

বলিয়া থাকিতে পারিনা। হয়ত তোমার কৃপা প্রাপ্ত ভক্তগণ আমার এরূপ প্রার্থনাকে তাহাদের উপযুক্ত নয় ভাবিয়া উপেক্ষা ও কঠোর কষাঘাতে দূর করিয়া দিবেন কিন্তু আমার যে নাথ, আর অন্য গতিনাই। আমার অভাব, আমার দুঃখ, আমার বেদনা তোমাকে ভিন্ন অন্য যাহাকেই বলিব সে-ই আমাকে নানা প্রকারে উপেক্ষা করিয়া, নানা প্রকারে ভুল বুঝাইয়া মূল লক্ষ্য হইতে দূরে লইয়া যাইবে? তাই প্রভু! আমি তোমার শ্রীচরণ কমলেই আমার সকল বেদনা জানাইয়া প্রাণে শান্তি পাই।

বলিতেকি, আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইয়া তুমিই নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর ভাবাইতেছ। কখনও সত্বগুণে, কখনও রজোগুণে আবার কখনও বা তমোগুণে অভিভূত করাইয়া নানা প্রকারে ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি প্রদান করিতেছ। এ সকল বিষয়ে আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, রাখিতেও চাই না। এক এক সময় যেমন সামান্য বিষয়ের মধ্যদিয়াও অভাবনীয় রূপে তোমার ভাব প্রদান করিয়া তোমার ভাবে বিমুগ্ধ কর, সেইরূপ এক এক সময় কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া সেই ভাব-বিমুগ্ধতা ভুলাইয়া—সেই আত্মহারা ভাব—সেই আনন্দসিন্ধুতে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থা একেবারে ভুলাইয়া দেয়। কখন তোমার ভাবে বিমুগ্ধ হই, আবার কখন অভাবে বিমুগ্ধ হই, বিমুগ্ধতা সমান হইলেও ফলভোগ কিন্তু বিভিন্ন রকমেরই হইতে থাকে। যখন ভাবের বিমুগ্ধতা আসে তখন প্রাণ জুড়াইয়া যায়, কোনরূপ ভাবনাচিন্তা থাকে না, সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া জগৎ ও জগৎজীবে এক অমৃতোপম ভাব অনুভব করিতে থাকি। আবার অভাবের বিমুগ্ধতায় তোমাকে ভুলিয়া অঘটন ঘটন-পটীয়সী কুহকিনী মায়ার মোহে পতিত হইয়া অসৎ ভাবনায় কেবলই দুঃখ অনুভব করিতে থাকি। তোমার চিন্তা, তোমার ভাব, তোমায় অপরিসীম ভালবাসা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কেমন এক রকম হইয়া যাই। তখন জগতে এমন কিছু পাই না

যাহার দ্বারা আমার সেই অভাব, সেই যন্ত্রণার উপশম করি। তাই আজ তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে—যাহাতে ভাবের অভাব না ঘটে, যাহাতে তোমায় দিবানিশ প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখিতে পারি তাই কর। এক এক বার সুখ ভোগ করাইয়া সুখের আস্বাদ দিয়া আবার দুঃখের জ্বালা বাড়াইয়া এমন করিয়া আর আমাকে ঘুরাইওনা। ভোগ্যবস্তু দিয়া খুব ভোগ করাইয়াছ, যাহা ভাবিনাই এ-নও অনেক প্রকারের ভোগ তোমার কৃপায় হইয়াছে, আর কেন প্রভু, এভাবে ভোগ করিয়া অনন্ত কালেও ত ভোগের বাসনা দূর করিতে পারিবনা ? তুমি কৃপা করিয়া তোমার ভাবে আমাকে মাতাইয়া রাখ, আমি তোমার জগতে তোমার হইয়া তোমার নাম-গুণ লীলা-রস আস্বাদনে বিভোর হইয়া যাই। তোমার নিকটে এবার আমার সকাতর প্রার্থনা, যেন—

তোমার চরণ-তলেতে থাকিয়া তোমার কার্য্য সাধিয়া।
তোমারি নাম বলিতে বলিতে যায়হে জীবন চলিয়া ॥

দীন—শ্রী—

কবে ?

আমার হৃদয় শ্রীরাস-মন্দিরে
করিবে বিহার কবে বংশীধারী।
কবে　চিত্ত-রাধিকারে লবে বাম ধারে
রসাস্বাদিবারে শ্রীরাসবিহারী ॥

যদিও এচিত থাকে কলঙ্কিত,
জান রসরাজ, ইহা তোমারিত,
হে নির্ম্মল! তব নহে কি উচিত
করা নিষ্কলঙ্ক ওহে পাপ-হারী ॥

কবে নাচিবে মন্দিরে ওহে নটবর,
দহিবে মন্মথে মোহিবে অন্তর,
পিব লীলামৃত হে শ্যামসুন্দর,
প্রেমের সাগরে আনন্দে সাঁতারি ॥

কবে শুনি সে বাঁশরী স্বর এ শ্রবণে,
ছিড়িব সবলে মায়ার বন্ধনে,
মিলাইব প্রাণ অনন্তের সনে
(কবে) মোহ তন্দ্রা মোরে পলাইবে ছাড়ি ॥

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥

৺কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দ মিলন

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃতীয় বা শেষবারে বৃন্দাবনপথে ৺কাশী নগরীতে উপনীত হইয়া মণিকর্ণিকায় যথাবিধি স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন। ইহার পূর্ব্ববারে বৃন্দাবন গমনের ব্যর্থ উদ্যমে তিনি কানাইনাটশালা হইতে নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ যাত্রায় কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক

এক সাধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং সেবাদির জন্য ভট্টাচার্য্যের এক বিপ্র-ভৃত্য মহাপ্রভুর সঙ্গী। ইহাঁরা কেহই প্রভুর নিজজন নহেন, কাজেই সময়মত সেবাকৃত্য বা ভিক্ষা নির্ব্বাহের জন্য কোন পীড়াপিড়ী নাই, ভট্টাচার্য্য জোর করিয়া প্রভুকে কিছু বলিতে পারেন না। কাজেই এ যাত্রায় প্রভু স্বচ্ছন্দে নিজভাবে অহর্নিশি বিভোর হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়াছেন। প্রভু যখন কাশীনগরীতে উপস্থিত হইলেন সেই সময় কাশীবাসী তাঁহার পরমভক্ত তপন মিশ্র গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন। মিশ্র ঠাকুরের পূর্ব্বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নবদ্বীপের গার্হস্থজীবনে একবার প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তৎকালে মুমুক্ষু মিশ্র ঠাকুর সাধনতত্ত্ব লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রভুর চরণে উপস্থিত হইলে প্রভু তাঁহাকে জন্মভুমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীবাস করিবার অনুজ্ঞা দিয়া বলিয়াছিলেন—"তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।" কেনই বা প্রভু এই অনুজ্ঞা দিলেন এবং কখন কি উপায়েই বা প্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎলাভ হইবে মিশ্র তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু অবনতমস্তকে তিনি প্রভুর আদেশ পালন করিয়া তদবধি নিয়ত কাশীবাস করিতেছিলেন।

প্রভু কি উদ্দেশ্যে কোন্ ভক্তকে কি আদেশ বা উপদেশ দিতেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য। তিনি যুগধর্ম্ম প্রচার জন্য ও তাহার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের মহান্ উদ্দেশ্যে লোকপাবন গোস্বামীগণকে সৃষ্টি করেন।* যে ছয় গোস্বামী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল স্তম্ভ স্বরূপ, যাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রভুর এই ধর্ম্ম উত্তরকালে সজীবতা লাভ করিয়াছিল—

* "শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥"

যাঁহারা এই ধর্ম্মের বিমল রশ্মি মোহাচ্ছন্ন জীবহৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া বৈষ্ণব জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এই তপন মিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথ তাঁহাদের অন্যতম। সর্ব্বদর্শী প্রভু রঘুনাথকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই কি মিশ্রকে কাশীবাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ?

মিশ্র ভাগীরথী স্নানে আসিয়া সেই তেজঃপুঞ্জ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। প্রভু সন্ন্যাসী হইয়াছেন মিশ্র দূর হইতে লোকপরম্পরায় শুনিয়াছেন বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত দর্শন লাভ হয় নাই। প্রভুর গার্হস্থ্য লীলার সে কমনীয় কিশোর মূর্ত্তি মিশ্রের মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা ত ভুল হইবার নহে ? প্রভুকে দর্শন মাত্রই মিশ্র আসিয়া তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত। প্রভু তাঁহাকে সাদরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মিশ্র আজ আনন্দে আত্মহারা! স্বয়ং মহাপ্রভু যে আজি তাঁহার গৃহে অতিথি! মিশ্রের জন্ম জীবন আজ সার্থক! তিনি কখনও বাল্য-চাপল্যে প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা স্ববংশে প্রভুর চরণোদক পান করিতেছেন, কখনও সসম্মানে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পূজা করিতেছেন—কখনও বা প্রভুর প্রসাদান্ন স্বজনগণ সহ গ্রহণ করিয়া দেহ মন পবিত্র জ্ঞান করিতেছেন! আনন্দের আতিশয্যে তিনি কি করিবেন বুঝিতেছেন না। চির-আকাঙ্ক্ষিত ইষ্টদেব যদি মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হ'ন তবে ভক্তের অন্তঃকরণে যে ভাব বিপর্য্যয় স্বাভাবিক—মিশ্রও আজ সেই ভাবহিল্লোলে ভাসমান!

তিনি ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—

"—— প্রভু-যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা॥"

মিশ্র প্রভুকে লইয়া পরমানন্দে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করাইলেন।

প্রভুর আগমন সংবাদে তাঁহার পূর্ব্ব দাস মিশ্র-সখা চন্দ্রশেখরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

"——প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি আপনার স্থানে।
মায়া, ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥
ষড়দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা॥"

দারুণ মনঃক্ষোভেই যে চন্দ্রশেখর কথাগুলি বলিলেন। তাহা তাহার ভাব দেখিলেই বুঝা যায়।

বারাণসী তৎকালে বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিতপ্রবর প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন কাশীবাস করিয়া সহস্র সহস্র শিষ্যকে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য পড়ুয়াগণ বেদান্ত শিক্ষার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত। কাশীতে তাঁহার দোর্দ্দিণ্ডপ্রতাপ, এক রকম রাজা বলিলেই হয়। মান, সম্ভ্রম ও পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ লোক তৎকালে কাশীতে কেন—বোধহয় সমগ্র ভারত-ভূমিতেও বিরল ছিল। নিরস বেদান্তচর্চ্চা বারাণসী ভূমি ছাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রকাশানন্দের প্রভাবে ভক্তিবিমুখ কাশী নগরী বেদান্ত শিক্ষাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করায় কৃষ্ণকথা, প্রেম-ভক্তির আলোচনা একেবারে উঠিয়াই গিয়াছিল। ভক্তি যে কি তাহা কেহ জানিত না এবং জীবনে তাহা লাভ করার কোন আবশ্যকতাও বোধ করিত না।

প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর এযাবৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার যথাযথ বিবরণ যে

প্রকাশানন্দের অজ্ঞাত ছিল তাহা বোধ হয় না। দূর হইতে তিনি প্রভুর নাম ও গুণগ্রাম শুনিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ প্রথম হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। প্রকাশানন্দ নিজেও পরম পণ্ডিত— আজন্ম বিষয়-ভোগলালসা বর্জ্জিত, শক্তিশালী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মসম মহা তেজস্বী সন্ন্যাসী। তিনি যে অসূয়াপরবশ হইয়া স্বীয় প্রভাব ও পাণ্ডিত্য নিষ্প্রভ হইবার আশঙ্কায় প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এক ভ্রমাত্মক ধারণা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। প্রকাশানন্দের বিশ্বাস হইয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে অবতার কল্পনা করিয়া সরল বিশ্বাসী, মূঢ় লোকদিগকে প্রতারিত করিতেছেন। এই কদর্য্য ধারণা তাঁহার কেন যে হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি কাশী হইতে কখনও বাহিরে যাইতেন না। সর্ব্বদা নিজ শিষ্যগণে সমাবৃত থাকিয়া বিচারকের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। পাণ্ডিত্যাভিমান তাঁহাকে সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় সতত সুরক্ষিত রাখিত। মহাপ্রভুর অপ্রমেয় পাণ্ডিত্যের বারতা এবং জনসাধারণের তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানের অবতার স্বরূপে সেবা পূজাদির বিচিত্র কথা যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তদবধি তাঁহার এই ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি। তাঁহার মত বৈদান্তিকের সহসা একজন দেহধারীকে ভগবান বলিয়া গ্রহণ করা সহজ নয়। প্রভু যখন সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করিতেছিলেন প্রকাশানন্দ তখন তাঁহাকে ২।১ খানা গ্লানিকর লিপিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর নাম দেশ বিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে একবার না দেখিয়াই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার চরণে প্রাণ বিকাইয়া দিতেছিল। বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী প্রকাশানন্দের নিকট যে ইহা বড় বিসদৃশ বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি প্রভুর অপার্থিব রূপলাবণ্য সে দেবদুর্ল্লভ প্রেমকান্তি কখনও দেখেন নাই,

কাজেই প্রভুকে লোক-প্রতারক বলিয়াই তাঁহার প্রথম ধারণা হইয়াছিল। নীলাচলবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিলক্ষণ জানিতেন। যখন প্রচার হইল সার্ব্বভৌম ঠাকুরও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং একমাত্র উপাস্যজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহারই সেবা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, প্রকাশানন্দ তখন কিন্তু বিস্মিত—একটু বিচলিত হইলেন। তাঁহার সযত্নপোষিত ধারণার মূলে বুঝিবা একটু আঘাতও লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন প্রকাশানন্দের বিশ্বাস ও ধারণা তৎকালে পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

প্রভু কাশীতে তপন মিশ্রের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন। কাশীবাসী অনেকেরই সে তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসমূর্ত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। লোকমুখে তাঁহার প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব ভারতী পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। কাজেই প্রভুর আগমনাবধি অনেকেই তাঁহার দর্শন কামনায় মিশ্র ভবনে নিত্য সমবেত হইতেন। যিনি আসিতেন তিনিই মুগ্ধ হইতেন। প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেন না। মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনায় লোচনদাস আবেগ ভরে গাহিয়াছেন--

বিজুরী বাঁটিয়া কেবা গাথানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমল কৈল
অপরূপ রূপের বলনি।

প্রত্যুত মহাপ্রভুর রূপের এমন এক প্রাণোন্মাদকারী আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহাতে সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। মিশ্রালয়ে যাঁহারা প্রভুর দর্শনে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন পদস্থ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশী নগরীতে বিশেষ পরিচিত এবং

সকল সমাজেই তাঁহার অবাধ গতিবিধি ছিল। ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের সভায় প্রায়শঃ যাতায়াত করিতেন এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। এক দিবস ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা, প্রতাপ না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাথে অদ্ভুত কথন॥
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥
জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম॥

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা)

এই চিত্রে শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হইত—হয়তঃ মলিনতা ধৌত নিরস হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির অঙ্কুরও উপ্ত হইতে পারিত কিন্তু মায়াবাদের কঠোর উপাসক ভক্তিবিমুখ সোহংবাদী প্রকাশানন্দের তাহাতে কোন

পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল না। পরন্তু বর্ণনা শুনিয়া সেই নির্ম্মম সন্ন্যাসী—"বহুত হাসিল"—ইহা বিদ্রুপের—অবিশ্বাসের ক্রূর হাসি পরে সেই বিপ্রকে শ্লেষের সহিত বলিলেন—"হাঁ হাঁ শুনিয়াছি বটে, গৌড় দেশ হইতে এক ভাবুক সন্ন্যাসীর এখানে আবির্ভাব হইয়াছে।"

"কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক।"

পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা কেহ তাঁহার নিকট যাইও না। বেদান্ত শ্রবণ কর, তাহাই পরম পুরুষার্থ। উচ্ছৃঙ্খল লোক-সসংর্গে ইহকাল, পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়।" (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি, এল।

নিমাই-তীর্থের ঘাট

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজপূত এই "নিমাই-তীর্থের ঘাট" বৈষ্ণব-জগতের একটী পরম তীর্থ। ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের ভক্তিতে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মণ মহাশয় এই ঘাটের বিবরণ প্রচার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ভক্তের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আমাদের যতটুকু জানা আছে তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম, এ বিষয় যদি অতিরিক্ত কেহ কিছু জানাইতে পারেন আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্তিতে প্রকাশ করিব।

"নিমাই-তীর্থের ঘাট" হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী গ্রামের ভাগিরথী তীরে অবস্থিত। বৈদ্যবাটী ই, আই, রেলের একটী ষ্টেশন। হাওড়া হইতে

মাত্র ১৫ মাইল উত্তরে, ষ্টেশন হইতে উক্ত ঘাট এক মাইলেরও কম। ই, বি, রেলের বারাকপুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল মনিরামপুর গঙ্গার ধার।* বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থের ঘাট হইতে খেয়া নৌকা মনিরামপুরে যাতায়াত করিয়া থাকে।¶ কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে এই নিমাই তীর্থের ঘাটের উল্লেখ দেখা যায়। ১৫৪৪ খৃঃ রচিত মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থে ধনপতি সদাগরের যাত্রায় লিখিত আছে—

গরিফা‡ ছাড়িয়া ডিঙ্গা চলে গোঁধলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন ন পাড়া।

---

* এই মনিরামপুরেই ভারত-বিখ্যাত বাগ্মী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবন।

¶ বৈদ্যবাটীর উত্তরে চাঁপদানী, দক্ষিণে সেওড়াফুলি, পশ্চিমে চাপসারা ও ছিনেমোরা গ্রাম এবং পূর্ব্বদিকে ভাগিরথী। চাঁপদানী গ্রাম বঙ্গের নবাব নাজিম মীরজাফর, কর্ণেল কুট নামক জনৈক ইংরাজকে নিষ্কর জায়গীর স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। ঐ কর্ণেল কুট্ সাহেবই পরে ভারতের কমাণ্ডারইন্‌চিপ্ সার আয়ার কুট্ নামে খ্যাত হয়েন। ১৭৬১ খৃঃ ওয়ারেন্‌হেষ্টিংস্ একবার এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সেওড়াফুলির রাজারা অতি প্রাচীন এবং ধার্ম্মিক বংশ। ইহাঁরা শ্রীল কমলাকর পিপ্‌লাই সেবিত মাহেশ গ্রামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য "জগন্নাথপুর" নামক গ্রাম নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মাহেশের রথযাত্রার সময় ইহাঁরা রথের অগ্রে অগ্রে পদব্রজে গমন করিয়া থাকেন। মুর্শিদ্‌কুলি খাঁ এই বংশের রাজা মনোহর রায়ের দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করিয়া ছিলেন। বৈদ্যবাটীতে পূর্ব্বে বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণের বাস ছিল এজন্য উহা বৈদ্যবাটী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। ১৮৬৯ খৃঃ এই স্থানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃঃ ইহার লোকসংখ্যা ১৭১৭৪ জন ছিল।

‡ ১৬ শতাব্দীতে ত্রিবেণী বাসী মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে গৌরীয়ার শ্রীপাটের উল্লেখ আছে। 'গরিফা' গৌরীয়ার পাটেরই অপভ্রংশ।

ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলী।
ইছাপুর ইড়াইল বানিয়ার বালী ॥
উপনীত সেই সাধু "নিমাই তীর্থ ঘাটে।"
নিম্ব বৃক্ষেতে যথা "ওড়" পুষ্প ফুটে ॥ (ক)
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং ২য় ভাগ ৬৪০ পৃঃ)

ঐ শ্রীমন্ত সদাগরের যা ায়ই আছে :—

উপনীত হৈল যায়্যা নিমায়ের ঘাটে।
স্নান দান করি স্তুতি কৈল করপুটে ॥		ঐ ৭৬৫ পৃঃ

বিজয়লাল সেনের "তীর্থমঙ্গলে" আছে :—

প্রভাতে উঠিয়া মাঝি নৌকা বাহি দিল।
গয়্যাটীর বাখান থান ডাইনে থাকিল ॥
নিমাইতীর্থ ঘাটে আসি উত্তরিল তরি।
জয় গঙ্গা ব'লে ব'লে সবে বলে হরি ॥*		২০৭ পৃঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের নাম গৌড়ীয় তাহা হইতেই গৌরীয়া ও পরে গরিফা হইয়াছে। "এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান আড্ডা ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য গরিফার কন্দর্প সেনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই কন্দর্প সেন প্রসিদ্ধ কেশব সেনের পূর্ব্বপুরুষ, এখানে কন্দর্পসেনের সমাধী আবিষ্কৃত হইয়াছে।" (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণ—নৈহাটী ৩৩০ সাল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র।) ই, বি, আরে গরিফা ষ্টেশন আছে। নৈহাটী হইতে গঙ্গা পার হইবার রেলে।

(ক) ওড়পুষ্প—জবাফুল, নিম্ববৃক্ষে ফুটিয়াছিল।

* তীর্থমঙ্গল গ্রন্থের ২৪৩ সংখ্যক পাদটীকায় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"নিমাইতীর্থের ঘাট ভাগিরথী কূলস্থ একটী অতি প্রাচীন তীর্থ। * * *

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর তীর্থ ভ্রমণে ৫৬৯ পৃ :—

"নবাবগঞ্জের পরে পাণ্ডার ঘাট তার ১ ক্রোশ পরে বৈদ্যবাটী নিমাই-তীর্থের ঘাট 'দিগঙ্গ' কহে।" আমাদের অনুমান বোধ হয় নিমাইতীর্থ নাম হইবার পূর্ব্বে এই স্থানকে লোকে উক্ত 'দিগঙ্গ' নামে অভিহিত করিত।

তীর্থদর্শন গ্রন্থে ১০৪ পৃঃ এবং পঞ্জিকার "ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান" তালিকাতে নিমাই তীর্থ ঘাটের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমনের উল্লেখ না থাকিলেও বিস্তৃত কিম্বদন্তী প্রভুর আগমনের দৃঢ়তা প্রমাণ করাইতেছে। স্থানীয় প্রবাদ—নিমাই কাটোয়ায় সন্ন্যাস লইয়া এই ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন পুস্তকে আছে—"চৈতন্যদেব তীর্থ পর্য্যটন সময়ে এই ঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন।"

পুর্ণিমায় উদ্ধৃত ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে হুগলি কাহিনীতে আছে—"কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গা-তীরে এই ঘাটে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে ঘাট-সান্নিধ্যে এক নিম্বতরু রোপিত হইয়াছিল।

হুগলী-ডিঃ গেজেটীয়ারে আছে—"এই নিম গাছ ঘটিত ব্যাপার হইতেই তাঁহার অন্য নাম "নিমাই" হইয়াছে।"

বর্ত্তমান ইছাপুর নবাবগঞ্জের কিছু দক্ষিণে নিমাইতীর্থের ঘাটের চিহ্ন বিদ্যমান।" দুঃখের বিষয় বসু মহাশয়ের স্থান নির্ণয়টী সম্পূর্ণ ভুল, কারণ ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ২৪ পরগণা জেলায়, আর বৈদ্যবাটী নিমাই-তীর্থের ঘাট গঙ্গার পশ্চিম পারে হুগলী জেলায়। কলিকাতা হইতে মাত্র ৪ ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ পাণিহাটী গ্রামকেও একস্থানে বসু মহাশয় কি জানি কোন প্রমাণ বলে হুগলি জেলার অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন।

এ অঞ্চলে আর একটী প্রবাদ আছে, (বটতলা হইতে প্রকাশিত অনেক দিন পূর্ব্বের "জগন্নাথের বালা বন্ধক" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থেও দেখিয়াছিলাম) 'লীলাময় জগন্নাথদেব একদা ব্রাহ্মণ বেশে এই ঘাটে আসিয়া স্নান করেন এবং পরে এস্থান হইতে (শ্রীরামপুরের নিকট) মাহেশ গ্রামে (যথায় শ্রীল কমলাকর পিপলায়ের শ্রীপাট ও দেবালয়) তথায় জনৈক মোদকের দোকানে স্বীয় হস্তের বালা বন্ধক দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করতঃ পুরীতে গমন করেন।'

শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে (অন্ত্য ২য়) আছে প্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পরে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আগমন করেন তথা হইতে দক্ষিণমুখে, গঙ্গার কুলে কুলে ছত্রভোগে উপনীত হইয়া পুরীতে গমন করেন।

*　　*　　*　　*

(শান্তিপুর হইতে)　"চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া॥
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে॥"

এই পয়ারের দ্বারা আমাদেরও মনে হয়, মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর শান্তিপুর হইতে পুরী যাত্রাকালেই এই স্থানে গঙ্গাস্নান ও বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস আশ্রমের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটী তখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই। সাধারণে তখনও প্রভুকে নিমাই পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেন। এইজন্ত নিমাই তীর্থযাত্রা কালে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে, এবং তদবধি ইহা "নিমাই-তীর্থের-ঘাট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে।

মহাপ্রভুর এখানে আগমন যে অসম্ভব তাহা নহে, কারণ পুরী হইতে গৌড়ে আগমন এবং পুরীতে প্রত্যাগমন দুই বারই তিনি এই স্থানের গঙ্গার উপর দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলেন। পাণিহাটী হইতে কুমারহট্টে এবং

কুমারহট্ট হইতে পাণিহাটী, বরাহনগর প্রভৃতি গঙ্গার তীরবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে শ্রীচরণ রেখা দিয়া যে প্রভু পুরীতে যাত্রা করেন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

ঘাটের বিবরণ।

আমরা গত ১৩৩২ সালের ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার এই পুণ্য স্থানটী দর্শন করিয়াছিলাম।

নিমাইতীর্থের ঘাটটী পাকা ঘাট, উপরে চাঁদনী, এবং ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী কুঠারীতে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন।

দক্ষিণদিকের কুঠারীতে শ্রীশ্রীগৌর নিতাই ও কতকগুলি শিলা আছেন। সেবা ভাল ভাবে হয় না বলিয়াই মনে হইল, কারণ শ্রীবিগ্রহের আসন, বসন ও শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত মলিনই দেখিলাম। সেবায়েত জনৈক রাঢ়ী শ্রেণী শাক্ত ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীবগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি বলিলেন আমরা বহু পুরুষ পূর্ব্ব হইতে এই সেবা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহার বংশতালিকা এইরূপ—

রামকানাই
|
নীলকমল
|
শ্রীধর
|
হলধর — বগলা
বগলা
|
শ্যামাচরণ — লক্ষ্মীনাথ

অন্যত্রে শুনিলাম :—নিমাইতীর্থ ঘাটে সর্ব্ব আদি সেবা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি, শ্রীশ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ বেশীদিনের নহে। বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহদ্বয় বৈদ্যবাটীর কুমার পাড়ায় দেবী মুখোর ঘাটে থাকিতেন, গৌরচরণ বাবাজী উহার সেবায়েত ছিলেন। পরে এই স্থানে শ্রীবিগ্রহের আগমন হয়। অন্য একটি লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম—এই শ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ চাঁপদানী গ্রামের পশ্চিমে 'দশ বিঘা' নামক পল্লীর বৈষ্ণব পাড়ায় একটী আখড়াতে বিরাজ করিতেন। পরে সেখানে সেবা অভাব দেখিয়া জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীবিগ্রহদ্বয়কে এই ঘাটে আনয়ন করতঃ স্থাপিত করেন। উক্ত সন্ন্যাসী বর্ত্তমান সেবায়েতগণের পূর্ব্বপুরুষ।

বর্ত্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত বগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "পূর্ব্বে শোভাবাজার রাজাদের প্রদত্ত শ্রীবিগ্রহের কিছু সম্পত্তি ছিল, এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য তৎসমুদয় নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যাত্রীগণের প্রদত্ত প্রণামী ভিন্ন আর কোনরূপ আয় নাই।"

উত্তর দিকের কুঠারীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী আছেন। এ গৃহের সেবার বেশ পারিপাট্য দেখিলাম। সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেবাধিকারীরা রামায়েৎ বৈষ্ণব ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের নাবালক দৌহিত্র ও তাঁহাদের মাতামহী এই সেবা কার্য্য পরিচালন করেন। ইহাঁদের বংশাবলী এইরূপ :—

কৃষ্ণ অধিকারী
|
গোপাল অধিকারী
|
লক্ষ্মী অধিকারী
|
(কন্যা) চণ্ডী দেবী
|
নবীন　　শ্যামরায়

এই উত্তর দিকের কুঠারীর কাছেই, একটী ২ হাত উচ্চ সূর্য্য মূর্ত্তি আছে। শুনিলাম মাটীর অভ্যন্তর হইতে ইহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটী নূতনের মতই দেখিতে।

এই জগন্নাথ দেবের সেবা এখানে বহুদিন হইতেই আছে। সেবায়েত-দিগের আদি পুরুষ কৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়ের গুরুদেব, কৃষ্ণ অধিকারীকে এই সেবা প্রদান করিয়া যান।

নিমাইতীর্থের ঘাটের ফটো চিত্র "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (১৩৩৩ আশ্বিন ৬৮১ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হইয়াছে। বহুদিন হইতে এখানে একটী ঘাট ছিল। ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগর পালপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয় তাহার সংস্কার করিয়া প্রায় নূতনের মতনই করিয়া দেন। পুরাতন ঘাটের ভগ্নাংশ ঘাটের সম্মুখে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে। বর্ত্তমানে এই স্থানে গঙ্গার চড়া পড়িতেছে, ঘাট হইতে গঙ্গাবারী প্রায় ৭।৮ শত ফুট দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ঘাটটী অতীব জীর্ণ দেখিলাম। শুনিলাম স্থানীয় উমাচরণ দে ও সাধুচরণ দে নামক ভক্তদ্বয় এই ঘাটটী সংস্কার করিয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৺কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের বংশধর চন্দন নগর শিবতলা নিবাসী শ্রীনিতাইচরণ কুণ্ডু প্রভৃতি সংস্কার করিতে দেন নাই। বোধ হয় তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখিবেন উদ্দেশ্য।

ঘাটের দক্ষিণ দিকে চারি ধার ইষ্টক দিয়ে বাঁধা একটী নিমগাছ আছে। এটী প্রাচীন গাছ নয়, ৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন হইবে। প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ যাহাতে জবা ফুল ফুটিয়া ছিল বলিয়া প্রবাদ, সে বৃক্ষটী বহুদিন হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান গাছটী তাহারই শিকড় হইতে উৎপন্ন। স্থানটী তেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়, সেবায়েতগণের ইহার প্রতি তেমন যত্নও নাই।

এই ঘাটের নিকটেই শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী ও শ্রীশ্রীভদ্রকালী দেবীর মন্দির।

ভদ্রকালী দেবী খুব প্রাচীন। সেওড়াফুলীর রাজারা ইহার অধিকারী ছিলেন। ৺তারকেশ্বরের মহান্ত ভুবন গিরি, রাজাদের সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া এই মন্দির অধিকার করিয়া লন। এখানে কয়েকটী হরিসভা আছে।

জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রী, দোল পুর্ণিমা ও পৌষ সংক্রান্তিতে এই ঘাটে মেলা বসে ও বহু যাত্রী সমাগম হয়।

সেওড়াফুলীর হুকাপটিতে নন্দদাস নামক জনৈক বৃদ্ধ 'নিমাইতীর্থের ঘাটের' বিবরণ অনেক জানেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কার্য্যগতিকে তাঁহার নিকট আমাদের যাওয়া হয় নাই। এতদতিরিক্ত আমাদের কিছু জানা নাই, পাঠকগণের জানা থাকিলে জানাইবেন।

প্রভুদ্বয়ের তিরোভাব লীলা।

নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহার বিচ্ছেদে ভক্তগণের নয়ন-ধারার বিশ্রাম নাই। সর্ব্বদাই হা হুতাশ! কোনরূপে তাঁহারা কাল কাটাইতেছেন। শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের দুইটি প্রধান স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয় কিরূপ ভাবে কালযাপন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত ঈশান নাগরের ভাষায় বর্ণনা করি।—

"মহাপ্রভুর অপ্রকটে প্রভু দুইজন।
বিরহে ব্যাকুল হঞা করেন ক্রন্দন॥

*　　*　　*　　*

কৃষ্ণ বিনু যৈছে দশা ব্রজ গোপিকার।
তৈছে দশা দোঁহাকারে স্ফুরে অনিবার॥

কভু উপবাসী রহে কভু কিছু খান।
কভু দুই চারি দিনে করে জল পান॥
বিরহে বিবশ তনু বাহ্য নাহি স্ফুরে।
হা গৌরাঙ্গ বলি কভু ডাকে উচ্চৈস্বরে॥
এক দিবসেরে করে শত যুগ জ্ঞান।
দোঁহাকার দশা দেখি গলয়ে পরাণ॥
কেবল গৌরাঙ্গ নামে উল্লাস অন্তর।
হেনমতে গত হইল অষ্টম বৎসর॥"—(অঃ প্রঃ)

প্রভুদ্বয় তাঁহাদের প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। সীতানাথের ভৃত্য ঈশান স্বচক্ষে দেখিয়া জ্বলন্ত ভাষায় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই ভাবে আট বৎসর গত হইল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তখন শান্তিপুরে। একদিন শ্রীপাঠ খড়দহ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সীতানাথকে তথায় যাইবার জন্য আমন্ত্রণ পত্রিকা প্রেরণ করিলেন। পত্রিকা পাইয়া সীতানাথ অনতিবিলম্বে নিত্যানন্দপুরে গিয়া উপনীত হইলেন। উভয়ের শুভ সম্মিলনে উভয়ের আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। উভয়ে উভয়কে প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ-বিরহ উভয়ের উথলিয়া উঠিল। উভয়েই হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! বলিয়া ফুকারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল, নির্জ্জনে বসিয়া উভয়ে পরস্পর তাঁহাদের মনের কথা বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন কেহই তাহা জানিল না। সাত রাত্রি এই ভাবে কাটিল। অষ্টম দিবসে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহারঙ্গে ভক্তবৃন্দ সহ গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মহাসঙ্কীর্ত্তনে সকলেই বাহ্যজ্ঞান রহিত হইলেন।

এই অবসরে সকলের অলক্ষ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্দ্ধান করিলেন। ভক্তবৃন্দের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে দেখিলেন তাঁহাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ নাই। তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৌরাঙ্গ বিরহে তাঁহারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন, তাহার উপর আজ আবার শ্রীনিত্যানন্দ বিরহ শেলের মত তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিল।

ক্ষণকাল মধ্যে শ্রীপাঠ খড়দহে সর্ব্বত্র ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র প্রভু ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সীতানাথ নিজে সকলকেই যথাসাধ্য প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যথাকালে তিনি দূরস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীপাঠ খড়দহে আগমন করিয়া মহোৎসবে যোগদান করিলেন। মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, সাত সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গের ধ্বনি উত্থিত হইল, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। উক্ত মহোৎসবে যে আনন্দের বন্যা বহিল, অভক্ত আমি, কি করিয়া তাহা বর্ণনা করিব? মহাপ্রসাদের ভূরিভোজনেও সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন। মহোৎসবান্তে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও শান্তিপুর চলিলেন। এই সময় হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দশান্তর উপস্থিত হইল। যথা—

'নিজ ঘরে আসি প্রভু বিষাদিত মনে।
আন বোল নাহি মুখে হরে কৃষ্ণ বিনে ॥

এদিকে নবদ্বীপ ধামের একটু সংবাদ লওয়া যাউক।

* * * *

গৌরাঙ্গ অপ্রকটে সভার সুদুঃখিত মন ॥

* * * *

বিষ্ণুপ্রিয়ামাতা শচীদেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥

*   *   *   *

প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করে কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥—(অঃ প্রঃ)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কি কঠোর তপস্যা! কি অলৌকিক শক্তি! শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! উহা বর্ণনা করিতে আমাদের মত পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। ভক্ত পাঠকগণের নিকট আর ইহা বিশদভাবে বর্ণনা না করিয়া এইখানেই বিরাম দিলাম। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ বিরহে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ নাম সম্বল করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন প্রভুর মহাভাবাবেশ হইল; 'কাঁহা নিমাই' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, বাহ্যজ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইলে নিজের প্রিয় পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন—

'প্রভু কহে মোর দুঃখ শুন বৎসগণ।
মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গ নিন্দন॥
ইহা মোর পরাণে নাহিক সহ্য হয়।
তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ তাজিমু নিশ্চয়॥
অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তগণে।
মোর আজ্ঞা জানাইয়া আনহ এখানে॥—(অঃ প্রঃ)

প্রভু পুত্র শ্রীঅচ্যুত মনে মনে সমস্ত বুঝিয়া সর্ব্বত্র সমাচার প্রেরণ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞাপত্র পাইয়া সকলেই যথাকালে শ্রীপাঠ শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর আজ্ঞাপাতি পাঞা প্রভু বীরচন্দ্র।
শান্তিপুরে আসিলেন লঞা ভক্তবৃন্দ॥
অম্বিকা হইতে আইলা পণ্ডিত গৌরীদাস।
নবদ্বীপের ভক্ত যত আইলা প্রভুর পাশ॥
ভক্তগণ লঞা আইলা সরকার ঠাকুর।
পণ্ডিত প্রবর আইলা কবি কর্ণপুর॥
শ্যামদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন।
আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ॥ (অঃ প্রঃ)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ ও ধর্ম্ম যথাসাধ্য প্রচার করিও, গৌরাঙ্গদ্বেষীর সঙ্গ সর্ব্বদাই পরিহার করিবে। এক্ষণে সকলে মিলিয়া গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন আরম্ভ কর।" সকলেই প্রেমানন্দে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় সকলেই আত্মহারা হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও মহাভাবে সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে একেবারে ডুবিয়াগেলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল দেখা দিল, 'কাঁহা প্রাণ গোরা'

বলিয়া কেবলই ক্রন্দন করেন, ভক্তগণও তাঁহাকে ঘিরিয়া ক্রন্দন করেন, এমন সময়ে—

তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ॥
হঠাৎ মদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা॥—(অঃ প্রঃ)

ভক্তগণের এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের নাই। কাহারও মুখে কথা নাই, ক্রন্দনও নাই, সকলেই যেন বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়াগিয়াছেন।

আজই প্রকৃত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলা সম্পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার প্রধান সহায়ই এই দুই প্রভু। 'একে তিন, তিনে এক'।

আমিও এখানে ভক্তগণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদায় লইলাম।

দীন—শ্রীযদুপতি দাস।

শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থে

(২)

আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলাম —"মহাশয়, কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিতেছেন?" তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। নিকটবর্ত্তী আর একজন যাত্রী এই সময় আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন— please, speak in English :—আমি তৎক্ষণাৎ ইংরাজীতে প্রশ্ন

করিলে তিনি উত্তর করিলেন,—আমি চন্দননগর হইতে পাণ্ডিচারী যাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি পণ্ডিচারী প্রবাসী মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষকে চিনেন? তিনি উত্তর করিলেন,—"নাম শুনিয়াছি, চিনি না।" এই সময় যে যাত্রীটি আমাকে ইংরাজীতে কথা বলিতে বলিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির পরিচয় দিয়া কহিলেন—"ইনি একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। চন্দননগরের কোনও কলেজের অধ্যক্ষ। ইঁহার সঙ্গে আরও একজন শিক্ষক যাইতেছেন। অতঃপর কহিলেন—"আপনি আমাকে কোন্ জাতীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।" আমি কহিলাম—"you look very much like a Bengalee" তিনি কহিলেন—"You are mistaken. I am also a Madrasee" তবে আমি কলিকাতায় সর্ব্বদা যাতায়াত করি বলিয়া অনেকের ভাষা বুঝিতে পারি। অধ্যক্ষ মহোদয় অধিক কথা কহেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিদ্রালু বা নির্ব্বাক্ থাকিতেন আমি অপর ভদ্রলোকটীর সহিতই মধ্যে মধ্যে কথা কহিতে কহিতে চলিলাম। ওয়ালটেয়ার হইতে একটী সৌম্যমূর্ত্তি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সাহচর্য্য পাইয়া বড়ই খুসী হইলাম। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী গ্রাজুয়েট। এম-এ পরীক্ষাও দিয়াছিলেন। লোকটী বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ। বাঙ্গালার পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে জানেন এবং তদীয় শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত। তিনি বিবেকানন্দের ভক্তি-যোগ, কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি তাবৎ পুস্তকই পাঠ করিয়াছেন। আমি পরমহংস দেবকে স্বয়ং দর্শন করিয়াছি শ্রবণ করিয়া তিনি পুলকিত হইলেন এবং কহিলেন—"আপনি ধন্য" আমি তাঁহার সহিত নানা প্রসঙ্গ করিয়া পরিশেষে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাও তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলাম। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই।

তাঁহাকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত "Lord Gouranga" দুই খণ্ড পুস্তক বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

দেখিলাম তিনি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য মন্ত্রাদি আবৃত্তির পর, মূল রামায়ণ হইতেও কোন অংশ আবৃত্তি করিলেন। তিনি কামরার নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন—"আমাদের অঞ্চলে অবরোধ প্রথা নাই। কারণ এখানে মুসলমান প্রভাব অত্যল্প। এখানকার ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মাংসাদি প্রাণান্তেও গ্রহণ করেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সাধারণের আচার আমাদের নিকট বড়ই নিন্দনীয়। আমরা মাদ্রাজ অবতরণ করিয়া ১০।১২ ঘণ্টা বিশ্রাম করিব এবং অন্ন ভক্ষণ করিব, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি কহিলেন—"আমি সাদরে আপনাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু আমার বাসা ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে। বিশেষতঃ আমাদের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন আপনাদিগের কিছুতেই মুখরোচক হইবে না। আমরা অত্যধিক মাত্রায় লঙ্কা ও তেঁতুল ব্যবহার করিয়া থাকি।" আমি ষ্টেশনের নিকট আপনাকে সুন্দর ধর্ম্মশালা দেখাইয়া দিব। সেখানে আপনারা ইচ্ছামত পাকাদি করিবেন, কোনও অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যদি সময় পান, তবে পার্থসারথীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির এবং ঈশ্বর স্বামীর মন্দির না দেখিয়া মান্দ্রাজ হইতে যাইবেন না। প্রত্যেক হিন্দুযাত্রীরই ঐ দুই মন্দির দর্শন করা কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের উক্ত দুই মন্দির দর্শন করিবার সময় হইল না।

ভদ্রলোকটীর কাব্যাদি গ্রন্থেও বেশ অনুরাগ আছে। নিজে অনেক ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন। সঙ্গে Edmund spenser নামক ইংরাজি প্রাচীন কবির সুপ্রসিদ্ধ Faery Gucene নামক কাব্যগ্রন্থ

খানি রহিয়াছে। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। আমি পুস্তকখানি হস্তে লইয়া দেখিলাম উহার অক্ষর ক্ষুদ্র, কহিলাম—ইহার অপেক্ষা এই পুস্তকের উৎকৃষ্টতর সংস্করণ দেখিয়াছি।" বস্তুতঃ কলিকাতা আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী মহোদয় আমাকে উক্ত পুস্তকের একখানি সচিত্র সুবৃহৎ অক্ষর সমন্বিত উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখাইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ভদ্রলোকটীর নাম শ্রীযুক্ত আর শ্রীনিবাস দেশীকান। মান্দ্রাজ সহরের ৪নং পেওয়াল ওয়ার, কোবিল ষ্ট্রীট, ট্রিপ্লিকেনে নিবাস। মান্দ্রাজে যাইতে যাইতে একটী ক্ষেত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন—"দেখুন ঐ স্থানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে।" দেখিলাম ক্ষেত্রসমূহের স্থান সকল চতুষ্কোণ আকারে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই সমুদ্র জল সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হইয়া লবণ প্রস্তুত হইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই লবণ কি খাদ্যার্থে ব্যবহার করা যায়?" তিনি কহিলেন—"ইহাকে বালি ও কঙ্কর হইতে পৃথক করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে।"

বুধবার বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় আমরা মান্দ্রাজ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ভদ্রলোকটীও আমাদের সহিত অবতরণ করিলেন। পাছে মুটেরা আমাদের নিকট অধিক ভাড়া আদায় করে এই আশঙ্কায় তিনি নিজ হস্তে আমাদের কোন কোন মোট নামাইতে লাগিলেন। কহিলেন—"আপনাদের অপরিচিত দেখিয়া সহজেই প্রতারিত করিবে।" তারপর আমাদের ধর্ম্মশালায় লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন এমন সময় আমাদের সহযাত্রী রায়সাহেব হরিদাস গোস্বামী কহিলেন "আর অন্য কোথাও যাইতে হইবে না। আমার পরিচিত এই ভদ্রলোকটী নিজ বাসায় আমাদিগকে লইয়া যাইবেন।" এই বলিয়া তিনি ভদ্রলোকটীর নিকট

আমাকে লইয়া চলিলেন। আমি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটীর নিকট বিনয় সহকারে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এই নূতন ভদ্রলোকটীর পরিচয়ে জানিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী। বাটী বর্দ্ধমান জেলার মেমারী নামক গ্রামে। তিনি সহৃদয় বন্ধুর ন্যায় দুইখানি অশ্বযানে আমাদিগকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় বহু যত্ন সহকারে আমাদের পৃথক্ পৃথক্ পাকাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা তাহার বাসায় আসিয়া স্নানাহার পূর্ব্বক সুস্থ হইলাম; বিশেষতঃ তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্র ব্যবহারে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আহারের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার সুপরিষ্কৃত দ্বিতল গৃহে আমাদের বিশ্রাম স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। ভদ্রলোকটীর নাম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বিষয়ী। তিনি মান্দ্রাজে তসর ও রেশমের বস্ত্রাদি বিক্রয় করেন। এই তসর ও রেশম অবশ্য বঙ্গদেশজাত। শুনিলাম সিঙ্গাপুর এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহাদের এই কারবার পুরুষানুক্রমে আছে। ভদ্রলোকটীর একটী দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা পিতার অনুপস্থিতিকালে আমাদের সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিল। পিতা যেমন অমায়িক, কন্যাটী তেমনই সুন্দরী ও সুশীলা। শুনিলাম তাহার পিতা তাহার বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতেছেন।

ভদ্রলোকটীর বাসায় জলের কল আছে, কলের জল ব্যবহার করিয়া কেমন এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। এই কথা প্রকাশ করায়, কন্যাটী কহিল—"আমরাও প্রথম আসিয়া এইরূপ গন্ধ অনুভব করিতাম ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে।" শ্রীশ্রী৺রামেশ্বর তীর্থের কলের জলেও আমার কেমন এক প্রকার "আঁংশটে" গন্ধ লাগিত। বোধহয় সমুদ্র সান্নিধ্য হেতুই জলের এই প্রকার বিস্বাদ। কিন্তু পুরীর কূপাদির জল কিঞ্চিৎ লবণাক্ত, তাহাতে "আঁংশটে" গন্ধ তত অনুভূত হয় নাই!

যাহাহউক আহারান্তে আমরা মোটর গাড়ীতে চড়িয়া Sea beach অর্থাৎ সমুদ্রতীর দর্শনে বহির্গত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ৩টা। প্রচণ্ড রৌদ্র। ধীবর বালকগণ সমুদ্রে খেলা করিতেছে। তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়দ্‌ক্ষণ মহাবারিধির তরঙ্গ বিভঙ্গ দর্শন করিলাম আর মনে মনে সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ একটী বিশাল তরঙ্গ তটভূমির দিকে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগের পাদুকাগুলি সিক্ত করিয়া দিয়া গেল। আমরা মহোদধির লহরী লীলা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা ভক্তিসহকারে সাগরবারির কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ পরে আমরা প্রত্যেকে এক এক আনা দর্শনী দিয়া Aquarium অর্থাৎ জীবিত মৎস্যের প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। এখানে বিবিধ বর্ণের ও নানা আকারের সামুদ্রিক মৎস্য জীবিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। মৎস্য সকল সন্দর্শন করিয়া আমরা স্রষ্টা অপার মহিমা স্মরণে পুলকিত হইলাম। তৎপরে আমরা Madras Presidency College, The High Court, The Law College, Monro's Statue, The Fort Saint George, The Memorial Hall প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ হর্ম্ম্য সকল দর্শন করিতে করিতে Customs House ও Harbour বা বন্দর দর্শনাভিলাষে পুনরায় মোটর যোগে আসিতে লাগিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে Harbour দেখিবার pass পাওয়া গেল না। ক্রমে বাসাভিমুখে রওনা হইলাম। মান্দ্রাজের রাজপথ সকল কলিকাতার ন্যায় তত সুপ্রশস্ত নহে। ইহার হর্ম্ম্যমালা সমূহ কলিকাতার হর্ম্ম্যমালার অনুকরণে নির্ম্মিত হইলেও, মান্দ্রাজের ট্রামগাড়ী ও অট্টালিকাদি কলিকাতার অপেক্ষা হীন। বুঝিলাম কলিকাতার "প্রাসাদময়ী নগরী" নাম সার্থকই হইয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজে আজকাল যেরূপ শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে আর

Benighted Presidency, কিম্বা অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন প্রদেশ বলা চলে না। গাড়ীতে পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মাদ্রাজের যাদুঘর অপেক্ষা কলিকাতার যাদুঘর নিকৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।

কলিকাতায় বৈষ্ণব-প্রদর্শনী *

(শ্রীযুক্তসত্যকিঙ্কর রায় বি, এ, লিখিত।)

এবারে মহানগরী কলিকাতাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে একটী অভিনব বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়ায়, সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ কেবল ভক্তগণকে নহে—সর্ব্বসাধারণকেও বিশেষভাবে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর স্থান হইয়াছিল সম্মিলনীর নিজস্ব গৃহ, ১।১এ চালতাবাগান সেকেণ্ড লেন—'শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে'। প্রদর্শনী বিগত ৪ঠা আষাঢ় হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ৮ দিবস খোলা ছিল, তন্মধ্যে এক দিবস কেবল মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও সাধারণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। আরও কিছুদিন খুলিয়া

* প্রবন্ধটী আরও পূর্ব্বে প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিলম্ব হইলেও ভক্তির পাঠকগণের অনেকেই প্রদর্শনী দেখিবার সুবিধা পান নাই বলিয়া আমারা অন্ততঃ দ্রষ্টব্য বিষয়গুলিরও মোটা মোটী একটি তালিকা জানিবার সুযোগ হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর এই প্রচেষ্টা যথার্থই প্রশংসনীয়। (ভঃ সঃ)

রাখিবার জন্য সংবাদপত্রের মারফতে অনুরোধ আসিয়াছিল। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ ব্যায়াধিক্য বশতঃ এবার সাধারণের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই ; এজন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবেই দুঃখিত হইয়াছেন শুনিলাম।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন বা দ্বার উদ্‌ঘাটন ক্রিয়া করেন গৌড়-রাজর্ষি—মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়। ঐ দিবস সম্মিলনী-গৃহে একটী বৈষ্ণব গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহোদয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন-মন্দিরের প্রাঙ্গনে ধ্বজা পতাকা শোভিত বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মণ্ডপ মধ্যে কয়দিন, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভক্তের দ্বারা শ্রীনামকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও শ্রীভাগবতাদি পাঠ ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

(১ম—হস্তাক্ষর বিভাগ)

মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রদর্শনী দেখিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দর্শকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে আমরা ধূপধুম্র গন্ধামোদিত ও মৃন্ময়পাত্রে বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত প্রদর্শনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যাহা প্রথমেই দর্শন করিলাম তাহাতে চমৎকৃত ও বিশেষ ভাবে আনন্দ উপভোগ করিলাম। দেখিলাম একটি টেবিলের উপরিভাগে বহুমূল্য বস্ত্র বিমণ্ডিত সিংহাসনাকৃতি উচ্চ আসনে নানাবিধ পুষ্প ও পুষ্পগার শোভিত কতকগুলি হস্তাক্ষর এবং পুঁথি, কাচ-মণ্ডিত অবস্থায় সজ্জিত রহিয়াছে এবং দর্শকগণ ভক্তি গদ-গদ চিত্তে ঐগুলি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রণাম করিতেছেন। নিকটে গিয়া দেখিলাম সর্ব্বোচ্চ আসনে রক্ষিত হইয়াছে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীহস্তাক্ষর।” মহাপ্রভুর “শ্রীহস্তের লেখনী এ কথা ভাবিতেই প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর কৃপায় ঐ অমূল্য রত্নরাজি সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। উক্ত শ্রীহস্তাক্ষরের নিম্নে দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিরচিত "শ্রীশ্রীরাধা রসমঞ্জরী" ও "শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র" নামক কাচমণ্ডিত ২খানি অপূর্ব্ব পুঁথি। পুঁথি দুইখানিই অতীব প্রাচীন। শুনিলাম লালগড় রাজ্য হইতে এই দুইখানি শ্রীগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

তাহার নিম্নের আসনে শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুরের হস্তাক্ষর; তন্নিম্নে শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" নামক পুঁথির একখানি পাতা। ইহার পার্শ্বে শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী ও শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতির হস্তাক্ষর। এই হস্তাক্ষর বিভাগে আরও কতকগুলি দ্রব্য দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ ভাবেই আনন্দ লাভ করিলাম।

আট শত বর্ষ পূর্ব্বের অর্থাৎ গোবিন্দপালের রাজত্বকালে বঙ্গাক্ষরে লেখা একখানি সংস্কৃত পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠার ফটো দেখিলাম। এখানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংগৃহীত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতির হস্তাক্ষরও দেখিলাম। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমান যুগের প্রভুপাদ, আচার্য্য, মহান্ত, ভক্ত, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক, বৈষ্ণব-গ্রন্থকার, বৈষ্ণব-পত্রিকা-সম্পাদক, প্রভৃতি গৌর ভক্তগণের হস্তাক্ষরও এক স্থানে বহু পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে দেখিলাম।

সিংহাসনের একধারে স্বতন্ত্র উচ্চ আসনে পুষ্পহার শোভিত একটী পিত্তলের 'খুন্তি' দেখিলাম। উহা তৎকালের বাদশাহের পাসপোর্ট, ঐটী সঙ্গে থাকিলে কোন ব্যক্তিরই সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিবার ক্ষমতা থাকিত না। শুনিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল কানাই ঠাকুর সঙ্কীর্ত্তন কালে এইটী ব্যবহার করিতেন। এটীও একটী ঐতিহাসিক দ্রব্য।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভক্তি

পৌষ ও মাঘ
১৩৩৪

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

—*—

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

প্রতিষ্ঠায় শূকরী বিষ্ঠা সম জ্ঞান হবে,
গৌরব পাইয়া রৌরব ভয় হবে কবে।
অসত্য ছাড়িয়া ধরি তব পদ তরি,
শমনে করিব জয় কবে বল হরি।

দীনবন্ধু হে, কবে আমার এমন দিন হবে? দিনের পর দিন তো সংসার চক্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়াই যাইতেছে; সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, ভাব লাভের পরিবর্ত্তে নানা প্রকারের অভাব, অসৎ চিন্তা দিনে দিনে বাড়িতেছে ছাড়া কমিতেছেনা, এ জীবন কি এইভাবে বৃথাই যাইবে? স্বভাবতই আমি অজ্ঞানান্ধ,

তাহাতে আবার কখন কুলের, কখন ধনের, কখন বা অধীতশাস্ত্রাদির অভিমানে একেবারে ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হই। কি করিলে নিজের মঙ্গল হইবে, কোন্ কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, কেন আমি মানুষ হইয়া আসিলাম, ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিতে কেনইবা শক্তি পাইলাম, কোন্ বস্তু লাভের জন্যইবা বাঁচিয়া আছি, ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন বাঞ্ছিত সুখলাভে বঞ্চিত রহিয়াছি এ সকল বিষয় আলোচনা একবারের জন্যও করি না।

আমি যোগ্য, আমি যাহা করিব তাহাতে অবশ্যই যশঃ ও ধনাদিলাভ হইবে, এইরূপ ধারণা হৃদয়ে লইয়া গর্ব্বের সহিত যখনই কর্ম্ম করিতে যাই, তখনই দর্পহারী তোমার শক্তিতে শাষিত হইয়া বিফল মনোরথ হই। এইভাবে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই অভিমানের দ্বারা যে একটি সামান্য কার্য্যও হইতে পারেনা তাহা বুঝাইয়া দাও, তথাপি আমার কি যে দুর্দ্দৈব আমি অভিমান ছাড়িতে পারি না। জুড়াইব বলিয়া যাহার কাছে যাই তাহাকেও আমারই মত দুর্দ্দমনীয় অভিমান রোগে রুগ্ন ভগ্ন দেখি। আমার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রাণে বিবেক বৈরাগ্যের বল সঞ্চার করিতে, জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝাইতে একটীও প্রাণের বন্ধু মিলিল না, পরন্তু সংসার মোহে ভুলাইতে লোকের অভাব হয়না। এই ভাবে এ জীবনে ভজন সাধন হওয়া বড়ই অসম্ভব। এখন বল ভরসা, সহায় সম্পদ একমাত্র তুমি। তুমি যদি ভালবাসিয়া নিজগুণে আমার দুঃখ দূর না কর, তাহা হইলে আর আমার উপায় নাই। আজ তোমার অভয়পদে আমার এই প্রার্থনা, তুমি কৃপা করিয়া আমার অভিমান রূপ মহাব্যাধি বিনাশ কর, আমি রোগ মুক্ত হইয়া, নত নম্র ভাবরূপ সুস্থতা লাভ করিয়া, তোমার মঙ্গলময় শ্রীচরণাশ্রয়ে ধন্য হইয়া তোমার সর্ব্বনিয়ামক অনুপমেয় নাম মহিমা গান করিয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করি।

জীবনের বহু সময় বৃথা গিয়াছে, আর যাহাতে একটী মুহূর্ত্তও বৃথা না

যায়, তাহা কর। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়া আর আমাকে চঞ্চল করিও না, তোমার ভাবে বিভোর করিয়া রাখ, জীবনে যাহাতে একটীবারও তোমার প্রেমময় মূরতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি— তাপিত হৃদয় জুড়াইতে পারি, তাহা কর। আজ এইটুকুই তোমার পদে আমার কাতর প্রার্থনা।

দাওহে দেখিতে হে প্রাণরমণ !
　　তোমারে পরাণ ভরিয়া।
কৃপাকরি লও মানসমোহন !
　　আমার মানস হরিয়া॥
তোমার মোহন বাঁশরীর তানে
　　(আমার) শ্রুতিযুগ যাক্ ভরিয়া।
অহঃরহ নিশি তব গুণ গানে
　　থাকুক রসনা মাতিয়া॥
পরশ মণির চরণ পরশে
　　(দাও) মায়ার বাঁধন খুলিয়া।
(দেখি) ও রূপ মাধুরী মনের হরষে
　　নয়ন যুগল ভরিয়া॥
আমার যা' কিছু ওহে দয়াময় !
　　সকলি লওহে কাড়িয়া।
(আমি) নিশিদিন থাকি সকল পাশরি
　　হে নাথ ! তোমায় হইয়া॥

দীন—শ্রী—

নিমাইয়ের পৌগণ্ড *

দিনে দিনে পাঠ্য শেষ হ'ল কয় খণ্ড
বাল্যগিয়া নিমায়ের আসিল পৌগণ্ড
পৌগণ্ড কালের কিবা সুচারু বদন
হাসিতে অমিয় ঝরে ভাসে ত্রিভুবন
নয়নে না ধরে রূপ পৌগণ্ডের ছলে
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বিহরে ভূতলে
কিবা সে গৌর অঙ্গে ঢল ঢল কান্তি
কুসুম-কোমল তার স্পর্শে কত শান্তি

---

* সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ! ইতিপূর্ব্বে ভক্তিতে আপনারা অবধূত বিশ্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গীত-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। মধ্যে তিনি তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেবার জন্য আপনাদের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। বড়ই আনন্দের সংবাদ যে, তিনি পুনরায় আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় অমিয়া মাখান গৌর-কথা শুনিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত অভিনব গ্রন্থ **শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য**" শীঘ্রই পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। আমরা উক্ত শ্রীগ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পৌগণ্ড লীলার একটী চিত্র আজ আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। শ্রীগ্রন্থের যতটুকু আমরা দেখিয়াছি, তাহার প্রত্যেক ছত্রটীই বিশেষ উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। অনেকেই গ্রন্থ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা এই লীলাচিত্রটী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সংবাদটীও জানাইয়া রাখিলাম। আর একটি কথা—অনেকে ইঁহার বংশপরিচয়াদি জানিতে চাহেন, বলা বাহুল্য তাহাও তাঁহার ঐ গ্রন্থ মধ্যে পাইবেন। গ্রন্থ শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবে। (ভক্তি-সম্পাদক)

নবীন বয়সে সম বয়সীর মেলে
উদ্ধত নিমাই এবে পড়ে পাঠশালে
পথে যেতে লোক তার পানে শুধু চায়
কেহবা আদরে ডাকি কাছেতে বসায়
নিমায়ের পানে চেয়ে ভাবে সবে মনে
নরদেহে এত রূপ হইল কেমনে
কবির বর্ণনা শুনি কল্পনা প্রসূত
এরূপ দর্শনে মানি নহে অসঙ্গত
নিমাই সুন্দর এবে পিতার সেবক
পিতৃ-সেবা করে পুত্র যতন পূর্ব্বক
জগন্নাথ মিশ্র হন গৃহস্থ সজ্জন
স্বধর্ম্মে করেন নিজ সংসার পালন
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি নবদ্বীপপুরে
কভু আমন্ত্রণ পেয়ে যান বহু দূরে
স্বগৃহে ফিরিতে যদি হয় পথ কষ্ট
প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে যদি হন ক্লিষ্ট
আসিয়া ডাকেন কৈ বাপ বিশ্বম্ভর
আমার কাষ্ঠ-পাদুকা আনত সত্বর
অমনি স্নেহেরপাত্র গোলোকেরপতি
পিতৃ সেবা করিবারে আসে শীঘ্রগতি
এক হাতে খড়ম ধরি শিরের উপরে
বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অন্য করে
পিতার সম্মুখে আসি দাঁড়ায় সম্ভ্রমে
হেরিতে মিশ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় প্রেমে

পুত্রের এ সেবা দেখি মিশ্র মহাজন
দু'নয়নে শত ধারা করেন বর্ষণ
ভাবেন এ হেন পুত্র কার ঘরে আছে
বিনা বেতনের ভৃত্য কে হেন পেয়েছে
পুত্রের সে চাঁদমুখ দেখিয়া যে শান্তি
তাতেই মিশ্রের দূর হয় পথ-শ্রান্তি
পুত্রও বাড়ায়ে পিতৃ মর্য্যাদা মহত্ত্ব
পিতার সম্মুখে আর না করে ঔদ্ধত্ত্ব।
বাহিরে নিমাই চঞ্চলের শিরোমণি
পিতৃস্থানে পরম গম্ভীর মহা গুণি
হেনমতে নিত্য করে বিবিধ বিলাস
অষ্টম বর্ষেতে হ'ল অধিক উল্লাস
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি রঙ্গে দুই বেলা
আরম্ভিল পূর্ব্বের আবেশে কত খেলা
নিমায়ের সঙ্গিগণ সকলেই ধন্য
নিমাই বিহনে তারা নাহি জানে অন্য
খেতে শুতে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদাই
কেবল তাদের মুখে নিমাই নিমাই
নিমাইয়ের সঙ্গে তারা সতত বিহ্বল
নিমাই তাদের বুদ্ধি ভরসা সম্বল
সম বয় সঙ্গিগণ আর সমপাঠি
কভু দলবদ্ধ হ'য়ে আসে প্রাতে উঠি
তা'সবারে দেখি পূর্ব্ব আবেশে নিমাই
শয্যাহ'তে উঠি কহে জননীর ঠাঁই

দে মা সাজায়ে যাব সুরধুনী তীরে
গোবৎস চরাব আজ না রহিব ঘরে
গোষ্ঠেতে খেলিব কাল ব'লে ছিনু তাই—
আসিয়াছে সঙ্গিগণ সাজিয়া সবাই
এতবলি জননীর অঞ্চল ধরিয়া
কহে ননী দেমা লই বসনে বাঁধিয়া
শুনি শচী কন আমি নহি আহিরিণী
প্রভাতে উঠিয়া কোথা পাইব নবনী
ঘরে আছে মিষ্টান্ন সন্দেশ খৈ কলা—
এ সব লইয়া যাও খেল গোষ্ঠ খেলা
নিমাই কহেগো মাতা উহা না লইব
নবনী না হ'লে গোষ্ঠে কেমনে যাইব
কেনইবা ননী ছানা নাই তোর ঘরে
তুই না দিলে কি তবে খাব চুরি ক'রে
এদিকে বালকগণ করে মহাগোল
কার মুখে হৈ হৈ আবা আবা বোল
এত শুনি আসি যত পাড়ার রমণী
কেহ দেয় ছানাক্ষীর কেহবা নবনী
ননী ছানা পেয়ে সবার আনন্দিত মন
নিমাই চাঁদেরে ঘিরে নাচে সঙ্গিগণ।

কীর্ত্তন মিশ্র—ছায়ানট—একতালা

আয় তোরে সাজায়ে গোপাল, আমরা রাখাল সাজব ভাই
ওরে হারেরে নিমাই।

(তোরে) সাজিয়ে কানু গোরাতনু দেখ'ব কেমন সাজে ভাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

তুই হবি ব্রজের মাখম চোর—
(আমরা) যত রাখাল সন্ধ্যাসকাল সঙ্গে ফিরব তোর
নদীয়ার বাড়ী বাড়ী— মাখম চুরি—করবো ভাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

তুই হবি রাখালের রাজা
(আমরা) কেউবা মন্ত্রী সাজবরে তোর কেউ হব প্রজা
তুই মোদের রাজার রাজা—হৃদয় রাজা—প্রাণের ভাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

তুই ব'সে বাজাবি বেণু
(ওভাই) আমরা ছুঠে গোঠে মাঠে চরাব ধেনু
বেণু শুনি সুরধূনী—বইবে উজান—দেখবো তাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

তুই কেলীকদম্বের মূলে
সুত্রিভঙ্গ ঠামে ঈষৎ বামে দাঁড়াবি হেলে
মোরা তুলি ঘোররোল—বাজায়ে বগল—হৈ হৈ রবে নাচব ভাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

কাঙ্গাল বিশ্বরূপে তাই—
এসব রঙ্গ দেখে ব'লছে হেকে শোন্‌রে নিমাই ভাই
নেচে আয় ব্রজের ভাবে—তুইযে মোদের—ভাই কানাই
ওরে হারেরে নিমাই ॥

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী

৺কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দমিলন

(২)

প্রকাশানন্দের মানসিক ভাব এতদ্দ্বারা বেশ উপলব্ধি হইতেছে। তিনি কুটিলতা বর্জ্জিত সরল সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুকে কেন লোকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতেছে; কেবল আত্মজ্ঞান বিরহিত মূর্খ লোক নয়, তত্তুল্য প্রতিভাবান মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় সর্ব্বজন-বরেণ্য মণীষীগণও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কেন ভগবান বলিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় বিব্রত হইলেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ লোক হইলে কোন কথা ছিল না, হাসিয়াই উড়াইয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু নৈয়ায়িক শিরোমণি বাসুদেব ভট্টাচার্য্যও যে সেই দলভুক্ত! কাজেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিশ্চই কোন যাদুবিদ্যা জানেন, এবং এই বিদ্যা-প্রভাবে পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে সমভাবে মোহাচ্ছন্ন করিতেছেন, সরল সন্ন্যাসী ঠাকুরের মনে এই ধারণা এতই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে সাবধান করিতেছেন—কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নিকট না যায়; কি জানি দর্শন প্রভাবেই যদি সেই বিদ্যা দ্বারা মোহিত হয়! তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন—

"সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি॥"

জীব যে গুণে ভগবানের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন—যাহার প্রভাবে সংসারের সকল বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, গোপীগণ একদিন যে গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বামী, পুত্র সংসার পশ্চাতে রাখিয়া পাগলিনী প্রায় কালিন্দীতটে

ছুটিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যদি ভগবানের যাদু বিদ্যা বলা যায়, তবে প্রকাশানন্দ বড় মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার মুখ হইতে খাঁটি সত্যই বাহির হইয়াছে। কিন্তু বক্তা স্বয়ং তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

প্রভুরনিন্দাচ্ছলে প্রকাশানন্দের এই উপহাসবাণী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইল। প্রভুদর্শনে ব্রাহ্মণের হৃদয় মন পবিত্র হইয়াছে। মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অনুরাগের অঙ্কুর জন্মিয়াছে। তিনি যে সাধারণ প্রাকৃত মানব নহেন—ইহা বিপ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কাজেই সন্ন্যাসীর বিদ্রুপাত্মক তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি প্রকাশানন্দের সভা অপবিত্র জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন।

এক প্রকাশানন্দের জীবন ইতিহাস বিশদরূপ আলোচনা করিলেই প্রভুর স্বরূপ চিরকালের তরে অভ্রান্ত অক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিতে পারে। বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণ্য এই প্রকাশানন্দের পরে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই আখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র অতি দুঃখিত চিত্তে প্রকাশানন্দের সভা ত্যাগ করিয়া আসিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া "ঈষৎ হাসিলেন।" বিপ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,প্রভু ! একটী সন্দেহ আমাকে বড়ইক্ষুব্ধ করিতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন অবজ্ঞাভরে তোমার নাম তখন লইতেছিল "চৈতন্য" "চৈতন্য"—বলিয়া তোমার নাম উচ্চারণ করিল—

"তিন বারেও কৃষ্ণ নাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে ॥"

প্রভু ইহার অর্থ কি ? তোমাকে দর্শনাবধি আমার মুখে যে কেবল কৃষ্ণ নামই স্ফুরণ হইতেছে, নাম যে ছাড়িতে পারিতেছি না। তবে

প্রকাশানন্দের জিহ্বায় তিন বারেও কৃষ্ণনাম আসিল না কেন?" প্রভু উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা বড় আশার বাণী—নাম সাধক, অনুগত প্রাণ কলির জীবের বড় আদরের—বড় ভরষার কথা।

"প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই ত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥"
"নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যো রসবিগ্রহ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ॥"

পরে ঈষদ্ধাস্তে বলিলেন—

"ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় ল'য়ে যাব ঘরে॥"

আবার পরমুহূর্ত্তেই করুণাময় প্রভু বলিলেন—

"ভারি বোঝা লইয়া আসিলাম কেমনে লইয়া যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥"

প্রভু তখন দ্রুত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন আর প্রকাশানন্দেরও জ্ঞান কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের তখনও শুভক্ষণ উপস্থিত হয় নাই; তাই সে যাত্রায় তাঁহার উদ্ধার সাধিত হইল না। প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তন, তাহার উদ্ধার কাহিনী বড় মনোজ্ঞ, তাহা গৌরলীলার এক অপূর্ব্ব সম্পদ। সেই পুণ্য কাহিনী আমরা বলিতে চেষ্টা করিতেছি

কিন্তু যেমন করিয়া বলিলে ঠিক বলা হয় তাহা পারিব কি না মহাপ্রভুই জানেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকাশানন্দ প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার উদ্ধত সন্ন্যাসী শিষ্যগণও সতত সর্ব্বসমাজে প্রভুর অযথা নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া দেহ আত্ম কলুষিত করিতেছিল। প্রভু তো মত্ত-সিংহ প্রায় কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাশী হইতে বৃন্দাবন পথে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তবৃন্দ যাঁহারা কাশীতে রহিলেন—যথা, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং তৎসঙ্গে কাশীর বহু নরনারী ইঁহারা প্রভুর এই নিন্দাবাদে সর্ব্বদাই সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। কাশীতে প্রকাশানন্দের প্রবল প্রতাপ, মুখ ফুটিয়া কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না; কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইত। তাঁহারা অতি ম্রিয়মান হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আবার কাশীতে আসিয়া চন্দ্রশেখরের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণের মৃতকল্প প্রাণ আবার সজীব হইল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যে প্রকাশানন্দকে সবিশেষ জানিতেন এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"প্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দের এই বিদ্বেষভাবের কি কারণ? তাঁহার ন্যায় পরমজ্ঞানী, নির্ম্মল চিত্ত যোগীর পক্ষে বৈরীভাব পোষণ করার কোন কারণই ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাইলেন না। ব্রাহ্মণের ধারণা হইল প্রকাশানন্দ এ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুকে একবারও দেখেন নাই যদি কোন উপায়ে প্রভুর দেবদুর্ল্লভ প্রেমকান্তি একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তবে এই বিদ্বেষভাব অনুতাপানলে নিশ্চয়ই ভষ্মীভূত হইবে। ব্রাহ্মণ উভয়ের মিলনের জন্য উৎগ্রীব হইলেন। কিন্তু ইহা তো সহজ সাধ্য নহে! প্রভু

কখনও সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সংস্পর্শে যাইতেন না—সন্ন্যাসীরদলও তাঁহার নাম শুনিতে পারিতেন না। প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—নাচিয়া গাহিয়া ভগবৎভজন—নৃত্য ও কীর্ত্তন দ্বারা সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া, প্রভুর ধর্ম্মে নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলির জীবের "পরম উপায়"। আর বেদান্ত-সর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীর পক্ষে নৃত্যাদি নিতান্ত দূষনীয় ভাবকালিমাত্র—সাধনার দারুণ অন্তরায় এবং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। উভয়ের ভজন প্রণালি পরস্পর বিরুদ্ধপথ-গামী।

সন্ন্যাসীর যোগের পথ—জ্ঞানের পথ, মহাপ্রভুর ভক্তির পথ—প্রেমের পথ। একটি নিরস শুষ্ক, কঠোর—অপরটি সরস ও আনন্দময়। সন্ন্যাসী কেবল শিখিয়াছেন—ভগবৎভজন বড় কৃচ্ছ্রসাধ্য—মানব হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি নির্ম্মম ভাবে নিরোধ বা উন্মূলিত করিতে না পারিলে ভগবৎ সান্নিধ্যে যাওয়া যায় না। ভগবান যে প্রেমময়—আনন্দময়—নিজ জন, প্রেমের—আনন্দের ভজনদ্বারা নাচিয়া গাহিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার নিকট যে অতি সত্বর যাওয়া যায় সন্ন্যাসী তাহা জানেন না, বেদান্ত এ মহাশিক্ষা তাঁহাকে দেয় নাই।

বিপ্র ভাবিতেছেন কি উপায়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন হইবে, কেমন করিয়া এই দুই বিভিন্নপথগামী ধারা একত্র প্রবাহিত হইয়া তাপ-দগ্ধ পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করিবে। ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি অসাধ্য সাধন করিতে তাঁহার সমগ্র শক্তি, সমস্ত সামর্থ নিয়োজিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, আর অলক্ষিতে তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের উপর ভগবানের পুণ্যাশীষ বর্ষিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ অর্থশালী পদস্থ ব্যক্তি, একদিন ব্রাহ্মণ হঠাৎ প্রকাশানন্দের সভায় উপস্থিত হইয়া গণ সহ তাঁহাকে তাহার নিজ বাটীতে

ভিক্ষা নির্ব্বাহের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে প্রকাশানন্দের কোন আপত্তিই হইতে পারে না। বিপ্র তৎপর প্রভুকেও তাঁহার আশার নির্দ্ধারিত দিনে ভিক্ষা গ্রহণ জন্য কাতরে প্রার্থনা করিলেন।

"বিপ্র আসি নিবেদন করি চরণ ধরিয়া।
এক বস্তু মাগে দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥"

তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত ছিলেন, ব্রাহ্মণের মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। তাই তাঁহারাও প্রভুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তখন—

"প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।"

ব্রাহ্মণালয়ে আজ বিরাট সভা। মনোরম চন্দ্রাতপতলে দশ সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্যসহ বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সমাসীন! মহাপ্রভু যে বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন সন্ন্যাসিগণ তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। মনে বৈরীভাব থাকিলেও যে শক্তিধরের প্রভাবে সমগ্র উৎকল ও দাক্ষিণাত্যভূমি এক নবভাবের প্রবল বন্যায় ভাসমান হইয়াছে, একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলে উৎগ্রীব হইয়াছেন। ক্রমে সময় উত্তীর্ণ প্রায়। কিন্তু প্রভুর সাক্ষাৎ নাই। সন্ন্যাসিগণের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আসিবেন না? নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা না করাও ত সম্ভবপর নহে? এমন সময় সেই বিপুল জনমণ্ডলির মধ্যে এক উত্তেজনা

লক্ষিত হইল। "ঐ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিতেছেন" "ঐ আসিতেছেন"—মুখে মুখে প্রচার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন জ্ঞাপন করিল।

সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত নেত্রে সেই নয়নাভিরাম প্রেম কান্তি দেখিলেন—প্রভু আসিতেছেন, কোন দিকে দৃষ্টি নাই—কোন দিকে লক্ষ্য নাই। আনত দৃষ্টি কেবল ভূমিতে নিবদ্ধ। দুই হস্ত নাম জপে রত। বিম্ব-বিড়ম্বিত ওষ্ঠাধর মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে—আর অরুণ নয়ন হইতে অবিরাম গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইয়া চারুগণ্ডস্থল, প্রসর উরস সিক্ত করিয়া ধরাতলে পতিত হইতেছে। সশিষ্য প্রকাশানন্দ দেখিতেছেন—গৈরিক পরিধানে লাবণ্য মণ্ডিত সুকুমার কান্তি এক নবীন সন্ন্যাসী! তাঁহার দেব-শরীর হইতে আনন্দ-তরঙ্গ তড়িৎ প্রবাহবৎ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। মুখখানি যেন পূর্ণিমার শশী। নয়নকোণ হইতে বিশ্বপ্লাবী প্রেম ও করুণা শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ন্যাসিগণের মনে হইতে লাগিল প্রভুর প্রতি পদক্ষেপে উৎফুল্লা বসুন্ধরা যেন পুলকে রোমাঞ্চিতা হইতেছে!

বিস্মিত প্রকাশানন্দ নির্নিমেষ নয়নে দেখিলেন প্রেমের পরিপূর্ণ জীবন্ত ছবি একখানি লাবণ্য ঢল ঢল কণক প্রতিমা ধীরে—অতি ধীরে তাহার সভার দিকে নিরবে অগ্রসর হইতেছেন। চতুর্দ্দিক নিরব! সন্ন্যাসিগণ বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্। শিষ্যগণের কলকণ্ঠ থামিয়া গিয়াছে। সকলের সমবেত দৃষ্টি ঐ লোক ললামভূত শ্রীমূর্ত্তির প্রতি ন্যস্ত। ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? ইনিই মহাশক্তিধর, যিনি কৃষ্ণনামামৃতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতেছেন?

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি, এল

কলিকাতা বৈষ্ণব-প্রদর্শনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঐ খুন্তিখানির পার্শ্বে পারস্য ভাষায় লিখিত ও বাদসাহ আরংজেবের মোহরাঙ্কিত দুইখানি ফরমান্ বা দলিল ছিল। বৃহৎখানির ইংরাজি তরজমাও রক্ষিত ছিল। ২য় ফরমান্‌খানি ছোট আকারের। ইহার অনুবাদ রক্ষিত হয় নাই।

২য়—বৈষ্ণব গ্রন্থ-বিভাগ—এই বিভাগে আমরা ৪টী শ্রেণী দেখিলাম। ১ম বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা, ২য়—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বিভিন্ন সংস্করণের একত্র সমাবেশ। ৩য়—মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং ৪র্থ—বাংলা ভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় মুদ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জীবনী গ্রন্থ।

১ম—মাসিক পত্রিকা বিভাগে দেখিলাম পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বর্ষ ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতগুলি, ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্র ও পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা ভিত্তিগাত্রে লম্বিত রহিয়াছে এবং নিম্নে ঐ সমুদয় পত্র ও পত্রিকার অধিকাংশেরই এক এক সংখ্যা সজ্জিতও আছে। ইহার মধ্যে বাংলা ভিন্ন উড়িয়া, হিন্দি ও ইরাজি ভাষায় মুদ্রিত বৈষ্ণব পত্রিকাও দেখিলাম।

২য়—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদির বিভিন্ন সংস্করণ শ্রেণীতে অনেকগুলি শ্রীগ্রন্থ দেখিলাম বটে কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও বিস্তর সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা আছে, সেগুলিও সংগ্রহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩য়—মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ শ্রেণীতেও আমরা বেশী গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম না। আশাকরি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিবেন।

৪র্থ—বিভিন্ন ভাষায় প্রভুর জীবনী গ্রন্থ। এই শ্রেণীতে কয়খানি ইংরাজি, ও উড়িয়া গ্রন্থ মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু শুনিয়াছি ইংরাজি, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দ্দু, তেলেগু, মারাটী, গুজ্‌রাটী, গুরুমুখী, বম্মিজ প্রভৃতি ভাষায়ও মহাপ্রভুর জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতাম। যাহা হউক মুদ্রিত গ্রন্থ বিভাগটীকে সম্মিলনী সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন নাই, তবে এই প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরে আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া খুবই আশা করি।

ইংরাজি ভাষায় মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একটী সন তারিখ যুক্ত তালিকাও লম্বিত থাকিতে দেখিলাম। ঐ সকল গ্রন্থকারগণের মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নামই বেশী। শ্রীসম্মিলনীর নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে ঐ সকল গ্রন্থ রক্ষিত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

৩য়—প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি বিভাগ। ইহার জন্য দুইটী বৃহৎ টেবিলে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পুঁথির সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলগুলি সজ্জিত করিবার স্থান সঙ্কুলান হয় নাই, পার্শ্বে স্তূপাকারে বহু পুঁথি রক্ষিত হইয়াছিল। পুঁথির মধ্যে সংস্কৃত এবং বাংলা দুই প্রকারের পুঁথিই ছিল। অধিকাংশেরই লিপিকাল ২।৩ শত বৎসরের অধিক। বহু অপ্রকাশিত বৈষ্ণব-গ্রন্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

৪র্থ—মানচিত্র, নক্সা, চার্ট (chart) এবং নানাবিধ তালিকা বিভাগ—এই বিভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ভারত ভ্রমণের মানচিত্রখানি একটী অমূল্য সামগ্রী। কি অঙ্গসৌষ্ঠবে, কি ঐতিহ্য-প্রমাণে সর্ব্ববিষয়েই এখানি আমাদের সমধিক ভাবে আনন্দ প্রদান

করিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আট বার ভ্রমণে বহির্গত হন, এই আট বারেরই ভ্রমণপথগুলি মানচিত্রের উপরিভাগে স্বর্ণ রঙে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পথের উপরে প্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। কৌশলী চিত্রকর শ্রীচরণের গতির দ্বারা প্রভুর গমন ও প্রত্যাগমন অতি সহজেই দর্শককে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভ্রমণ পথের ধারে ধারে সংখ্যা দিয়া নিম্নে এক স্থানে ঐ সকল সংখ্যার স্থানের নামগুলি লিখিত আছে। অনেক নূতন নূতন স্থানের নাম, অধিকন্তু মহাপ্রভু ভারতের বাহিরেও যে গমন করিয়াছিলেন তাহা এই চিত্রে দেখিলাম। এ বিষয়ের প্রমাণাদিও বিশেষ আছে বলিয়া শুনিলাম।

যাহা হউক এই মানচিত্রখানি যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। দুঃখের বিষয় নিরভিমানী চিত্রকর প্রতিষ্ঠার ভয়ে স্বীয় নামটী চিত্র মধ্যে অঙ্কিত করেন নাই, করিলে আমাদের ভক্তি উপহার প্রদানের বিশেষ সুবিধা হইত।

শুনিলাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতিরও ভারত ভ্রমণের মানচিত্র প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু অসম্পূর্ণতার জন্য ঐগুলি আর প্রদর্শিত হয় নাই। আগামী বৎসরে ঐগুলি দেখিবার জন্য আমাদের বাসনা রহিল।

এই ভারত ভ্রমণের মানচিত্রের নিকটে আর একখানি মানচিত্র দেখিলাম উহা কলিকাতা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পর্য্যন্ত সুরধুনীর তীরে তীরে যতগুলি বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে তাহার স্থান নির্দ্দেশ। এখানিতে সাধারণের অজ্ঞাত অনেক শ্রীপাটের নাম দেখিলাম।

গৃহের ভিত্তি গাত্রে আর যে সব ঐ সংক্রান্ত দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে সেগুলির পরিচয় লওয়া বা বোধগম্য করা ২।৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমাদের সাধ্য হইল না। ২।৩ দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তবে কথঞ্চিৎ

বোধগম্যের সম্ভাবনা, এজন্য আমরা অনেক দ্রব্য একবার মাত্র চোক্ বুলাইয়া লইয়াই তৃপ্ত হইলাম।

একখানি রঙীন্ চার্টের উপর লিখিত আছে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব। এখানি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে গোলোক, বৃন্দাবন, বিরজা, ব্রহ্মাণ্ড জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঙ্কিত আছে ও তাহার বিবরণগুলি লিখিত আছে। এ চিত্রটি ভক্তগণের বিশেষ উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাটের মানচিত্র। এই নক্সাখানিতে কোন্ রেল ষ্টেশন হইতে কত দূরে শ্রীপাট তাহার নির্ণয়, দ্বাদশটী পতাকা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। এখানি দ্বারা ভক্ত যাত্রীগণের তীর্থভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাট সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নক্সাও দেখিলাম।

শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতির কয়েকখানি মানচিত্র দেখিলাম। অধিকন্তু শ্রীধাম নবদ্বীপে ৪।৫ শত বৎসরের মধ্যে গঙ্গাদেবীর কিরূপ ভাবে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারও আলাহিদা মানচিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঐ সকল মানচিত্র পুর্ত্তগীজগণের অধিকারকালে অঙ্কিত।

ইহা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয়, শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায় প্রণালী, ভক্তিকল্পবল্লরীবীজ, সাতকুলিয়া, হিন্দিতে ব্রজ ৮৪ ক্রোশের নক্সা, মাধ্বসম্প্রদায়ের ধাম সত্র, বৈষ্ণব ব্রতোৎসব-নির্ণয় প্রভৃতি বহু চিত্র দর্শন করিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠের একখানি বহু প্রাচীন হস্তলিখিত নক্সা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল, ইহাতে শ্রীযমুনার চিত্র আছে ও তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলার স্থানগুলি নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। এ চিত্রখানিকে

ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে ২।১ ঘণ্টা সময় মধ্যে সঙ্কুলন হয় না। শুনিলাম এখানি রায়গড় রাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভোগমালার স্থান নির্দ্দেশ সূচক নক্‌সাখানি বৈষ্ণব ভক্তের বিশেষ ভাবেই প্রণিধানের সামগ্রী। ইহাতে ৬৪ মহান্ত, ৩২ উপমহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, দ্বাদশ উপগোপাল, ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ, পিতৃবর্গ, মাতৃবর্গ, গুরুবর্গ প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তের মালসাভোগ প্রদানকালে স্থান নির্দ্দেশ করা আছে। রেমুণা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির হইতে ইহা প্রচারিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ মধ্যে যেখানে যেখানে বৈষ্ণব মেলা হয়, সেই সেই জেলার নাম, থানার নাম, গ্রামের নাম, উৎসবের নাম, কয়দিন মেলা থাকে এবং লোকসংখ্যা কত হয় তাহারও একটী তালিকা দেখিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালে অর্থাৎ ইংরাজি ১৪৮৬ সাল হইতে ১৫৩৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের অধিকন্তু ইংলণ্ডেরও রাজসিংহাসনে যে যে রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহারও একটী তালিকা দেখিলাম।

প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শিত হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বহু অন্বেষণেও ঐ বিভাগটী দেখিতে পাইলাম না ঐ সকল রাজন্যবর্গের তালিকার নিকটে তাঁহাদের মুদ্রাগুলি রক্ষিত হইলে বড়ই সুন্দর হইত।

একস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জন্ম কোষ্ঠী দেখিলাম। ইহাতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃত শ্লোকাবলি রহিয়াছে। উহার দ্বারা বুঝিলাম মহাপ্রভুর জন্ম ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (ইংরাজি ১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, হিজরী ৮৯০।২ সফর—বঙ্গাব্দ ৮৯২, সম্বৎ ১৫৪২)। প্রভুর জন্মের তারিখ ও বার লইয়া অনেকগুলি মতভেদ

আছে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত প্রমাণে আমাদের সে সন্দেহের নিরসন হইয়া গেল।

বৈষ্ণব সংহিতার একটী অপূর্ব্ব তালিকা দেখিয়া মোহিত হইলাম ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। তালিকা মধ্যে দুই শতের অধিক বৈষ্ণব সংহিতার নাম এবং ঐ সকল সংহিতার উল্লেখ শাস্ত্রগ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকে আছে তাহার বিস্তারিত নির্ঘণ্ট রহিয়াছে। বৈষ্ণবগণের ইহা একটী মহামূল্য সম্পত্তি। এগুলি যিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি বিশেষভাবেই ধন্যবাদের পাত্র।

"গৌরাঙ্গ ভারতভূমি" নামে একখানি ইংরাজি চার্ট দেখিলাম—তাহাতে মহাপ্রভুর ভ্রমণের সন তারিখ প্রভৃতি দেওয়া বিস্তারিত বিবরণ আছে।

আর একটী দ্রব্য দেখিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ অনুভব হইল। একখানি পিজ্‌বোর্ডের উপরিভাগে পৃথিবীর (গ্লোবের) উপরিভাগে ঊর্দ্ধহস্তে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু দণ্ডায়মান এবং নিম্নে চিত্রের চরণতলে তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী লিখিত আছে :—

পৃথিবীর মধ্যে যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার (?) হইবে মোর নাম॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই পয়ার দুইটীর বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, তেলিগু, পারসি, উর্দ্দু, আরবী, বর্ম্মিজ, ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ, ঐ ঐ ভাষার অক্ষরে লিখিত আছে। ইহা দেখিয়া বোধ হইল পৃথিবীর যে কোন জাতি এইখানি দর্শন করিলে আপন আপন ভাষায় প্রভুর বাণী বুঝিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু এখনও ইহাতে আরও অনেকগুলি ভাষা যুক্ত হইতে বাকি আছে। শুনিলাম সম্মিলনীর সম্পাদক বহু

ভাষাবিদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই চিত্রখানির পূর্ণতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৫ম বৈষ্ণব বংশাবলী।

এই বিভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের পিতৃব্যবংশের দুইটী ধারার বংশলতা, প্রভুর মাতুল বংশলতা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার ভ্রাতৃবংশলতা ইহা ভিন্ন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভু প্রভৃতি অনেকগুলি বংশলতা দেখিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশলতা দেখিতে পাইলাম না। সম্মিলনীর কর্ণধার বা প্রাণ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়কে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশলতা রক্ষার জন্য আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

৬ষ্ঠ বৈষ্ণব সভাসমিতি।

এই বিভাগে বাংলার ও বাংলার বাহিরে যে সকল হরিসভা, ভাগবত সভা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কতকগুলি মুদ্রিত পত্র সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম।

৭ম চিত্রবিভাগ।

গৃহভিত্তির একধারে গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গঙ্গাতীরে তপস্যা হইতে শচীমাতার স্বপ্ন, মহাপ্রভুর জন্ম, বাল্যলীলা, বিদ্যালীলা, দিগ্বীজয়ী জয়, সঙ্কীর্ত্তনলীলা, সন্ন্যাস প্রভৃতি সমুদয় গৌরলীলার চিত্রগুলি দেখিতে পাইলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাত সম্প্রদায় লইয়া পুরীধামে রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতেছেন এ চিত্রখানি বৃহৎ ও মনোরম। চিত্রখানি দীর্ঘে প্রায় ৮।৯ হাত হইবে। কতকগুলি প্রাচীনকালের অঙ্কিত চিত্রও নয়নগোচর হইল। রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে বৈষ্ণব বেশে জগাই মাধাই দাঁড়াইয়া আছেন। এখানি

বহু প্রাচীন চিত্র। একটী বালকের অঙ্কিত শ্রীনিতাই গৌর চিত্র (অয়েল পেণ্টিং) দেখিলাম। এই বালক যে ভবিষ্যতে একজন উত্তম চিত্রকর হইবে তাহা নমুনাতেই বুঝিতে পারিলাম। মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক প্রভৃতির গৃহ হইতে আনীত অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিলাম।

সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয়ের প্রদত্ত চন্দন কাষ্ঠের উপর হস্তিদন্তের কারুকার্য্য বিশিষ্ট ফ্রেমে ২ খানি চিত্র রক্ষিত ছিল।

গৃহভিত্তির অন্যধারে ভক্তকুঞ্জ অর্থাৎ বহু গৌরভক্তের চিত্র দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলাম। এতাবৎ যাঁহাদের নাম শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলাম অথচ দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় নাই, এমত বহু ভক্ত গ্রন্থকার, পত্রিকা সম্পাদক প্রভৃতির চিত্র দর্শনের সৌভাগ্য হইল। চিত্র সংখ্যাও বিস্তর ছিল।

শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, পুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থের বিস্তর চিত্র দেখিয়াছি, ইহাভিন্ন বৈষ্ণব শ্রীপাট ও শ্রীবিগ্রহের চিত্রগুলি দর্শনে আমাদের সমধিক আনন্দ হইয়াছিল। কয়েকটী শ্রীপাটের নাম মনে আছে—

জগাই মাধায়ের সমাধী মন্দির। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জন্মভিটা। শ্রীচৈতন্য ডোবা। লোচন দাসের সমাধী। হরিদাস ঠাকুরের সমাধী। হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থান সিদ্ধ বকুল। কানাই ঠাকুরের সমাধী। পানিহাটীর রাঘব ভবন। শ্রীবট বৃক্ষরাজ। শ্রীশ্রী৺মদনমোহন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত পুস্করিণী। খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যাম সুন্দর। সাইবোনার শ্রীশ্রীনন্দ কুমার। অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথ। শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর দেবালয়। ঐ শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। শিবানন্দ সেনের

শ্রীমন্দির। বেনাপোলের স্মৃতিমঞ্চ। মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির। বল্লভপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ মন্দির। জয়দেবের মেলা। বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির। কুলিয়ার শ্রীশ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ। পানিহাটীর শ্রীশ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ। কেলি সহরের বিষ্ণুমন্দির। উনকোটার বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি বিস্তর বৈষ্ণব শ্রীপাট ও বিগ্রহের চিত্র দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম।

ইহা ভিন্ন শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতিকৃতি, তুলসীদাসের প্রতিকৃতি বল্লভাচার্য্যের প্রতিকৃতি, প্রভৃতি প্রাচীন কালের অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়াও আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শুকদেব গোস্বামী ও রাজা পরীক্ষিতের চিত্রখানি বহুপ্রাচীন বলিয়া মনে হইল।

চিত্র বিভাগটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল।—কিন্তু ইহার সহিত ভারতের বা ভারতের বাহিরের সমুদয় বিষ্ণু মন্দিরের চিত্র ও বিবরণ যুক্ত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রেরিত দ্রব্য

ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন চিত্রগুলি, মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি বহু দ্রব্য দেখিয়াছিলাম।

শুনিলাম সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় এই অনুষ্ঠানের প্রথম কল্পনা করেন, তৎপরে সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুই মাস ব্যাপি চেষ্টায় ইহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রদর্শনীর পরে ১৫ই আষাঢ় তারিখের "অবতার" পত্রিকায় প্রদর্শনীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে দেখিলাম—শেষে লিখিত আছেঃ—

"এই সংগ্রহ কার্য্যে যিনি অগ্রণী, তাঁহার নাম উল্লেখ না করিলে

প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে ভাবিয়া আমরা সাধারণে তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া দিলাম। তিনি আমাদের পরিচিত সুহৃদ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহোদয়। বিনয়ের অবতার ভট্ট মহাশয়ের নিকট যখন যে ব্যক্তি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখনই যথাজ্ঞানে তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ অক্লান্ত কর্ম্মী না থাকিলে বাংলাদেশের কোন শুভানুষ্ঠান চলিতে পারে না। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় রাখুন, আর তিনি এইরূপ প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব ও বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হউন।"

আমরাও রায়ভট্ট মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় বি, এ

যাদবপ্রকাশের পশার নষ্ট

যাদবপ্রকাশ যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমন অনেক গুণগ্রামেরও অধিকারী ছিলেন। চোল রাজ কুমারীকে একবার এক ব্রহ্ম রাক্ষসে আশ্রয় করিয়াছিল। হিন্দু সমাজেব মধ্যে প্রায় সকল দেশেই ভূতে ধরার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ভূত কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকদিগের উপরেই আশ্রয় করে। পুরুষের উপর বড় লক্ষ্য করে না, তবে পুরুষেরা অনেক সময় ভয় পায়। কোন কোন স্থলে এমন ভয় পায় যে, জ্বর পর্য্যন্ত হয়;—মারাও যায়। ভাগবতের মধ্যেও ভূতে ধরার কথা আছে। খৃষ্টীয় ইংরেজ ফরাশীগণের মধ্যেও ভূতে ধরার কথা আছে। ভূত একেবারে অবিশ্বাসও করা যায় না। তবে পূর্ব্বকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ভূতে ধরার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তার একটা কারণ, এখনকার স্ত্রীলোকেরা সে কালের স্ত্রীলোক

অপেক্ষা অনেকটা শিক্ষিতা,—নানা খবর জানিতে পারে। না জানিয়া, না দেখিয়া চলিত গল্পে বড় একটা বিশ্বাস করে না। এমন কি দেব দেবীই, বিশ্বাস করে না। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যারা স্বামীরই খায়, স্বামীরই পরে অথচ স্বামীসেবাকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে না। অনেকে পরকালকেও বিশ্বাস করে না। অনেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস করে না। সুতরাং ভূত বিশ্বাস করিবে না তাহা আর বিচিত্র কি। ভূতও অবিশ্বাসীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। অবিশ্বাসীকে আশ্রয় করা দূরে থাকুক, তার বাড়ীর সীমান্তেও যায় না। তার সাক্ষী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা কখনও কোন ভূত বিশ্বাস করে না ভূতও কখনও কোন মুসলমান স্ত্রীলোককে ধরিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। যে যা বিশ্বাস করে সে তাই দেখে। সে কালে লোক ভূত ব্রহ্মরাক্ষসাদি বিশ্বাস করিত। তারাও লোকদিগের নিকট আসা যাওয়া করিত। যাহা হউক চোল রাজকুমারীকে যখন এক ভূতে ধরিয়াছিল। যাদবপ্রকাশ তখন দিগ্বিজয়ী ওঝা। অনেক ধানড়ী ভূতড়ী রাজবাড়ী আসিল। রাজকুমারীর উপরে অনেক মন্ত্রাদি কথিত হইল। অনেক প্রক্রিয়ার ক্রয় বিক্রয় হইল। কিন্তু ভূত আর ছাড়িল না। রাজ প্রাসাদে অবসাদের আর অবধি রহিল না। ঘাটে, মাঠে, পথে, প্রান্তরে সর্ব্বত্রই কেবল বিস্ময়ের প্রকাশ, চমৎকারের আলোচনা। আর কেবল, "তবে কি হবে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস।

তখন দিগ্বিজয়ী যাদবপ্রকাশের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। শিবিকা সহ ধূমধাম করিয়া সহস্র অনুচর প্রেরিত হইল। যাদবপ্রকাশও বড় বড় পুঁথি হইতে বড়বড় মন্ত্র বাছিয়া নিয়া উড়ানির কোনে গ্রন্থি বান্ধিয়া রাজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বিশ্বাসী শিষ্যগণও সঙ্গে চলিলেন। ক্রমে যাদবপ্রকাশ রাজ প্রাসাদে আসিয়া পৌছিলেন।

রাজকুমারীকে যাদবপ্রকাশের সম্মুখে আনা হইল। ব্রহ্মরাক্ষস কহিল

"তুই আর কটা মন্ত্র জানিস্। আমি তোর চেয়ে অনেক মন্ত্র বেশী জানি। তুই আর আমাকে তাড়াবি কি দিয়ে? তবে আমি রাজ কুমারীকে ছাড়িতে পারি, যদি তোর শিষ্য রামানুজ এখানে আসেন, এবং কৃপা করিয়া তাঁর চরণ দু'খানি আমার মাথায় ধরেন।" যাদবপ্রকাশ সে কথায় কাণ না দিয়া বহুক্ষণ বহু মন্ত্র পাঠ করিলেন। বহু শান্তিজল সিঞ্চন করিলেন, দগ্ধ হলুদের গন্ধ রাজকুমারীর নাকে দিলেন। মন্ত্র পড়িয়া কলার মোচা খেজুরের কাঁটায় এ পাশ ও পাশ বিদ্ধ করিলেন। যত জানেন সব করিলেন, কিন্তু ভূত আর পালাইল না।

তখন রামানুজের জন্য শিবিকা প্রেরিত হইল। তিনি আসিলেন, আসিয়া যাদবপ্রকাশকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অগণ্য দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে রাজকুমারীকে রামানুজের সম্মুখে আনা হইল। ব্রহ্মরাক্ষস হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "হে পবিত্র হৃদয়, পরম ভাগবত মহাপুরুষ! আমি যদি আপনার চরণ দু'খানি মাথায় ধরিতে পারি, তাহা হইলে এই রাজকুমারীকে ত্যাগ করিতে পারি।" রামানুজ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মরাক্ষস রাজকুমারীর দেহে ছিল, সে রামানুজের পদদ্বয়ের মধ্যে রাজকুমারীর মাথা রাখিয়া চরণধূলি লাভ করিল এবং রাজকুমারীকে ত্যাগ করিল। রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে যাওয়ার সময় পথপার্শ্বস্থ একটা উচ্চ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া,—তাহার যাওয়ার নিদর্শন রাখিয়া গেল।

রামানুজের মহত্ত্বের মহিমা জনসাধারণে প্রচারিত হইল। যাদবপ্রকাশ মেঘাচ্ছন্ন নক্ষত্রের মত ম্রিয়মান হইয়া বিষণ্ণ মুখে গৃহে গমন করিলেন। রামানুজের কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীয়মান হইল। লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহার সুনাম সুখ্যাতির অবধি রহিল না। যাদবপ্রকাশের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, ঈর্ষার অনল ধূমায়মান হইল। আবার রামানুজের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র চলিল।

শ্রীভুলুয়া বাবা

ভক্তির বাঁধনে ভক্তি-প্রার্থনা

মা যশোদার ঘরে দিনে দুপুরে চুরি ডাকাতি করিয়া কে হে তুমি এখন ভয়ে ভয়ে পালাইতেছ? "ভাবিতে উচিতছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" এখন যে ছুটিতে ছুটিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িলে, কিন্তু তবু বাঁচিবার উপায় কি? পলাইতে পথ নাই—মাতা আছে পিছে। ঐযে অবোধ গোয়ালিনী এলো খেলো বেশে তোমার পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কি বলিতেছে শুনিতেছ ত? "হারে লালা, আমি আজ যদি তোকে ধরিয়া না বাঁধিয়া রাখি, তবে আমি গোয়ালার মেয়েই নহি।"

দাঁড়াও মা দাঁড়াও, তুমি ধরিও—বাঁধিও, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, তোমার ননীচোরাকে একটু দেখিয়া লই।

কিন্তু দেখিব কি,—কানের কুণ্ডলে যে বড়ই গোল বাঁধাইয়া দিল। এ উজ্জ্বল কুণ্ডল ত এ লোকের নয়,—এ দেখিতেছি গোলোকের। হে কুণ্ডলধারী গোলোকেশ্বর! সূর্য্য কি কখন মেঘে ঢাকা পড়ে? তুমি গোপবালকরূপে গোকুলে চোরের মত লুকাইয়া থাকিলেই কি সত্যদর্শী ঋষিগণের দিব্য চক্ষু এড়াইতে পার? তাঁহারা যে সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—নরশিশু রূপে প্রতিভাত হইলেও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তুমি সর্ব্বেশ্বর, দাঁড়াও তবে হে মহামায়াবী, তোমাকে নমস্কার করি।

"নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা॥

কই পলাইয়া তো গোয়ালিনীর হাত এড়াইতে পারিলে না?—কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি বড় বড় মহাত্মাগণের নিকট হইতে তুমি দূরে থাকিতে পার, কিন্তু ইহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে কি তোমার চলে? ভক্তির যে দুগ্ধ সর নবনীর উপর তোমার ঐ কুসুম সুকুমার শরীর খানি নির্ভর করে, এই গোপী যে তাহারই মালিক। তুমি ঈশ্বরই হও, আর পরমেশ্বরই হও, হে নন্দলাল, হে যশোদাদুলাল,– গোপীর অধীনে না থাকিয়া উপায় নাই। কিন্তু যাদু এত কাঁদিতেছ কেন? তোমার রোদন দেখিয়া—পাষাণ হৃদয় আমিও যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। শুনিয়া থাকি ভয় তোমাকে ভয় করিয়া থাকে, কালের কাল সেই তুমি চৌর্য্যাপরাধ ভয়ে থরহরি কম্পমান! ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে যে রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িলে, বলি এত ব্যাকুলতা কেন? জননী তোমাকে ফাঁসীও দিবেনা, শূলেও তুলিবে না; বড়জোর না হয় দড়ি দিয়া ঘরের মধ্যেই বাঁধিয়া রাখিবে।

কিন্তু হরি হরি, একি হইল,—তোমার উদর বাঁধিতে যে দুই আঙ্গুল রজ্জু কম পড়িল! তোমার উদরে কি আছে তুমিই জান,—এদিকে ত ঘরের পরের সমুদয় রজ্জু গেল, কিন্তু ঠিক ঐ দুই অঙ্গুলি কম! তোমার সীমাবদ্ধ উদর আজ কি অসীম হইয়া দাঁড়াইল! জননী যে লজ্জায় অবনত শিরে দাঁড়াইয়া!" তোমাকে বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার মাথার ঘাম যে পায়ে পড়িতেছে—কিন্তু হায় হায়, ঐ দুই অঙ্গুলি কম! গুপ্ত ঐশ্বর্য্য যে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ব্যক্ত হইলেই কি তাহা মাধুর্য্যের দেশে দাঁড়াইতে পারে? যাঁহার স্তন্যবলে তোমার যত কিছু ঠাকুরালী, বাৎসল্যরসের প্রকটমূর্ত্তি সেই জননী যে কাতর এবং মলিন হইয়া পড়িয়াছে, হে রসিক, আর কি রসভঙ্গ করিতে পার? তোমার ঐশ্বর্য্য তাড়াতাড়ি লুকাইয়া পড়িল, দুই অঙ্গুলি রজ্জু পূরণ হইল, তুমি গোপাল বড়

সুবোধ বালকের মত ঘাড় হেট করিয়া ভক্তির রজ্জুতে আবদ্ধ হইলে।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্ক নেত্রম্।
মুহুঃশ্বাস কম্প-ত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠ
স্থিত-গ্রৈব দামোদরং ভক্তি বদ্ধম্॥

হে লীলাময়, গোকুলের গোয়াল পাড়ায়—গোপ গোপীর মধ্যে এইরূপ লুকোচুরি খেলা করিয়া কতনা কীর্ত্তিই বিস্তার করিলে। হে হরি তুমি চুরি করিলেও আনন্দ, ধরা দিলেও আনন্দ, আনন্দময়—তুমি যাহাকর তাহাতেই আনন্দ। তোমার কার্য্যকলাপে ব্রজভূমি—আর নীরস ভূমি থাকিল না,—সাক্ষাৎ আনন্দের কুণ্ড হইয়া পড়িল,—তাহাতে তোমার নিজজন গোপ গোপীগণ—তোমাকে লইয়া প্রীতিরসে হাবুডুবু খাইতে লাগিল! এই আনন্দ কুণ্ড হইতে অবাক করিলে কিন্তু সেই সব মহাশয় গণকে, যাঁহারা তোমার ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া তোমাকে নিজ হইতে অনেক বড় মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে ভক্তি করে। তুমি গোপীর দামে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গুলীর দ্বারা তাঁহাদিগকে যেন দেখাইয়া দেখাইয়া ঘোষণা করিলে—

"আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

হে প্রেমময় হরি! হে ভক্তাধীন ভগবন্। তোমাকে যশোদার দামে আবদ্ধ দেখিয়া—শির স্বতঃই নত হইয়া পড়িতেছে,—অঞ্জলি মস্তকে বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ শত শতবার তোমার বন্দনা করিতেছি।

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

হে গোকুলচন্দ্র ! তোমার রূপ গুণ লীলা দেখিয়া সব যে আমার ভুল হইয়া গেল, যত দিন তোমার সন্ধান না পাইয়াছিলাম ততদিন মনে করিতাম—মোক্ষই জীবনের লক্ষ্য,—মোক্ষধামে প্রবেশ করিলে আর জন্মমৃত্যু হইবেনা,—চির শান্তিতে অনন্তকাল বাস করিব। কিন্তু এখন তোমাকে দেখিয়া—মোক্ষকে—শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছে,—তাহা দেখিতেছি সর্ব্বনাশেরই কারণ, তাহাতে মুগ্ধ হইলে আর তোমার এই ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের কোনই আশা ভরসা থাকেনা। হে বরেশ, তুমি সব বরই দিতে পার,—আমার প্রথমেই প্রার্থনা এই যে, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোক্ষ বরটা দিওনা।

"আচ্ছা, সাযুজ্য মুক্তিবলেও অন্য চতুর্ব্বিধ মুক্তি স্বীকার করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে।"

না, না, দেব, আমাকে বঞ্চিত করিওনা—তোমাকে এই ব্রজে দেখিয়া, মহৈশ্বর্য্যের বৈকুণ্ঠেও আমার মন উঠিতেছে না,—আমি যে মনের মানুষটী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি,—সে দেখিতেছি এক তুমি, তোমার এই গোপাল মূর্ত্তিই আমার মন জুড়িয়া বসুক।

"বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপাল বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥"

আমার কথাটী আর একটু খুলিয়া বলি। তুমি আমার মন জুড়িয়া বস অর্থে—হে গোপীজনবল্লভ, তুমি তোমার গোপীজনকে লইয়া বস। একা তোমাকে চাহিয়া কি করিব? তুমি ত একা থাক না। যেখানে রাজরাণী এবং তাঁহার সখীগণ থাকে—তুমিও সেই খানেই বাঁধা থাক। তোমার নীলকুণ্ডলাকৃত মুখ কমলের বিম্বাধরকে—বাম দিক হইতে প্রাণেশ্বরী চুম্বন করিবে,—আর প্রধান শ্রেষ্ঠ সখীগণ অন্যদিকে অষ্টদলে দাঁড়াইয়া স্ব স্ব সেবায় রত থাকিবে, ইহাই আমার মনে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক, ইহাই আমার লক্ষ্য—লক্ষ লক্ষ অন্যলাভে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সাধন কালে হে মদন গোপাল, গোপীজনকে লইয়া তুমিই যদি এক আমার মনের বিষয় হও, তবে সিদ্ধদেহে—গোপীজন সম্বলিত তোমাকেই লাভ করিব! অতএব হে মনমোহন,—আমার প্রার্থনারূপ তুমি আমার মন জুড়িয়া বস।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চগোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব বক্ত্রাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥

বামন হইয়া আমি আকাশের চাঁদ ধরিবার প্রবৃত্তি করিতেছি। অনাদিকালের বহির্ম্মুখ জীব আমি এই মৃত্যুসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, দুর্ব্বার রিপুগণের ক্রীতদাস হইয়া তাহাদের লাথিতে লাথিতে কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। সেই মোহান্ধ লক্ষহারা আমি চাহিতেছি ভজন সাধন করিয়া তোমাকে লাভ করিতে! আহা আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমার মত মহাপাপী যে আর কেহই নাই—এ পাপ দেহের দ্বারা কখন তোমার ভজন হইতে পারে না, এই কাম কলুষিত মন তোমার বসিবার যোগ্য আসন কখনই নহে। এক্ষেত্রে হে কৃপাময়! তোমার অহৈতুকীকৃ পাই

আমার একমাত্র সম্বল। আমি নিষ্কাম হারাম অকৃতজ্ঞ দাস হইলেও তুমিত কখনও নির্দ্দয় প্রভু নহ। হে করুণার্ণব! তাই দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,—তোমার এই কালস্রোতে ভাসমান জীবাধম-টীকে কূলে তুলিয়া লও। তুমি আমার সম্মুখে থাকিলে কি হইবে প্রভো, অন্ধ আমি তোমাকে যে দেখিতে পাইতেছি না,—জগতগুরু! তুমি চক্ষুর চক্ষু, তুমি আমাকে চক্ষুদান করিয়া একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও দেখি? হে দামোদর! দামবন্ধন কালেই প্রমাণ হইল, তোমার উদরের তথ্য। তোমার অন্ত নাই, তুমি সত্য সত্যই অনন্ত। হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বয়ংরূপে বিদ্যমান আছ,—সুতরাং তুমি যে কোন কালে, যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির নিকট আবির্ভূত হইতে পার, তবে আমার আশা কি পূর্ণ হইবে দয়াময়?—হে দেব! ভজন সাধন হীন আমার নমস্কারই সম্বল, তাই ভূমিতে নিপতিত হইয়া কেবল নমস্কার পুরঃসরই বলিতেছি—এই অভাজনের প্রতি প্রসন্ন হও।

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখজালাব্ধি মগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীন বতানু-
গৃহানেশ! মামজ্ঞমেধ্যাক্ষি দৃশ্যঃ॥

মহাপাপী আমি ভজন সাধন না করিয়াই তোমাকে দেখিতে চাহিতেছি, কেন শুনিবে? হে অশেষ গুণাকর! তোমার গুণেই ছোটমুখে এই বড়কথা বাহির হইতেছে। হে দামোদর! উদরে জননীর দাম পরিয়া কিনা কীর্ত্তিই করিলে বল দেখি? তোমাকে উদুখলে বাঁধিয়া—জননী গেলেন কার্য্যান্তরে, আর তুমি গেলে তোমার কার্য্যে, উদুখলটী লইয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষের নিকট! আজ ভক্তির বাঁধন অঙ্গীকার করিয়া সত্যসত্যই ভক্ত নারদের কথা সার্থক করিলে। তাঁহার অভিশাপে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত

মনিগ্রীব ও নলকুবেরর কেবল যে সংসার মুক্ত হইলেন তাহা নহে, দাতা শিরোমণি! তোমার নিকট হইতে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ভক্তি ও ভক্তের জয় কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তোমার এই অলোকসামান্য কীর্ত্তি দেখিয়া কে না ছোটমুখে বড় প্রার্থনা করিতে সাহসী হইবে? যে দুই ধন-দুর্ম্মদ কামান্ধ ব্যক্তির কথা বলা হইল,—আমি যে তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়া কামিনী কাঞ্চনে আত্মহারা হইয়া লঘুগুরু জ্ঞান করি না, দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বেড়াই। এইরূপ বিপথগামীর পক্ষে তো বর অপেক্ষা সেই অভিশাপেরই প্রয়োজন, যাহা পরিণামে বর হইয়া দাঁড়ায়! কিন্তু সেরূপ অভিশাপ দিতে এক তোমার নারদের ন্যায় সিদ্ধ ভক্তেরই প্রয়োজন। ভক্তরথীর তুমিই হইতেছ নিত্য সারথী,—তাহাকে যেদিকে চালাও সে সেইদিকেই চলে! হে করুণাময়, তবে চালাইয়া দাও তাহাকে এই কামহত অধঃপতিত জীবাধমের পানে।—অধম আমি দিবারাত্রি কামের জ্বালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—তোমার নাম লইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও একবার বসিবার অবসর পাইতেছি না,—জোর জবরদস্তি করিয়া বসিলেও মন তো বসিতেছে না, বাসনায় চৌদ্দভুবন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় আমার স্থাবর বৃক্ষযোনিই প্রয়োজন। অবশ্য অনেকবার বৃক্ষ যে না হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? তোমার লীলাস্থল ব্রজে বৃক্ষ হওয়া প্রয়োজন। প্রদান করুন তবে তোমার কোন সিদ্ধভক্ত শীঘ্রই সেই অব্যর্থ অভিশাপ যাহার প্রভাবে—নন্দালয়ের নিকট অর্জ্জুন বৃক্ষের মত একটা কিছু হইয়া—শিকড় গাড়িয়া বসি। থাকনা আমার বহু জন্মের বহু সঞ্চিত কর্ম্মফলসমূহ, ভক্তের অব্যভিচারী বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। সহস্র সহস্র বৎসরে কি আসে যায়,—একদিন না একদিন তুমি অবশ্যই—ভক্তের ডোরে আবদ্ধ হইয়া

আমাকে স্বহস্তে মুক্ত করিয়া দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তি দান না করিয়া থাকিতে পারিবে না। যদি তুমি বল "তোমাকে আর বৃক্ষযোনি লাভ করিতে হইবে না,—এখনি দর্শন দিতেছি।"

কিন্তু আমি কেবল তোমার দর্শন চাই না,—স্থায়ীভাবে তোমার প্রেমভক্তি চাই। তুমি সর্ব্বশক্তিমান, এখনই আমাকে দেখা দিতে পার, কিন্তু দেখা দিয়া ত এই অভিমানী—ভক্তিহীনের নিকট থাকিবে না,—চপল শিরোমণি তুমি বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া আবার লুকাইয়া পড়িবে। যে রজ্জুর দ্বারা তোমাকে বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা না পাইলে একবার দেখিয়া আমার বিশেষ কি লাভ হইবে? তোমার বন্ধন রজ্জু দেখিলাম—গোপীগণের নিকটে আমি সেই প্রেমভক্তির রজ্জুরই প্রার্থী। হে বাঞ্ছা-কল্পতরু! দিতে যদি হয়, তবে এই দীনহীনকে তাহাই দিয়া তোমার চিরদিনের দাতা শিরোমণি নামটী সার্থক কর—তোমার এই দান লাভ করিতে যদি আমাকে কোটী কোটী বৎসর বৃক্ষযোনি লাভ করিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও আমার বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু সদ্য প্রাপ্ত মোক্ষও আমার গ্রাহ্য নহে, তাহাতে আগ্রহও নাই—ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা এবং নিবেদন।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

হে দামোদর! তোমার উদরে যে দাম, তাহা সামান্য শণ বা পাটের নহে, উহা তোমার স্বরূপ শক্তির বিলাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি বাঁধিয়া রাখিয়াছ, আর সেই তোমাকে যে দামের দ্বারা আবদ্ধ করা যায়, তাহার প্রভাব এবং বল যে কত, তাহা জড়বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং ঐ দিব্য

জ্যোতির্ম্ময়ধাম্‌ দামকে কেবল নমস্কার করিতেছি। হে কোটিব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার উদরের এককোণে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া আছে, সুতরাং ঐ দামবদ্ধ বিশ্বধাম উদরকেও নমস্কার! হে লীলা পুরুষোত্তম! তুমি তোমার যে পূর্ণশক্তি প্রিয়তমা রাধার অধীন হইয়া—মধুর মধুর লীলা করিতে করিতে—ভক্তাধীন নাম সার্থক করিতেছ, সেই বৃন্দাবনেশ্বরীকে নমস্কার। অনন্তদেব অনন্তকাল তোমার অনাদিমধ্যান্ত লীলা খেলা কেবল বর্ণনা করিয়াই আসিতেছেন, কিন্তু সীমা পাইতেছেন না।—হে কার্ত্তিকের অধিদেব দেবদেব রাধা দামোদর!—ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমি সেই অনন্তলীলার সহিত লীলাময় তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি—হে ইচ্ছাময়! প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় না কর, আমি দন্তে তৃণ ধরিয়া, অঞ্জলি মস্তকে বাঁধিয়া, তোমার ধামের সম্মুখে, তোমার গণের সম্মুখে,—তোমার সম্মুখে,—নমো নমো রবে পতিত রহিলাম।

"নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্‌॥"

শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থে

(৩)

মাদ্রাজে আহার্য্য দ্রব্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। আম্র ও রম্ভা যথেষ্ট মিলে। এখান হইতে লোকে রন্ধন কার্য্যে তিলের তৈল ব্যবহার করে।

আমাদের পক্ষে তাহা অরুচিকর হওয়ায় আমরা ঘৃত সহযোগে ব্যঞ্জনাদি পাক করিতাম। এখানকার ঘৃত সস্তা না হইলেও অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ বোধ হইল। মাদ্রাজের তাপ কলিকাতার অপেক্ষা অধিক। কিন্তু সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী থাকায় সে তাপ ততটা অনুভূত হয় না। যাহা হউক আমরা বাসায় আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর পুনরায় ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। মাদ্রাজে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম হইল। রাত্রি আটটার ট্রেণে আমরা পুনরায় রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতায় যেমন শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশন, মাদ্রাজেও তেমনি দুইটী ষ্টেশন। এইবার আমরা South India Railway কোম্পানীর গাড়ীতে উঠিলাম। ক্রমে আমরা চিঙ্গলপুট জংসন ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। চিঙ্গলপুটে অবতরণ করিলে সুপ্রসিদ্ধ পক্ষীতীর্থ দর্শন করা যায়। এই পক্ষীতীর্থের বিবরণ বহুদিবস পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাতায়াতের কোন সময়েই সে অপূর্ব্বতীর্থ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। অধিকন্তু চিঙ্গলপুট হইতে আর্কোমন্ লাইনে conteeveram কিংবা সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চী নগর দেখিবার সাধ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও দর্শন করা হইল না। এই কাঞ্চী নগরীর সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে কত কথা পড়িয়াছি। শিব কাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চীর জগৎবিখ্যাত মন্দিরাদির বিবরণ কতবার পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এমনি দৈব দুর্ব্বিপাক, কিছুতেই কাঞ্চী দর্শন করিয়া প্রাণের সাধ মিটাইতে পারিলাম না। অগত্যা মনোদুঃখে রামেশ্বর তীর্থাভিমুখেই চলিতে লাগিলাম, ক্রমে বিল্বপুরম্ জংসন ষ্টেশনে উপনীত হইলাম! সেখান হইতে মায়াবরম্ জংসন হইয়া বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ট্রিচনপলী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহযাত্রী রায় সাহেব হরিপদ গোস্বামী সপরিবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি আসানসোল রেলওয়ে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অতএব

তিনি অনায়াসে বিনাব্যয়ে পাশ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ আরামের সহিত গমন করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হইলেও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বিশেষ ভীড় ভোগ করিতে হয় নাই। তবে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছিল। সুবিধার মধ্যে নূতন দেশে নানাপ্রকার স্ত্রী পুরুষের দর্শনলাভ ঘটিত। তাহাদের আকার প্রকার, চাল চলন, হাবভাব, কথাবার্ত্তা শুনিবার বিলক্ষণ অবসরও পাওয়া যাইত। অর্থ ব্যয় করিয়া সুদূর বিদেশে তাহাও নিতান্ত কম লাভ নহে। এদেশের বালক ও যুবকেরা অনেকেই ইংরাজি বুঝে এবং ইংরাজিতে কথা কহিতে পারে। আমি অনেক ব্যবসায়ী যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, তাহারা school final অর্থাৎ Matriculation পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়াছে। আমাদের দেশে অনেক গ্রাজুয়েটেরও এইরূপ ইংরাজি বলিবার শক্তি নাই। মাদ্রাজের নিকট একটি সুবর্ণ-বলয় পরিহিত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি করাচির নিকট জরির (Golden threads) কারবার করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও সহাস্য আনন অনেক দিবস মনে থাকিবে। যাহা হউক ট্রিচনপল্লী ষ্টেশনে গাড়ী কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল। রায় সাহেব বা তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান অমলেন্দু প্রত্যেক প্রধান প্রধান ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের সংবাদ লইতেন। এই ষ্টেশনে আমি স্নান করিয়া লইলাম। তাহার পর জলযোগ। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মর্ত্তমান কলা, সুপক্ক আম্র, পালু বা দুগ্ধ এবং চা ও বর্ফি যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে সকল তৈল পক্ক খাদ্যাদি পাওয়া যায় তাহা আমাদের অখাদ্য বলিলেও হয়। কারণ একে তিলের তৈল, তাহাতে কোন কোন খাদ্য পলাণ্ডু বা লশুনযুক্ত। কোন কোন ষ্টেশনে এমন সুমিষ্ট আনারস পাওয়া গেল যে, আমাদের দেশে চিনি সহযোগেও আনারস সেরূপ সুমিষ্ট হয় না। এই ত্রিচনপল্লিতেই

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গদেবের মন্দির। প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমরা এই মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। এইস্থানে পুণ্যসলিলা কাবেরী নদী প্রবহমানা। আমরা এই নদীতে স্নান করিবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেকথা পরে। বলিতে ভুলিয়াছি, আমরা একস্থানে কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম। এতদঞ্চলে কৃষ্ণানদীরও অস্মদ্দেশীয় গঙ্গার ন্যায় পবিত্রতা ও মহত্ব। এই সব অঞ্চলে তেলেগু ভাষা প্রচলিত। মাদ্রাজ অঞ্চলে তামিল ভাষা প্রচলিত। এই দুই ভাষা সংস্কৃত মূলক নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অবোধ্য। তবে মনুষ্যের প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান, আকার ইঙ্গিত ও ভাব ভঙ্গির প্রতি দৃষ্টি করিলে, অনেকস্থলেই লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ ইংরাজি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এখানেও ভদ্রলোকগণের সহিত কথোপকথন করা অতি সহজ। কোন কোন স্থলে হিন্দি ভাষার সাহায্যেও মনের ভাব জ্ঞাপন করা যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিলপুরম্ হইতে পণ্ডীচারী যাওয়া যায়, এবং শাখা লাইনে কুম্ভকোণম্ এবং তাঞ্জোর প্রভৃতিও দর্শন করার সুবিধা আছে। কুম্ভকোণম্ ও তাঞ্জোরের মন্দিরাদি সর্ব্বথা দর্শনযোগ্য। কিন্তু আমরা সে সকল দর্শন করিতে পাই নাই। ক্রমে আমরা বেলা ১১টার সময় মাদুরায় উপস্থিত হইলাম। মাদুরা দক্ষিণ অঞ্চলের অতি প্রধান সহর, এখানে মাতা মীনাক্ষী দেবীর মন্দির বর্ত্তমান, এই মন্দির আমরা প্রত্যাবর্ত্তন কালে দর্শন করিয়াছিলাম। যথাকালে তাহা বর্ণিত হইবে।

আমরা এতক্ষণ Cylon Boat Mailএ আসতেছিলাম। এই Cylon Boat Mail আমাদের লইয়া রামেশ্বর অভিমুখে ছুটিল। রেলপথে যাইতে যাইতে রাস্তা ঘাট, তরু লতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে

করিতে চলিলাম, দেখিলাম অনেকস্থলে পল্লীগ্রামের দৃশ্য বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের মতই। রেলের উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী এবং কোথাও সুবিস্তৃত কলাবাগান। কদলীবৃক্ষ এদেশে যথেষ্ট, আম্র ও পনস বৃক্ষও কম নহে। কোন কোন স্থানে ক্রমান্বয়ে খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ চলিয়াছে, স্থানে স্থানে বাবলা বৃক্ষও যথেষ্ট, গ্রামবাসিগণের কুটীরাদি আমাদের দেশের মতই। অনেকস্থলে তালপাতা বা খাবরা দিয়া ছাওয়া। রেলের উভয় পার্শ্বে গো, মহিষ ও গর্দ্দভাদি বিচরণ করিতেছে। এদেশের গরুর গাড়ীর চাকা দুইখানি অতি বৃহৎ, এইজন্য গাড়ীতে উঠিতে হইলে পশ্চাদ্দিক দিয়া উঠিতে হয়। বালক বালিকারা প্রায়ই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কাহারও কাহারও মুখশ্রী মন্দ নহে, গোয়ালিনীরা ষ্টেশনে ষ্টেশনে "পালু" "পালু" রবে দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে, এই দুগ্ধ কিন্তু জলবৎ। মূল্য ১ পোয়া আন্দাজ এক আনা, ডাব যথেষ্ট থাকিলেও একটীর দাম এক আনা। যাহা হউক নূতন দেশের নূতন দৃশ্য সমূহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমরা ৺রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। রামেশ্বর তীর্থ প্রকৃতপক্ষে একটী দ্বীপ, ইহা পাম্বান্ দ্বীপের অন্তর্গত, এই দ্বীপে আগমন করিতে সমুদ্রের যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে তাহার উপর দিয়া রেল কোম্পানীর সেতু হইয়াছে। এই সেতু অতিক্রম করিয়া আমরা প্রায় বেলা ৪টার সময় রামেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলাম।

সে দিবস বৃহস্পতিবার। সোমবারে প্রাতে বাটী হইতে রওনা হইয়া বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ৺রামেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বে মাদুরা পর্য্যন্ত রেল গিয়া অবশিষ্ট অংশ গোযান ও নৌকা যোগে আসিতে হইত, তাহাতে ৫।৭ দিবস অতিবাহিত হইত। পথে দস্যু ভয়ও ছিল, রেল কোম্পানীর কল্যাণে এক্ষণে হাওড়ায় উঠিয়াই একদমে রামেশ্বর। মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র মাদ্রাজে বিশ্রাম, এই বিশ্রামও আমাদের ইচ্ছা করিয়া

করিতে হয় নাই, একপ্রকার বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছিল। কারণ রেল কোম্পানীর Trining এইরূপ, অন্ততঃ Madras Mailএ আসলে এইরূপ বিশ্রাম অনিবার্য্য।

যাহা হউক আমাদের চিরবাঞ্ছিত রামেশ্বর তীর্থে উপনীত হইয়া আমরা ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী "মহাবীর ধর্ম্মশালা"য় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্ম-শালাটী নবনির্ম্মিত ও অতিসুপরিস্কৃত। শয়নঘর ও রন্ধনশালার বেশ বন্দোবস্ত আছে। অসুবিধার মধ্যে বাটীতে জলের কল নাই। রাজ পথস্থিত নিকটবর্ত্তী Hydrant বা জলের কল হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। পায়খানা আছে। কিন্তু—তাহা সর্ব্বসময়ে পরিস্কৃত থাকে না। বালির উপর একটু অন্তরালে অনেক সময় শৌচক্রিয়া সমাধা করিতে হয়। ধর্ম্মশালার দ্বিতলের ছাদ হইতে মনে হইল সমুদ্র দর্শন হইতেছে, কিন্তু সেটী ভ্রম। যে জলাশয় দৃষ্ট হয়, তাহা সুবিস্তৃত হইলেও, সমুদ্র নহে, সমুদ্রের তরঙ্গ বিহীন অগভীর অংশ বিশেষ মাত্র।

বলা বাহুল্য মাদুরার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান সমূহ হইতেই রামেশ্বরের পাণ্ডার একজন ছড়িদার আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। সে ব্যক্তি ষ্টেশনে ষ্টেশনে দেখিতেছিল আমাদের পানীয় জল কিম্বা খাদ্যাদির প্রয়োজন আছে কি না। একস্থানে আমরা কোন সুখাদ্য পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল—"আমি দধিমিশ্রিত এক প্রকার অতি সুখাদ্য আনয়ন করিতেছি"। এই বলিয়া এক আনা মূল্যের কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। আমি যেমন বলিলাম "ইহাতে পেঁয়াজ থাকিলে খাইব না"। অমনি সে সেই খাদ্য গাড়ীর দ্বার দিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। আমার ভায়া কহিল,—"ফেলা হইল কেন? আমি উহা খাইতাম"। তখন লোকটী অপ্রস্তুত হইয়া আমাদের নিকট পয়সা লইতে চাহিল না। আমরা কহিলাম, এজন্য আপনি কেন দণ্ড দিবেন? পয়সা আপনাকে লইতেই

হইবে। এইরূপ বলাতে তিনি এক আনা গ্রহণ করিলেন। লোকটী হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী। এজন্য হিন্দি বুঝে। এই কর্ম্মচারীর অধিস্বামীর নাম গঙ্গাধর পীতাম্বর পাণ্ডা। ইনি এস্থানে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি। আমরা শৌচাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি আহার করিয়া লইলাম। আহারান্তে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় রামেশ্বর দেবের দর্শনার্থ বাসা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। রাত্রিতে পথিমধ্যে যে সমস্ত দোকান দেখিতে পাইলাম তাহারা আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের দোকানের ন্যায়ই বোধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ দোকানের সম্মুখে খাটিয়া পাতিয়া গল্প করিতেছে বা শয়ন করিয়া আছে। দোকানীরা চাউল, দাল, লবণাদি বিক্রয় করিতেছে। গোল আলু, এক প্রকার ছোট আকারের বেগুন, উচ্চে, শাক প্রভৃতি আমাদের দেশের তরকারি এখানেও রহিয়াছে। কলার পাতা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। কেবল 'পটল' দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ষপ তৈল এখানে মিলে না। তবে যে নারিকেল তৈল পাওয়া যায় তাহা উৎকৃষ্ট। শুনিলাম কোন কোন স্থানে টাট্‌কা নারিকেল তৈলে লুচি ভাজা হয়। তাহা অতি উপাদেয় খাদ্য। আমরা কিন্তু তরকারি ঘৃত সংযোগেই প্রস্তুত করিতাম। অধিকন্তু মাদ্রাজ হইতে আমরা যখনই অন্ন ব্যবহার করিয়াছি, অতি অল্প ব্যবহার করিয়াছি। এই আতপান্ন অতি উত্তম। ক্ষুধা থাকিলে অল্প মাত্র ব্যঞ্জন সংযোগেই বেশ ভোজন করা যায়। শ্রীমন্দিরের নিকটে নানাবিধ পুষ্পমাল্য, পিতলের বাসন এবং ডাব নারিকেল আম্র কদলী প্রভৃতি ফল বিক্রয় হইতেছে। আমরা ৺বাবার জন্য কিছু কর্পূর ও ফুলের মালা ক্রয় করিলাম। বৃহস্পতিবার বলিয়া সে দিবস রামেশ্বর দেবের ভোগমূর্ত্তির কি একটা উৎসব হইতেছিল। সুমধুর সানাইয়ের বাদ্য সহযোগে সুসজ্জিত হাওদায় আরোহণ করাইয়া ভোগমূর্ত্তিকে মন্দির

প্রদক্ষিণ করান হইতেছিল। আমরা সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সুবৃহৎ তোরণ বা গোপুরে উপনীত হইলাম। এদেশে প্রত্যেক দেব-মন্দিরের গোপুরম্ বা প্রবেশ দ্বারই একটী বিরাট ব্যপার। অবাক্ হইয়া এই গোপুরম্ দর্শন করিতে হয়। উচ্চে তাহা ৬।৭ তলা এবং অদ্ভুত কারুকার্য্য সমন্বিত। বর্ণনা করিয়া এ দেশীয় মন্দিরের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার উপায় নাই। স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা প্রকৃতরূপে ধারণা করা অসম্ভব। গোপুরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম কি স্বর্গপুরে প্রবেশ করিলাম বুঝিতে পারিলাম না। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখি স্থাপত্যবিদ্যা ও শিল্পচাতুর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন। কত কি যে দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার যো নাই। একদিকে ভগবানের স্বহস্ত রচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য উত্তালতরঙ্গমালা সমন্বিত অসীম নীলাম্বুরাশি, অপর দিকে মনুষ্য রচিত অত্যদ্ভুত দেবমন্দির। মন্দিরের নানাস্থান দর্শন করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট রাজ্যে উপনীত হইয়াছি। এ রাজ্য পৃথিবী হইতে বহু অন্তরে, পৃথিবীর সহিত যেন এ রাজ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের সংসারের কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং বিষয় বুদ্ধি দূর হইয়াছে তাহারা এই খানে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করুক। এখানে সংসারের কোলাহল নাই, আছে সেই কর্ণরসায়ণ সুমধুর সানাইয়ের স্বর। এইরূপে মন্দির মধ্যে বহু পথ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় ১ ঘণ্টা পরে আমরা রামেশ্বর দেবের মূল মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। দ্বারদেশে শিষ্ট শান্ত ব্রাহ্মণ পূজারীগণ উপবিষ্ট। মন্দির মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, রামেশ্বরদেব না না বেশভূষায় সুসজ্জিত। তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি তখন স্বর্ণময় ডেকের দ্বারা আচ্ছাদিত। যাহা হউক আমরা ভক্তিভরে রামেশ্বর দেবকে প্রণাম করিলাম এবং মনে মনে হর-গুণগান করিতে লাগিলাম। এই সকল স্থান

শ্রীশ্রীসীতারামের ত্রিলোক বাঞ্ছিত শ্রীচরণ দিয়ে চিহ্নিত এবং কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্যময় স্মৃতি বিজড়িত তাই এই স্থানে অবলুণ্ঠিত হইয়া এবং এই স্থানের রেণু মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া আমি যেন শত শত জন্মের অন্তর্জ্জালা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলাম। প্রাণে কে যেন এক প্রকার শান্তির ধারা ঢালিয়া দিল।

সংসারে থাকিয়া মানুষ যে এমন দিব্য আনন্দ সম্ভোগের অধিকারী হয় তাহা জানিতাম না। না জানি পিতৃগণের কোন্ পুণ্যে আমি আজ সেই আনন্দ লাভ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল ভাবে দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া দেবদর্শন করিতেছি এবং শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেবকে চিন্তা করিতেছি এমন সময় রামেশ্বর দেবের ভোগারত্রিক আরম্ভ হইল। অমনি দণ্ডায়মান হইলাম। সহসা দেখি নিকটে একটী কান্তিমান গৌরবর্ণ যুবা দণ্ডায়মান। বয়স অনুমান ৩০ বৎসর, তাহার দেহ সুদীর্ঘ। তাঁহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র লম্বমান। তিনি শীর্ণকায়, যেন সত্য সত্যই মহাপ্রভু আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। আমি লোভ সম্বরণ না করিতে পারিয়া মহাত্মাকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?"।

তিনি কহিলেন,—আমার বাটী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গণ্টূর নামক স্থানে। ক্রমশঃ বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন উকীল। তাঁহার নামও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে নোটবুক সঙ্গে না থাকায় তাঁহার নামটী লিখিয়া লইতে পারি নাই। তিনি কহিলেন—"আমি আপনাকে দেখিয়াই বাঙ্গালী বলিয়া ঠিক করিয়াছি। আপনার cut of the face অর্থাৎ মুখের গঠন ঠিক বাঙ্গালীর মত।" তাহার পর তিনি আমাকে বঙ্গদেশীয় মন্দির ও South Indian Temples অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের মন্দির সমূহের মধ্যে পার্থক্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম "এখানকার style

of architective অর্থাৎ গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গদেশে এরূপ মন্দির একটীও নাই।" তাহার পর সেই রাত্রিতে তিনি আমার সঙ্গ অনেকক্ষণ ত্যাগ করিলেন না। আমাকে সঙ্গে লইয়া হরপার্ব্বতীর যুগলমিলন দেখাইলেন। অর্থাৎ রামেশ্বরদেবের পূর্ব্ব কথিত ভোগমূর্ত্তি সমারোহের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ৺রামেশ্বরী দেবীর যে এক ভোগমূর্ত্তি আছেন সেই দেবীর অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। ইহারই নাম হরপার্ব্বতীর মিলন, ইহা দ্রষ্টব্য বটে। মিলনের সময় আরত্রিক ও নানাপ্রকার ভেট হইয়া থাকে। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। ৺রামেশ্বরী দেবীর মূল মূর্ত্তিকে সন্দর্শন করিয়া আমরা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রামেশ্বরদেবের মন্দিরের এক একটী Long Colonnade কিম্বা সঙ্কীর্ণ পথ প্রায় একপোয়া ব্যাপী। সমস্ত মন্দির একসঙ্গে প্রদক্ষিণ করা কোন দুর্ব্বল লোকের সাধ্য নহে। মূল মন্দিরের সম্মুখভাগে Golden flag staff অর্থাৎ সোণার তালগাছ, একটী সুবৃহৎ বৃষভ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গরুড়স্তম্ভের ন্যায় একটী স্তম্ভ। ৺রামেশ্বর দেবের মন্দিরদ্বার রজত-বিমণ্ডিত। দেবী রামেশ্বরী নানাবিধ মণিরত্নে ভূষিতা। ফলতঃ ৺রামেশ্বর দেবের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। আমার মনে হইতে লাগিল আমি সত্যসত্যই আজ কৈলাসপুরী সন্দর্শন করিলাম। রাত্রিকালে Electric Light এর সাহায্যে এই সমস্ত দৃশ্য দর্শন করায় দর্শনীয় বস্তু সমূহের সৌন্দর্য্য শতধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরদিবস দিবালোকে সেরূপ দৃশ্য আর দেখি নাই। যাহা হউক যাহা দেখিলাম তাহা চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা বাসায় আসিয়া নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে দেহযষ্ঠি বিছাইয়া দিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।



জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

[শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব।]

আগামী ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগে (সমাজ বাড়ীতে) ৺পুরীধামের বড় বাবাজী শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেবের দ্বাবিংশতি সাম্বৎসরিক তিরোভাব মহোৎসব হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত মহোৎসবের কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৩০এ মাঘ সোমবার মহোৎসবের শুভাধিবাস।

১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে ৯ই ফাল্গুন বুধবার পর্য্যন্ত নয়দিবস ব্যাপী অহোরাত্র শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

ঐ নবরাত্রের মধ্যেই ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার মহাস্নান।

১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে সূচক কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ আরাধনা এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সেবা ও কাঙ্গালী ভোজন।

১১ই ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন।

১২ই ফাল্গুন শনিবার উক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ গৌরহরিদাস বাবাজী মহান্ত মহাশয়ের স্মরণমহোৎসব তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ আরাধনা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবাদি সেবা ও নগর সঙ্কীর্ত্তন।

সত্য দর্শন

(প্রথম ভাগ—সনাতন ধর্ম্ম)

[শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত]

সনাতন ধর্ম্ম তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা পরিবর্ত্তনশীল জগতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে চির অবস্থান করিতেছে, যাহা দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। উহাকে বুঝিতে হইলে আগে 'ধর্ম্ম এই কথাটিরই স্বরূপ বুঝা আবশ্যক।

প্রত্যেক বস্তুরই বিশিষ্ট গুণকে—বৈশিষ্ট্যটিকে উহার ধর্ম্ম বলা হইয়া

থাকে, ইহাই সাধারণ কথা ; যেমন দগ্ধ করাই অগ্নির ধর্ম্ম, উহাই অগ্নির বিশিষ্টতা। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের বিশিষ্টতা টুকু ধরিতে পারিলে, উহার ধর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই বিশ্বে প্রত্যেক মানব অপর মানব হইতে একটু স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন, সুতরাং উক্ত বিশিষ্টতার ভিতর আমরা বিভিন্নতার যথেষ্ট পরিচয় পাইবার আশা করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত 'ধর্ম্ম' এই শব্দটির উৎপত্তি হইতে ইহার আর একটি অর্থ পাওয়া যায়। যাহা দ্বারা কোন বস্তু ধৃত হয়,—যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই অপরটির, ধৃত বস্তুটির ধর্ম্ম। এইভাবে প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়ই উহাকে ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া, আশ্রয়ই আশ্রিতের ধর্ম্ম। এই বিচিত্র ভাবে প্রতীয়মান বহুত্ব বিশিষ্ট বিশ্বেরও একটি আশ্রয় আছে। উহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, সুতরাং ওই প্রকার সনাতন একটি আশ্রয় সকল মানবেরই ধর্ম্ম হইতে পারে।

ধর্ম্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার।

মানব মাত্রকেই এ জগতে আমরা কর্ম্মনিরত দেখিতে পাই। কেহ স্থূলভাবে প্রকাশ্যভাবে কর্ম্ম করে,—কেহবা সূক্ষ্মভাবে মনের দ্বারা অপ্রকাশিত ভাবে কর্ম্ম করে। সাধারণ জগৎ যাহাদিগকে ধার্ম্মিক আখ্যায় অভিহিত করে, সেই কর্ম্মী জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত মানবগণও যজ্ঞ ধ্যান প্রাণায়াম পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করে। আর ধার্ম্মিক আখ্যার বহির্ভূত যাহারা, তাহারাও নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনাদি সংগ্রহ চেষ্টায় কর্ম্ম করিয়া থাকে। অনেকে ভগবদুদ্দেশে কৃতকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু যে চিন্তাস্তরে দাঁড়াইয়া ওই প্রকার মত দেওয়া হয়, সাধারণ জগৎ সে চিন্তাস্তরের বহুদূরে। তাই সাধারণ ভাবে সাধারণ মানবের চিন্তাস্তরে দাঁড়াইয়া আপাততঃ আমরা যাহা কিছু করা হয়,—কি শরীরের দ্বারা

কর্ম্ম।

কি মনের দ্বারা, সকল গুলিকেই কর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইতেছি; এবং এই ভাবে মানব মাত্রকেই কর্ম্মনিরত দেখিতেছি।

চাঞ্চল্যই কর্ম্মের প্রকাশ। প্রত্যেক মানবই অন্তরে বা বাহিরে গতি বিশিষ্ট বা চঞ্চল। মানব মাত্রই স্থূল কর্ম্মের দ্বারা বাহিরে এবং সূক্ষ্ম কর্ম্ম বা চিন্তা দ্বারা ভিতরে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। 'জগৎ' এই কথাটির মূলেও চাঞ্চল্য বিদ্যমান। 'গম' ধাতুর অর্থ যাওয়া বা চলা, এবং এই ধাতু হইতেই জগৎ কথাটির উৎপত্তি। যাহা কেবলই চলিতেছে, আদৌ স্থির নহে, তাহাই জগৎ। জগৎ বলিতে এখানে শুধু পৃথিবীমাত্র বুঝিলে চলিবে না। মানব-পশু পক্ষী-কীটাদি হইতে বৃক্ষলতা তৃণাদি, এমন কি, স্থাবর অস্থাবর সকলকে লইয়াই জগৎ। জগৎ চলিতেছে, সুতরাং চঞ্চল। আজ কোন বস্তুকে যে ভাবে দেখা গেল, কাল তাহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গিয়া থাকে; উহার কারণ সকলে না বুঝিলেও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সে চলিতেছে, স্থির নহে, চঞ্চল। মানবের এই চাঞ্চল্য কেন? ইহার স্বরূপ কি?

চাঞ্চল্য।

কোন কিছু প্রমাণিত অথবা অনুসন্ধানক্রমে আবিস্কৃত করিতে অগ্রসর হইবার কালে, আমাদের পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সঞ্চিত জ্ঞান বা ধারণা গুলিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে। এই গুলি আমাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা, বা সিদ্ধান্ত। ইহারা আমাদের পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে সহায়ক হয় বলিয়া উহাদিগকে গ্রহণ করাই নীতি। এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা সিদ্ধান্তগুলি আমাদের ভবিষ্যতের অজ্ঞাত সুতরাং অন্ধকারময় পথে অগ্রগমনের কালে আলোক স্বরূপ হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে রাখাই আবশ্যক। সনাতন ধর্ম্ম আলোচনার পথে

স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা সিদ্ধান্ত গুলি অগ্রগমনে আলোক স্বরূপ।

আমাদিগকে আমাদের পূর্ব্ব ধারণা বা সিদ্ধান্ত গুলিকেও সঙ্গে লইতে হইবে, নতুবা প্রত্যেক বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা পূর্ব্বক চলিতে হইলে উদ্দেশ্য অনেক দূরে গিয়া পড়িবে, প্রবন্ধও সুতরাং সুদীর্ঘ হওয়ারই সম্ভাবনা। একেই আমরা চঞ্চল, তারপর যদি উদ্দেশ্য সুদূর এবং আলোচনাও সুতরাং নীরস হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অগ্রসর হওয়া কাহারও নিকট প্রীতিকর বোধ হইবে না।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার, এই নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ জগৎ যে সত্ত্বার বিকাশ, এই স্থূল প্রকাশটিই তাহার সর্ব্বাংশ নহে, একাংশ মাত্র। এতদ্ব্যতীতে আমাদের স্থূল দর্শনের সীমার বাহিরে অদৃষ্ট অবশিষ্টাংশ আছে, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি, এবং করিয়াও থাকি। আমাদের আশ্রয় যেমন এই বিশ্ব, তেমনই এই বিশ্বের আশ্রয় উক্ত অদৃষ্ট অবশিষ্টাংশ।

অদৃষ্ট আশ্রয়।

আমরা উহাকে আপাততঃ বিশ্বাধার জগদ্ধাত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কেহ কেহ এই অদৃষ্ট অংশকে ঈশ্বর, বিশ্বপতি, ভগবান, স্বভাব, সত্য, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আনন্দ, ভূমা, প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই অবশিষ্টাংশের সহিত, বিশ্বাধারের সহিত বিশ্বের তথা আমাদেরও একটি সম্বন্ধ আছে—সংযোগ আছে। আধারের সহিত আধেয়ের সম্বন্ধ

আকর্ষণ।

বা সংযোগ থাকেই, আবার আধারের আশ্রয় বা পরমাশ্রয়ের সহিতও একটি সংযোগ থাকে। পৃথিবীর বক্ষে বৃক্ষ, বৃক্ষের শাখায় ফল, কিন্তু বৃক্ষই ফলের আধার হইলেও পৃথিবীর সঙ্গেও ফলের একটি সংযোগ বা সম্বন্ধ আছে। তাই ফল বৃন্তচ্যুত বা বৃক্ষাশ্রয়-বিচ্যুত হইলে, পৃথিবী-বক্ষেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধের স্বরূপ আধারের আধেয়কে আকর্ষণ। বৈজ্ঞানিক ইহার নাম দিয়াছেন মাধ্যাকর্ষণ।

আমরা যাহা কিছু দেখি বা জানি সকলেরই একটি কারণ বা উৎপত্তি স্থল আছে; এবং প্রত্যেক কারণ উহার স্থূল প্রকাশের সহিতই বর্ত্তমান থাকে। আমার মনে একটি ভাবের উদয় হইল, পরে বাক্যে ওই মনোভাবেরই প্রকাশ হইল। বাক্যে উচ্চারিত হওয়াতে, মনোভাবরূপে যাহা আমি ব্যতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত ছিল, তাহা বাক্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া অপরের নিকট শ্রুত এবং জ্ঞাত হইলেও ভাবেরে নাশ হইল না। ভাব নাশ হইল না, ভাবরূপে যাহা নিরাকার ছিল, বাক্যে উহার একটি মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া গেল। আবার বাক্যটি যদি অক্ষরযোগে লিখিত হয়, তাহা হইলে নিরাকার ভাব, যাহা বাক্যরূপে মাত্র শ্রবণ-গোচর ছিল, তাহা নয়ন-গোচরও হইল, সে আরও পরিস্ফুট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

কারণের প্রকাশ।

আমরা যখনই কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করি, তখনই আমাদের চিত্তে উহার প্রকাশ হয়। যাহার কোনরূপ প্রকাশ আমাদের চিত্তে হয় নাই, আমরা তাহার জ্ঞানলাভও করি নাই, সুতরাং আমাদের কোন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ উহার প্রকাশ ব্যতীত আর কি? এই প্রকাশ নানা প্রকারে হইয়া থাকে, স্থূলভাবে শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে এবং গন্ধে, আর সূক্ষ্মভাবে অনুভবে বা অনুমানে। যে ভাবে যতটুকু প্রকাশ, সেই ভাবে ততটুকুই জানা—ততটুকুই জ্ঞানলাভ। অপরের আমার নিকট প্রকাশই আমার অপরের জ্ঞানলাভ, অপরকে জানা। সুতরাং দুইটি বস্তুর মধ্যে যে সংযোগ বা সম্বন্ধ, তাহাই একের প্রকাশ এবং অপরের জ্ঞান। তুমি যখনই আমার নিকট প্রকাশিত হইবে আমি তখনই তোমাকে জানিব, তোমার প্রকাশের তারতম্যে আমার জানারও তারতম্য হইবে। আমি তোমাকে

প্রকাশই জ্ঞান।

ততটুকু মাত্র জানি যতটুকু তুমি নিজেকে আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছ। অপ্রকাশিতের জ্ঞানলাভ হয় না। একের অপর সম্বন্ধে জ্ঞান স্ুতরাং অপরের প্রকাশ সাপেক্ষ। তুমি আমার নিকট প্রকাশিত না হইলে আমার তোমাকে জানার সম্ভাবনা না-ই। কিন্তু প্রকাশ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। কেহ জানুক আর নাই জানুক, যিনি প্রকাশিত হইবেন তাহাতে তাঁহার কিছু যায় আসে না; বরং যিনি প্রকাশিত হ'ন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আপনাকে জানান বলিয়া অপরে তাঁহাকে জানে। প্রকাশকে জ্ঞানের কারণ রূপেও লইতে পারা যায়।

জ্ঞান, প্রকাশের অপেক্ষা করে।

তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি তোমার আকর্ষণকে আমার চিত্তে অনুভব যোগ্যরূপে প্রকাশিত কর, তাই আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। তোমার আকর্ষণের প্রকাশ তোমার শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধের ভিতর দিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতঃ আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তথায় আমার জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার প্রিয় হইবার তোমার সকল চেষ্টাই ওইরূপে প্রকাশিত হইয়া আমার জ্ঞানে তোমার আমাকে আকর্ষণ বা ভালবাসারূপে মূর্ত্ত হইয়া থাকে, অথবা তোমার আমাকে আকর্ষণ বা ভালবাসা আমার নিকট প্রিয় হইবার তোমার বহু চেষ্টাতে প্রকাশিত বা মূর্ত্ত। আকর্ষণরূপে আমার নিকট এক, এবং নানাবিধ চেষ্টারূপে ওই একই তোমার নিকট বহু। ইহার আর একটি দিক আছে। তুমি আমাকে আকর্ষণ কর—ভালবাস কেন? আমিও তোমার প্রিয় বলিয়া, আমার আকর্ষণও তোমাতে প্রকাশিত বলিয়া, আমিও তোমাকে প্রত্যাকর্ষণ করি বলিয়া। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর অপর একটির সহিত এই প্রকার একটা সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেকেই

আকর্ষণের সঙ্গেই প্রত্যাকর্ষণ।

অপরকে আকর্ষণ এবং প্রত্যাকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাকর্ষণ আছে। সকলেই সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই ক্ষুদ্রই বৃহৎকে আকর্ষণ করে; কিন্তু ক্ষুদ্র বৃহতের প্রিয় না হইলে ওই আকর্ষণ সম্ভব হইত না; সুতরাং ক্ষুদ্রও বৃহৎকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া থাকে; বৃহতের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই একাঙ্গীভাবে ক্ষুদ্রের আকর্ষণও বর্ত্তমান।

একেরই বহু প্রকাশ।

এই সঙ্গে উক্ত আকর্ষণের একটি স্বরূপও উপলব্ধি হইয়া থাকে; উহা আকর্ষণরূপে আমাতে এক, প্রিয় হইবার চেষ্টারূপে তোমাতে বহু। আবার প্রত্যাকর্ষণরূপে তোমাতে এক, এবং প্রিয় হইবার চেষ্টারূপে আমাতে বহু। এক আকর্ষণের বহুবিধ চেষ্টারূপে প্রকাশ। আকর্ষণই প্রিয়ত্ব; তোমার আকর্ষণই আমার নিকট প্রিয়, অতএব উহাতেই আমার প্রিয়ত্ব। তোমার

প্রিয়ত্বই আকর্ষণ

আকর্ষণে আমার প্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আবার ওই সঙ্গে আমার আকর্ষণও সম্ভব হইয়াছে এবং তোমার প্রিয়ত্ব আমাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। আকর্ষণের এই প্রিয়ত্ব হেতুই এক সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রিয় হইয়া উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আমাদের অস্তিত্ব আমাদের প্রাণে বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আমি ততক্ষণই আছি, যতক্ষণ আমার জীবন বা প্রাণ বর্ত্তমান আছে। আমার জীবনহীন অবস্থায় আমার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন যেন আমি আর নাই। প্রত্যেক মানব সম্বন্ধেই এই কথা। ওই প্রাণ বা জীবন দেহসহায়ে নানাবিধ কর্ম্মরূপে বিশ্বে প্রকাশিত। যে মানব

মানবের অস্তিত্ব তাঁহার প্রাণে; প্রাণই দেহরূপে এবং কর্ম্ম মধ্যে ভাব রূপে মূর্ত্ত।

সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, এ বিশ্বে সে মৃত, তাহার প্রকাশ নাই বলিয়া অস্তিত্বও অস্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয় কি ? না ; আজ তাহার প্রকাশ না থাকিলেও—সক্রিয় প্রকাশ না থাকিলেও,—তাহার পূর্ব্বকৃত সক্রিয় প্রকাশ কালে কৃত, বহু কর্ম্মের সহিত তাহার অস্তিত্ব জড়িত থাকিয়া কর্ম্মগুলির প্রকাশের সঙ্গে তাহার অস্তিত্বকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা একখানি বাটী, কিম্বা কোন দেবালয়, প্রতিষ্ঠান অথবা ধর্ম্মসভা কি সাধনাক্ষেত্র দেখিয়া উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের কৃত কর্ম্মের স্থূল প্রকাশ মনে করিয়া থাকি। ওই সকলের সহিত উহাদের কর্ম্মীগণের অস্তিত্বও জড়িত থাকে, তাহাদের ভাবরাজীর মূর্ত্ত বিকাশ উক্ত বাটী, দেবালয়, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মসভা অথবা সাধনাক্ষেত্র। এই প্রকার কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত গ্রন্থেও ভাবরূপে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমরা যখন এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের কৃত কর্ম্মের প্রকাশ দেখি, তখন তাঁহার অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না, তবে প্রত্যক্ষ উক্ত ব্যক্তি বিশেষের প্রকাশ না পাইলে, তাঁহার অস্তিত্বকে অতীতের মধ্যে ফেলিয়া দিই। বলিয়া থাকি, তিনি ছিলেন। ইহার কারণ আমরা দেহাতীত সত্বাকে শুধু দেহময় রূপে চিন্তা করি বলিয়া। দেহাতীত অন্তর্বিধ প্রকাশের মধ্যে, মূর্ত্ত কর্ম্মগুলির মধ্যে উক্ত সত্বার বা জীবনের ভাবময় সূক্ষ্মপ্রকাশকে খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু একেবারেই পাইনা, এমন কথাও বলা যায় না, কারণ, আমরা ওই সকল কর্ম্মের সহিত কর্ম্মীর সত্বার সম্বন্ধ অস্বীকার করিনাত! যেদিন ভাবরূপে মূর্ত্ত-মানবসত্বাকে আমরা চিন্তা করিতে শিখিব, সেদিন আর তাঁহাকে অতীতের মধ্যে ফেলিয়া রাখিব না, তাঁহার কৃত কর্ম্মরাজীর মধ্যেও তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখিব। অনেকে এইরূপ দেখিয়াও থাকেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাবমূর্ত্তির পরিচয় এখনও আমরা অনেকে তাহার কৃত প্রতিষ্ঠান সমুহের অথবা গ্রন্থরাজীর

মধ্যে পাইয়া থাকি, এবং তাই তাঁহাকে ভুলিতে পারি না, বা তাঁহার থাকা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারক শ্রীগৌরচন্দ্র এখনও তাই সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তনারম্ভে 'গৌরচন্দ্রিকা' রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতীর ভাবতনু এখনও আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে বর্ত্তমান। সেবাব্রত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য পদ্ধতির ভিতর দিয়া এখনও শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী দেশে দেশে বিচরণ করেন। সুতরাং প্রত্যেক জীবনই দেহরূপে মূর্ত্ত হইলেও দেহাবসানেই উহার অস্তিত্ব এবং প্রকাশ চলিয়া যায় না, ভাবরূপে চিরকাল বর্ত্তমান থাকে।

এমনি কতই না স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা সিদ্ধান্তরাজী আমাদের আছে, সে সকল গুলির তালিকা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। বুঝিবার সহায় হইবে বলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ মাত্র করিলাম। প্রত্যেক অগ্রগামী মানব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে তাঁহার অনুসরণকারীগণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা যে নানা শাস্ত্র দেখিয়া থাকি, ওইগুলি এই প্রকার সিদ্ধান্ত তালিকা। অগ্রগামী মানবগণের বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন ভাবে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া,আমরাও শাস্ত্র সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিয়া থাকি। একটি মানবেরই বাল্য-পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্দ্ধক্য প্রভৃতি নানা অবস্থায় অবস্থান কালীন অনুভূত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেই কত বিভিন্নতা থাকে, সুতরাং বিভিন্ন লোকের সিদ্ধান্ত গুলির মধ্যে যে বিভিন্নতা থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমরা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলির সহায়তার প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে থাকিলে, এবং আমাদের অগ্রসর হইবার কালে প্রাপ্ত নূতন নূতন ধারণা গুলিকে অগ্রগামীগণের প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া

গ্রহণ করিলে, আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব এক সত্যের বিভিন্ন ভাবে প্রকাশই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তের সহায়তায় আমরা এখনই ইহার একটু আভাষ পাইতে পারি।

বাল্যকালে যখনই লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইয়া কোন চঞ্চল বালক ইচ্ছামত খেলা করিয়া বেড়ায়, তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে নানা প্রকারে শাসন ও তাড়না করিয়া থাকেন। সেই বালক তখন, তাহার পিতামাতার যে স্নেহের পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছিল, তাঁহাদের শাসনের মধ্যে সেইরূপ স্নেহের অভাব দেখিয়া স্বতঃই ধারণা করিয়া ফেলে যে, তাহার পিতামাতা তাহার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছেন। কিন্তু পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই দেখিয়া সেই বালক শাসনের ভয়ে তখন আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতামাতার আজ্ঞামত লেখাপড়া অভ্যাস করিতে বাধ্য হয়। এই অভ্যাস কালে সে তাহার পাঠ্যপুস্তকমধ্যে গ্রন্থকারের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত 'এ জগতে পিতামাতার তুল্য স্নেহময় আর কেহ নাই' ইহা পাইয়া থাকে, এবং তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা ঠিক ইহার বিপরিত হইলেও সে পুস্তকস্থিত সিদ্ধান্ত লইতে বাধ্য হয়। ক্রমে লেখাপড়া অভ্যাস করিতে করিতে তাহার যতই জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে, সে ততই উক্ত বিরুদ্ধ ভাবময় সিদ্ধান্ত লইয়া আপনমনে বিচার করিতে করিতে ক্রমশঃ দেখিতে পায়, তাহার পিতামাতার স্নেহই শাসন ও তাড়নারূপে তাহাকে লেখাপড়ার অভ্যাসে নিযুক্ত রাখিয়া শেষে তাহাকে জ্ঞানদান করতঃ স্নেহের এক বিভিন্ন প্রকাশের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া থাকে; এবং সে তাহার পিতামাতাতে পূর্ব্বে স্নেহহীনতা রূপে গৃহীত ভাবটিকে বা ধারণাটিকে তৎকালে স্নেহাধিকরূপে প্রতিভাত দেখিয়া, গ্রন্থকার প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকে।

যিনি যত অধিক অগ্রসর তিনি ততই তাঁহার বহুধারণার ভিতর

এইরূপে একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা চঞ্চল বলিয়া, উক্ত একত্ব অনুভবগুলি অনেক সময়ে আমাদের চিত্তে থাকিলেও, কার্য্যকালে মনে জাগে না। জগতে মাঝে মাঝে এমন অনেক মহাপুরুষ আসিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে উক্ত অনুভবগুলি সতত উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত থাকে; এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাদের অনেক সংশয় নিরসন পূর্ব্বক আমাদের অন্তরে তৎকালে এক একটি অপূর্ব্ব আলোক জ্বালিয়া দিয়া যান, যাহার সহায়তায় আমরা তখন দ্রুত অগ্রসর হইয়া থাকি। মহাপুরুষগণের জীবন ও উপদেশাবলী আলোচনা করিয়াও অনেকে ঐরূপে অগ্রসর হইতে এবং সেই সঙ্গে এক মহাসত্যের বিচিত্র প্রকাশ অনুভব করতঃ একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতে থাকেন।

এক মহাসত্য আছেন, তাঁহার থাকাটি বহুত্ব বিশিষ্ট বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহার অনুভবেই আনন্দ। তিনি—সেই মহাসত্য আছেন বলিয়াই তাঁহার প্রকাশ আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যময় বিশ্বে তাঁহার প্রকাশও বিচিত্র রূপে প্রতিভাত। তিনি আছেন বলিয়াই সৎ; কিন্তু তাঁহার ঐ থাকা বা অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি প্রকাশময়,—জ্ঞানময়, বা চিৎ। আবার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ অনুভব করিয়া আমরা আনন্দলাভ করি, অর্থাৎ সেই সৎ বস্তু প্রকাশরূপে আমাদের অন্তরে অনুভব বা আনন্দ স্বরূপে প্রতিভাত হন। যিনিই আছেন, তাঁহারই বিচিত্র প্রকাশ, এবং তিনিই আনন্দরূপে অনুভূত বা আস্বাদ্য হইয়াই বর্ত্তমান! সেই এক সত্যই সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় রূপে বর্ত্তমান! তিনি সচ্চিদানন্দ!

সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে যে সত্তার আংশিক বিকাশ বা স্থূল প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং এতদতীত উহার অবশিষ্টাংশের সূক্ষ্ম-

বিকাশ অনুমানও করিয়া থাকি, সেই বিশ্বাধারের অস্তিত্ব আমরা জানি, প্রত্যক্ষরূপে না জানিলেও পরোক্ষরূপে জানি; উক্ত অদৃষ্ট বিশ্বাধারের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার বা নিশ্চয় ভাবে অস্বীকার করিবার সাহস বা সামর্থ্য আমাদের কাহারও নাই। তাই ঘোরতম নাস্তিক মানবকেও একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়া, 'হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর,' এই কথা চিৎকার করিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে। ইহার কারণ, প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে, তাহার জীবনে বা দেহাতীত সত্ত্বায়, তাহার বিশ্বমুখী জ্ঞানের অতীতে উক্ত পরমাশ্রয় বিশ্বাধারের অস্তিত্ব পরোক্ষবোধরূপে রহিয়াছে। যতক্ষণ এই স্থূল বিশ্ব আমাদের আশ্রয়রূপে আমাদের জ্ঞানে রহিয়াছে, ততক্ষণ বিশ্বাতীত আশ্রয়ের কথা আমাদের মধ্যে জাগে না, উহার বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্তই নাস্তিক হওয়া সম্ভব। যেইক্ষণে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়া, এই আশ্রয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ পতিত হয়, সেইক্ষণেই পরমাশ্রয়ের তত্ত্ব,—যাহার পরোক্ষবোধ আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা জাগিয়া উঠে; তাই মানব তখন অদৃষ্ট বিশ্বাধারের শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। এখন আমাদের নিকট স্থূল বিশ্বই আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান; এবং তাই আমরা সখ করিয়া ধর্ম্মালোচনা করা ছাড়া সত্য সত্যই আকুলভাবে পরম এবং চরম আশ্রয় বিশ্বাধারের খোঁজও কেহই বড় করি না। যাহা হউক, যখন উহা আছেই, তখন আমরা আপাততঃ না বুঝিলেও, উহার সহিত আমাদেরও একটি সম্বন্ধ আছেই,—সংযোগ আছেই, আকর্ষণ আছেই। যাহার পুত্র হয় নাই এমন মাতার পুত্র-স্নেহ যেমন অন্তরে নিদ্রিতরূপে রহে, পুত্র কোলে পাইলেই ওই নিদ্রিত স্নেহ জাগিয়া উঠে, তেমনি আমাদের মধ্যে বিশ্বাধারের আকর্ষণ নিদ্রিত রহিয়াছে, বিশ্বাধারকে একবার ধরিতে পারিলেই ওই আকর্ষণ জাগিয়া উঠিবে।

এই বিশ্বের সহিতও আমাদের একটি সম্বন্ধ বা আকর্ষণ আছে, এবং উহা বহুত্ববিশিষ্ট বিশ্বের মত বহুমুখী। এই আকর্ষণটি আমরা বেশ সহজে বুঝিয়াও থাকি। এই বিশ্বের কতই না বস্তুর প্রতি আমরা নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছি! কতই না বস্তুকে আমরা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ত্বকাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন আলিঙ্গন করতঃ রূপ-শব্দ গন্ধ-রস-স্পর্শরূপে নিয়ত পাইতেছি এবং জানিতেছি! আকর্ষণ আছে বলিয়াই এই বিচিত্র বিশ্বের বহুমুখী প্রকাশ আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, আমাদের জ্ঞানরূপে ওই প্রকাশ বহু ভাবে আমাদের অন্তরে বা চিত্তে প্রতিফলিত হয়, আমরা বহু ভাবে বিশ্বকে জানি। বিশ্ব আমাকে আকর্ষণ করে কেন? আমিও প্রত্যাকর্ষণ করি বলিয়া। বিশ্ব না হইলে যে আমার চলে না; ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, তাপে শীতলময়, শীতে উষ্ণ বস্ত্র, রোগে ঔষধ, এমনি নানারূপে বিশ্বকে না পাইলে আমি যে থাকিতে পারি না। বিশ্ব আমার সখ্যে সখা, বাৎসল্যে সন্তান, প্রভুত্বে দাস, দাসত্বে প্রভু; বিশ্ব আমার বাক্যের শ্রোতা, রূপের দ্রষ্টা, স্পর্শের আলিঙ্গন; বিশ্ব আমার অসহায় অবস্থার সহায়; আমি যে আছি, আমার অস্তিত্ব প্রকাশের আশ্রয়ই এই বহুত্ব বিশিষ্ট বিশ্ব। এ বিশ্বকে না পাইলে আমি থাকিব কেমন করিয়া? বিশ্ব ছাড়া আমি নিয়ত অপূর্ণ সর্ব্বদাই অভাবময়! তাই বিশ্বকে আমি আকর্ষণ করি আমার অভাব, পূর্ণ করিতে, অথবা নিজেই পূর্ণ হইতে! নানাভাবে বিশ্বকে পাইবার জন্য আমি চঞ্চল, পাঠক আপনিও চঞ্চল, মানবমাত্রেই চঞ্চল! আবার বিশ্বও আমাদের দর্শনে রূপ, শ্রবণে শব্দ, নাসিকায় গন্ধ, জিহ্বায় রস, ত্বকে আলিঙ্গন ইত্যাদি নানারূপে আমার যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিতে,—বুঝিবা আমাকে লইয়া পূর্ণ হইতেও,—নিয়ত চঞ্চল!

বিশ্ব ও আমার মধ্যে অথবা বিশ্ব ও প্রত্যেক মানবের মধ্যে যে

সম্বন্ধ,—সংযোগ অথবা আকর্ষণ, উহাই চাঞ্চল্যরূপে বিশ্বে এবং আমাতে —অথবা প্রত্যেক মানবে বিদ্যমান। আমরা প্রথমেই এই চাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম; এখন দেখিলাম ঐ চাঞ্চল্য প্রত্যেক মানব এবং তদ্ব্যতীত জীবজগতের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধ বা আকর্ষণজাত। ওই চাঞ্চল্যই কর্ম্মরূপে বিকশিত। তবে কি আমার সকল কর্ম্মই,—প্রত্যেক মানবের কর্ম্মমাত্রেই,—আমার বা তাহার অভাব পূর্ণ করিবার অথবা নিজ পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা? তাহাত বটেই! একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? আমার অভাব মিটাইবার—আমার পূর্ণতা সাধন করিবার জন্যই ত আমার সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম! আমি ত পূর্ণ হইবার জন্যই চঞ্চল!

এই চাঞ্চল্য—এই কর্ম্ম প্রবণতা প্রত্যেক মানবকে জানাইয়া দিতেছে যে, সে অভাবগ্রস্থ বা অপূর্ণরূপে বর্ত্তমান। শুধু তাহাই নহে, এই চাঞ্চল্য আরও বলিয়া দিতেছে যে, প্রত্যেক মানব অপূর্ণ, সুতরাং অংশ ত বটেই, আবার যাহাদিগকে লইয়া সে পূর্ণ হইতে চাহে, তাহারাও অপূর্ণ বা অংশ। সকল অংশ একত্রিত না হইলে সম্পূর্ণতাও সাধিত হয় না। সকল অংশেই তাই সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা বা চাঞ্চল্য বর্ত্তমান।

বহু ভাবাপন্ন বিশ্বের সহিত এই যে সম্বন্ধ, এইটি আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাধারের সহিত সম্বন্ধটি আমরা আপাততঃ প্রত্যক্ষ না বুঝিলেও অনুমান করিতে পারি, পরোক্ষভাবে উহাও আমরা জানি। এই দুইটি সম্বন্ধই আমাদের ধর্ম্ম। বহুত্ববিশিষ্ট বিশ্বের বা জীবজগতের সহিত সম্বন্ধটিকে আপাততঃ 'সামান্য ধর্ম্ম' আখ্যায় অভিহিত করা থাকুক; এবং বিশ্বাধারের সহিত সম্বন্ধটিকে 'বিশেষ ধর্ম্ম' এই পরিচয়ে জানিয়া রাখি। ইহার একটির ভিতর দিয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়, অপরটি আমাদিগকে মাধ্যাকর্ষণ যেমন পৃথিবীর প্রত্যেক অণুপরমাণুকে

ধারণ করিয়া থাকে, তেমনই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা আলোচনা পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ দেখিব মানবমাত্রেই সামান্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই বিশেষ ধর্ম্মে অগ্রসর হইতেছে। বহু ভাবাপন্ন বিশ্বের সহিত সম্বন্ধটিও বহুত্ববিশিষ্ট, এবং সামান্য ধর্ম্মও তাই বহুমুখী। কালে সামান্য ধর্ম্মই সামান্যত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশেষত্বে উপনীত হইলে আমরা দেখিব বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান বহু ধর্ম্ম পথগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটি প্রশস্ত পথে পরিণত হইয়া বিশ্বাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

ঢাকা শ্রীশ্রীহরিসভার নিবেদন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকা নগরী শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অগণিত লোকের বাসস্থান। কিন্তু এখানে মঙ্গলময় ভাগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাদির জন্য জনসাধারণের কোন উৎকৃষ্ট স্থান ও একটি ধর্ম্ম গ্রন্থাগার নাই। প্রতি বৎসর নানাস্থান হইতে সমাগত বহু শিক্ষার্থী যুবক এখানে বাস করেন, কিন্তু তাহাদের সনাতন ভাগবদ্ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পন্থায় চরিত্রানুশীলনের সহায়তাকারী কোন প্রতিষ্ঠান এখানে নাই।

এই অভাব বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া আজ প্রায় পনরবৎসর যাবত আমরা ঢাকায় শ্রীশ্রীহরিসভা ও শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইতেছি। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহা সুধী মহাত্মাগণের বিবেচ্য। প্রতিবৎসর কলিকাতা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর,

বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে দেশ-প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বক্তাগণ, শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠক ও কথকগণ, শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ও ভগবদ্ভক্তগণ এই সভায় সমাগত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। হরিসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বহু ছাত্র ও ভদ্রমণ্ডলী শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করতঃ আনন্দলাভ করিতেছেন।

কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমরা এ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরিসভা ও গ্রন্থ-মন্দিরের উপযোগী একটী স্থায়ী ভূমি ও মন্দির নির্ম্মাণের সুবিধা করিতে পারি নাই। ঢাকার মত প্রসিদ্ধ স্থানের অধিবাসীগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই অভাব দূরীকরণার্থে আমরা মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া এবং ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণের শুভাকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রীহরি সভার মন্দির নির্ম্মাণের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়াছি।

এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমাদের অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এ নিমিত্ত, ভক্তগণ যথাশক্তি দান করুন। শ্রীশ্রীভগবদর্থে আপনাদিগের এই দান অক্ষয়কীর্ত্তিতে পরিণত হইবে।

নিবেদক—
শ্রীবসন্তকুমার সেন, প্লিডার,
সম্পাদক।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
ও
শ্রীগোপীনাথ বসাক, (মার্চ্চেণ্ট)
সহ-সম্পাদক।

কোষাধ্যক্ষ—
শ্রীরজনীকান্ত পাল,
(বেঙ্কার ও জমিদার)।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরজনীকান্ত পাল, বেঙ্কার ও জমিদার.

শ্রীশ্রীহরিসভা, ঢাকা।

পদক ও পুরস্কার

বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পদক

	পদক	প্রবন্ধ
১।	হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।
২।	হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩।	তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪।	রামগোপাল রৌপ্যপদক	'এষা' কাব্য সমালোচনা।
৫।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)	'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।
৬।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।
৭।	জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক	মাইকেলের ছন্দ।
৮।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

২। গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲) স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

কীর্ত্তন-মহোৎসব

আগামী ২৭শে ফাল্গুন রবিবার হালিসহরে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটে উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহোদয় শ্রীনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ তুলিবেন। সকলে সদলবলে উপস্থিত হইয়া উৎসবের আনন্দে যোগদান করেন ইহাই কর্ম্মীগণের একান্ত অনুরোধ। ই, বি, রেলওয়ে হালিসহর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে মুখার্জ্জি পাড়ায় উৎসবস্থল।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

ভক্তি

ফাল্গুন
১৩৩৪

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা

আজু মধুর মধু ঋতু ফাগুনে ফাগু মাতিয়া।
মৃদু মলয় সুরভি শুভ মুকুল ফুল ভাতিয়া॥
কোকিল কুহু ফুকারে মুহু পুলকে ভরু গাতিয়া।
ঝরু নয়ন কহই মন সোই "পূণিম রাতিয়া॥"
কানু ভানুক তিরোভাবে, জগত মাহা কত ভাবে,
নির্যাতন বিপলব আঁধারে ধরা ছাপিয়া।
বিপদ ভেল বিপথ রাশি কপট সুখ কপট হাসি
হেরি রোয়ত সীতানাথ ব্যথিত হরিদাসিয়া।

সাধক আঁখি তপতনীরে গোলক উঠি কাঁপিয়া
নামল হরি নদিয়া পুরী সোই "পূর্ণিম রাতিয়া ।"
আশোয়াসিতে কলিজীবে নাম প্রেম বিলাইতে
পাপী তাপী পতিত নীচে আপন বুকে তুলে নিতে
সাড়া ভারত দুয়ারে আসি, পাগল প্রেমে কাঁদল ভাসি
চিহ্নই কত ভকতবর হেরি প্রেম মুরতিয়া
রাই-কানু জনম তিথি দোহ-অটমী মথিয়া
আওল দোহে এক মেলি সোই "পূর্ণিম রাতিয়া ॥"

শ্রীগোপীনাথ বসাক ;

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(১৩)

[শচীমার সহিত মিলন]

"দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর ॥" (চৈঃ মঃ)

নিতাই ব্রজের ভাবে বিভোর, তিনি নিমাইকে ঠিক তাঁহার ছোট ভাই প্রাণকানাইয়ের মতই দেখেন। পরদিন নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। জননীকে মা মা বলিয়া ডাকিলেন। মা আসিলে নিমাই বলিলেন মা, এই আমার দাদা—তোমার বড় ছেলেকে আনিয়াছি। মা, ইহাকে তোমার বিশ্বরূপ বলিয়া জানিও। শচীমা নিমাইএর কথায় বিহ্বল হইয়া নিতাই-র মুখপানে চাহিলেন, দেখেন ঠিক যেন তাঁহার বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ নিতাইর দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন—নিতাইর

দেহে বিশ্বরূপের তেজ ছিল, নিমাই একথা জানিতেন। তাই নিমাইর কথায় শচীমা নিতাইর মুখপানে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—ঠিক যেন তাঁহার বিশ্বরূপ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই পরকায়া প্রবেশের কথা ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইবে। নিমাইর মুহুর্মুহু আবেশ—তাঁহার ভক্ত ভাবও ভাগ্যবান—চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের গৃহে নাটক অভিনয় কালে ভক্তগণের দেহে দেবতাগণের আবির্ভাব সকলে অবগত আছেন। মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরের দেহে বিদুর দেহত্যাগ করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, জ্ঞাত হওয়া যায়। অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

নিতাইকে দেখিয়া শচীমার আঁখি ছল ছল করিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন সত্যই কি এ অবধূত তাঁহার বিশ্বরূপ? তিনি নিতাইকে বলিতেছেন—"বাপ্! নিমাই আমার বলিতেছে তুমি তাহার দাদা বিশ্বরূপ, সত্যই কি তুমি আমার পুত্র? বাপ্ একি সত্য! না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?" নিতাই বলিলেন, "হঁ্যা মা! সত্যই আমি তোমার সেই বিশ্বরূপ।"

শচীমা, নিতাইর কথা বিশ্বাস করিলেন, তিনি তাঁহাকে বাপ্! বাপ্! বলিয়া কোলে লইয়া বসিলেন। নিতাইকে কোলে লইয়া তিনি তাঁহার দেহে হাত বুলাইতেছেন আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। বহুদিনের হারানিধি আজ কোলে পাইয়া মাতার আনন্দের আর সীমা নাই। বলিতেছেন, "নিমাই আমার পাগল ছেলে,—এতদিন সে একাকী ছিল, আজ হ'তে তুমি তাহাকে দেখিও। তোমার ছোট ভাইটীর ভার তোমাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

"নিত্যানন্দ-মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদগদ বাণী ॥

এই মত স্নেহ-রসে সব গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর ॥"

[শচীমার বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন]

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥

(শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্লোক।)

প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দের ভার শ্রীবাসের উপর দিয়াছেন। তিনি শ্রীবাসের বাড়ী থাকেন। নিতাইর বয়স বত্রিশ কিন্তু স্বভাব একেবারে বালকের মত। নিতাই শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে মা বলেন। মাতৃস্নেহ তাঁহার মনে নাই। বিংশতি বৎসর পথে পথে ঘুরিতেছেন। এখন একসঙ্গে গৃহ ও মাতা পাইয়া শিশু-স্বভাব নিতাই একেবারে বালকের মত হইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। তিনি নিজ হাতে ভাত মাখিয়া খাওয়াইয়া দেন, তবে তাঁহার খাওয়া হয়, যেন পাঁচ বছরের ছেলেটী। নিত্যানন্দের বাল্যভাব ইহাতে বেশ বুঝা যায়।

"আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥

শুধু ইহা নহে। তিনি মালিনীর স্তন্যদুগ্ধও কখন কখন পান করেন। আশ্চর্য্য তাঁহার স্পর্শে সেই শুষ্ক স্তনে ও দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল। আহারের বিচার নাই, আহার্য্যেরও অভাব নাই। যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। স্নানের সময় গঙ্গায় পড়েন আর উঠেন না। নিতাই সাঁতার দিতেছেন, ভক্তগণের স্নান হইয়াছে তাহারা তাঁহার অপেক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুতেই উঠিবেন না। তখন নিমাই ডাকিলেন শ্রীপাদ! উঠ, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে, ভক্তগণ তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

নিমাইর বাক্যে নিতাই তাড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন। শিশু যেমন মাতৃস্বরে ছুটিয়া আসে তেমনি ছুটিয়া আসিলেন। এতক্ষণ ভক্তগণ কত সাধাসাধি করিতেছিল তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

একদিন প্রভু শ্রীবাসের গৃহে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি এই অবধূতকে বাড়ীতে রাখিয়াছ কেন? তুমি ত ইহার জাতি, কুল, শীল কিছুই জান না, ইহাকে ঘরে রাখিয়া কি নিজের জাতি নষ্ট করিবে? তুমি পরম উদার বলিয়া একথা তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি। তুমি সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিও।"

শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় শ্রীবাস হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "প্রভু তোমার আমাকে এভাবে পরীক্ষা করা কি উচিত? প্রভু আমাকে ছলনা করিও না। নিত্যানন্দের সহিত তোমার সম্বন্ধ আমি বুঝিয়াছি। তোমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তোমরা উভয়ে অভিন্ন দেহ। প্রভু তুমি যখন আমার প্রাণতুল্য তখন নিত্যানন্দকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ—

"দিনেক যে তো·া ভজে, সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হ'তে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি, প্রাণ, ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবাসের মুখে এইকথা শুনিয়া প্রভুর ভগবান ভাব হইল। তিনি আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—পণ্ডিত! তুমি ধন্য, নিত্যানন্দে তোমার এরূপ বিশ্বাস। নিত্যানন্দ মহিমা বড়ই গোপনীয় উহা সহজবোধ্য

নহে। তুমি সে গূঢ় নিতাই তত্ত্ব অবগত হইয়াছ। সদানন্দ নিত্যানন্দ যথায় অবস্থান করেন কোন প্রকার নিরানন্দ ভাব তথায় থাকিতে পারে না। আর তথাকার পশু পক্ষী পর্য্যন্তও কৃষ্ণ প্রেমেমত্ত থাকে।"প্রভু আরও বলিলেন—

* * *

তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দে সমর্পিনু আমি তোমার স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥

নিমাই বর দিয়া চলিয়া গেলেন। নিতাইর সহবাসে পণ্ডিতের গোষ্ঠির আনন্দের সীমা নাই। নিতাই বাল্য ভাবে বিভোর, প্রেমে ঢল ঢল। তিনি প্রেমানন্দে সারাটী নদীয়া ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও গঙ্গায় নামিয়া সন্তরণ করেন, কখনও বালকগণের সহিত ক্রীড়া করেন, কখনও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে, আবার কখনও বা মুরারি গুপ্তের বাড়ী গমন করেন, কখনও আবার ছুটিয়া প্রভুর বাড়ী যান। শচীমা নিতাইকে বড়ই স্নেহ করেন। বাল্যভাবে নিতাই শচীমার চরণ ধরিতে যান আর জননী আস্তে ব্যস্তে দূরে পালাইয়া যান। মাতার সহিত নিতাইর এই রঙ্গ হয়।

এখন এক বিচিত্র ঘটনা শুনুন। একদিন শচী দেবী নিজ পুত্রকে বলিলেন, বাপ নিমাই! গত রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি আর নিতাই দুইজনে যেন পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়া মারামারি

দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছ, পরে উভয়ে দৌড়িয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলে, আর নিতাই কৃষ্ণ ও তুমি বলরাম মূর্ত্তি হাতে লইয়া বাহির হইলে তখন চারিজনে বিবাদ বাধিল। রামকৃষ্ণ বলিলেন—"তোরা কে ডাকাত দু'জন। এ বাড়ী ঘর সব আমাদের, এই যে দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ সব আমাদের জন্ত।" নিতাই সহাস্তে বলিলেন,—যেকালে তোমরা দধি দুগ্ধ ননী খেয়ে কাল কাটিয়েছ, সেকাল আর নাই, সে গোয়ালার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, এখন বিপ্রের অধিকার। এখন আর দাবি চলিবে না। এখন ভালয় ভালয় সব জিনিস ছাড়িয়া দাও। নতুবা আমার হাতে পরিত্রাণ নাই। বলরাম কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিত্যানন্দের প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতে নিতাই বলিল, "তোর কৃষ্ণকে কি ভয়, দেখিতেছ না আমার প্রভু গৌরচন্দ্র সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন" এই বলিয়া চারিজনে কাড়াকাড়ি করিয়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আদি ভোজন করিতে লাগিল। পরে নিত্যানন্দ আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে খাইতে দাও।" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, মা! তুমি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ, আর কাহারও নিকট এই স্বপ্ন কথা প্রকাশ করিও না। আমাদের বাড়ীর দেবতা বড় প্রত্যক্ষ, তোমার কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমি প্রত্যহ দেখি ঠাকুরকে যে নৈবেদ্য দিই তাহার আধাআধি থাকে না। লজ্জায় কাহাকেও একথা বলি না, কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে তোমার বধূরই এই কাজ, কিন্তু আজ আমার সে সন্দেহ ঘুচিল।

"হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥"

শচীমা বুঝিলেন নিমাই তাঁহার সহিত রহস্য করিতেছেন। নিমাইর প্রেম বিহ্বলতায় শচী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষাদিতা ছিলেন, তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিবার জন্য প্রভু মধ্যে মধ্যে এইরূপ রহস্যচ্ছলে আনন্দ দান করিতেন। নিমাই আরও বলিলেন—মা! নিতাইকে শীঘ্র এক দিবস ভোজন করাও।

নিমাইর কথায় শচীমা আনন্দিত হইয়া নিতাইকে ভোজন করাইবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রভু বিশ্বম্ভর নিতাইর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ আজ আমার বাড়ীতে আপনার ভিক্ষা হইবে। কিন্তু প্রভু, একটী অনুরোধ তথায় যাইয়া যেন কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবেন না।"

ইহা শুনিয়া নিতাই দুই কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, "শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! আমি কি পাগল? তুমি বুঝি আপনার মতই সকলকে মনে কর?"

তখন দুই সদানন্দ প্রভু উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন এবং পরে কৃষ্ণ কথা বলিতে বলিতে শচীমার নিকট আগমন করিলেন। ক্রমশঃ গদাধর আদি পরমাপ্তগণ আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। ভাগ্যবান ঈশান দুই প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া দিলে তাঁহারা পরমানন্দিত চিত্তে ভোজনে বসিলেন। যেন কৌশল্যা মাতার গৃহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভোজনে বসিয়াছেন এইরূপ শোভা হইল। আবার উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসাও ঠিক সেইরূপ। শচীমা মনের হরিষে তাঁহার দুই পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন। তিনি বড়ই ভাগ্যবতী, পুত্রদ্বয়ের ভোজনকালে তাঁহার কিছু অপূর্ব্ব দর্শন ঘটিল।

"ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুইজন হাসে।"

বারান্তরে শচী পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখেন,—তাঁহারা আর তাঁহার নিতাই গৌর নহেন—তাঁহারা দুইটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু। একজনের বর্ণ শুভ্র, অপর কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই দিগম্বর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। একের হস্তে শ্রীহল মুষল, অপরের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিভূষিত। শ্রীঅঙ্গ, শ্রীবৎস-কৌস্তুভ, মকর কুণ্ডলাদি দ্বারা পরিশোভিত। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কৃষ্ণ মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ব্ব দর্শন লাভ করিয়া শচীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হাতের পরিবেশন পাত্র হইতে অন্ন ব্যঞ্জন ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। শচীর দেহে তখন অশ্রুকম্প পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব যুগবৎ দেখা দিয়াছে।

মহাপ্রভু ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া মাতার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা! উঠ, তুমি হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়িলে কেন ?

প্রভুর শীতল হস্ত স্পর্শে শচীমা চেতন পাইলেন। তিনি পরিপূর্ণ প্রেমে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঈশান গৃহ পরিষ্কার করিলেন। পাত্র শেষ যাহা কিছু ছিল সমস্তই তাহার। তাই কবি বৃন্দাবন দাস গৌরব করিয়া বলিয়াছেন—

"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান॥"

শচীমা জ্ঞানলাভ করিয়া দুই পুত্রকে মনের সাধে সাজাইলেন এবং নিতাইর চাঁদ মুখখানি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিমাই আজও বলিলেন, "মা! ইহাকে নিজ পুত্র বলিয়াই জানিবে এবং আমাপেক্ষাও অধিক যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে।

শচীমার পুত্রস্নেহ অতুলনীয়। তিনি যখনই নিতাইকে দেখেন তখনই তাঁহাকে আপনার বড় ছেলে বলিয়াই বুঝেন। রঙ্গিয়া প্রভুর এও এক বিচিত্র লীলা, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিতাইর দেহে বিশ্বরূপের

শক্তি ছিল। শচীমা নিতাইর দিকে চাহিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শচীমা নিতাইকে বলিলেন, "নিতাই নিমাইর কথা শুনিলে ত? নিতাই বলিলেন—"মা! কথা সত্য, আমরা দু'জনে তোমার দুটী ছেলে, তবে মা তোমার চঞ্চল নিতাইর অপরাধ লইতে পারিবে না, ইহা বলিয়া রাখিলাম।" এইরূপে সেই দিনকার লীলা শেষ হইল।

* * * * *

অপর এক দিবস মহাপ্রভু পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে নিত্যানন্দ। এমন সময় শ্রীল মুরারি গুপ্ত আগমন করিলেন। তিনি অগ্রে নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়া পরে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু ইহাতে পরমানন্দিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রহস্য করিয়া বলিলেন "গুপ্ত, এ তোমার কিরূপ ধর্ম্ম?" চতুর মুরারি বলিলেন, "প্রভু, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি কি বুঝি। তুমি যাহা করাও আমি তাহাই করি। বায়ু কর্ত্তৃক যেরূপ শুষ্ক তৃণ চালিত হয়, সেইরূপ জীবগণও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে।"

"পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥"

"জীব তোমার শক্তিতে শক্তিমান, তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা কিছুমাত্র নাই।" মুরারির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু বলিলেন, "মুরারি, তুমি প্রকৃতই আমার যথার্থ ভক্ত, যেহেতু পরম গুপ্ত নিত্যানন্দ তত্ত্ব তুমি অবগত হইয়াছ, নিত্যানন্দের প্রতি যাহার ভক্তি আছে সে-ই আমার প্রিয়। আর নিত্যানন্দের প্রতি কিছুমাত্রও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া যে আমাকে ভক্তি করে, সে আমার দাস হইলেও আমার প্রিয় হইতে পারে না।"

"সত্য সত্য মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ।

শ্রীচৈতন্য আবাহন

এস বঙ্গের চির উপাস্য
দুঃখিনী অঞ্চল নিধি!
বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, এস,
এস বঙ্গের বিধি!!
এস বাঙ্গালীর ভগবান, তুমি
বাঙ্গালীর অবতার!
বাঙ্গালীর তুমি, কাঙ্গালীর তুমি,
বাঙ্গালী যে গো তোমার!!
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মান,
বাঙ্গালীর তুমি ধর্ম্ম!
বাঙ্গালীর বেদ, পুরাণ তুমিই,
বাঙ্গালীর তুমি মর্ম্ম!!

বাঙ্গলা সরস, তুমি তার রস,
তুমি তার গান, সুর !
বাঙ্গলা বাতাস তোমার প্রেমের
হিল্লোলে ভরপুর !!
নিজস্ব বলিতে বাঙ্গালীর তুমি,
তোমা পেয়ে তারা ধন্য !
নিখিলবাদের সমন্বয়, এস,
বাঙ্গালীর শ্রীচৈতন্য !!

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দ মিলন

(৩)

প্রভু সঙ্গীসহ সভায় আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীগণকে যোড়করে নমস্কার করিলেন। পরক্ষণেই মুখপদ্ম ভূমিতে নিবদ্ধ হইল। পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রভু সভার মধ্যে না বসিয়া পাদ প্রক্ষালনের স্থানেই আসন গ্রহণ করিলেন।

"সভা নমস্করি গেল পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল সেই স্থানে ॥"

সভা মধ্যে না বসিয়া অতি দৈন্যে পাদ প্রক্ষালনের স্থানে উপবেশন

করায় প্রকাশানন্দ বিচলিত হইলেন। তিনি প্রভুকে সভা মধ্যে আহ্বান করিলেন—কিন্তু প্রভু বিনিত ভাবে বলিলেন—

"—আমি হীন সম্প্রদায়।
তোমা সবার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥"

কিন্তু প্রকাশানন্দের বৈরীভাব প্রভুর প্রথম দর্শনেই প্রায় বিদূরিত হইয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—সত্বর উঠিয়া সাদরে প্রভুকে হস্ত ধারণ করিয়া সভামধ্যে লইয়া আসিনেন। প্রকাশানন্দের মন আজ নানা চিন্তাস্রোতে উদ্বেলিত। এই মহাতেজস্বী সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য নবীন সন্ন্যাসী কি লোক প্রতারক ? ইনি কি ইন্দ্রজালী ?—মোহন বিদ্যায় সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন ? অসম্ভব—অসম্ভব—এ চিন্তা মনে আনাও পাপ। তবে ইনি কে ? ইনি কি সাধারণ দেহধারী, সন্ন্যাস লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন ? তবে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাচরণ করেন কেন ? নৃত্য গীতাদি যাহা সন্ন্যাসীর নিতান্ত দূষণীয় তাহা নিজে আচরণ এবং প্রচারই বা করেন কেন ? প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তাহার গম্ভীর চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। তিনি অকপটে তাঁহার সন্দেহও সমস্যার কথা প্রভুকে জানাইলেন :—

"সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সভার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন ও গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি যে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥"

প্রকাশানন্দের ঘনীভূত সকল সন্দেহ এই প্রশ্ন কতিপয়ে প্রকাশ পাইল। পরম রসিক প্রভু উত্তরে বলিলেন "গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দিয়া এই আদেশ করিলেন যে, তোমার ত বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি মুর্খ কাজেই—

"কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।"
"কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসারে মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥"

আমি এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অহর্নিশি কেবল কৃষ্ণনাম জপ করি। বলিতে কি—

"নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥"
"ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত॥"

এই নামের ফলেই আমার নৃত্য গীত আনন্দোচ্ছাস—ইহা আমি স্ববশে করি না।—

"গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥"
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥"

সশিষ্য প্রকাশানন্দ প্রভুর উত্তরে মুগ্ধ হইতেছেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর সুমধুর বীণা বিনিন্দিত। প্রতি কথা হইতে যেন অমিয় ঝড়িতেছে। প্রকাশানন্দের হৃদয়ের সকল তন্ত্রী আজ এক সুমোহন সুরে বাজিয়া উঠিল! জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম তিনি কি যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ রসে সিঞ্চিত হইলেন। প্রভু কেন বেদান্ত পাঠ করেন না তাহারও কারণ বলিলেন।

বেদান্তের সূত্র অতি প্রাঞ্জল, তাহার প্রকৃত অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য-মেঘ সূত্রের নির্ম্মল, স্বচ্ছ অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। তৎকৃত ভাষ্যে নির্ভর করিলে যে বেদান্তের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না—প্রভু তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আচার্য্যের সব কপোল কল্পিত ভাষ্যের সহিত যে বেদান্তের প্রকৃত অর্থের কোন সামঞ্জস্য নাই জগৎ গুরু আচার্য্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া (অদ্বৈতবাদ স্থাপনের অভিপ্রায়) যে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ প্রচার করেন নাই প্রভু তাহা সুচারুরূপে বুঝাইতে লাগিলেন।

"তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করি মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥"

প্রভু আচার্য্য কৃত ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।"

* * *

"তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্যের বিকার।"

* * *

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গেরকণ।
জীবতত্ত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরম প্রমান ॥"

* * *

"সর্ব্ববেদ সূত্রে কহে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥

এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥"

নাম সংকীর্ত্তনই যে কলির জীবের একমাত্র উপায়—তদ্ব্যতীত যে আর পন্থা নাই প্রভু নানা শাস্ত্রাদি হৈতে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। এবং "হরিনাম" শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুর অসাধারণ মনীষা, অপ্রমেয় পাণ্ডিত্য—"হরের্নাম" শ্লোকের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসীগণ একেবারে মুগ্ধ হইলেন। বেদান্তের যে ব্যাখ্যায়—ভাগবতের "আত্মারাম শ্লোকের যে পাণ্ডিত্য পূর্ণ বিশ্লেষণে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম এক দিবস নিজ আত্মম্ভরিতায় ধিক্কার দিয়া প্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে তাহার চরণে পতিত হইয়া জীবন ব্যাপী জ্ঞানলাভ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ভক্তি রাজ্যের পথিক হইয়াছিলেন—বেদান্তের সেই অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় যে কাশীনগরীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ বিস্মিত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি ? প্রভু দেখাইলেন—ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—

"পরম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন॥"

সন্ন্যাসীই হও আর পণ্ডিত শিরোমণিই হও এই ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে জীবনই বৃথা।

প্রকাশানন্দ নির্ব্বাক! প্রভু যে কতবড় পণ্ডিত তাঁহার দীপ্ত প্রতিভা সূর্য্যের সম্মুখে প্রকাশানন্দের জ্ঞান গরিমার ম্লান রশ্মি যে ক্ষুদ্র খদ্যোতের সহিতও তুলিত হইতে পারে না শিষ্যগণ আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে সকলের হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

"এই মত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥"

"বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন॥"

প্রভুর দর্শনাবধি "সন্ন্যাসীগণের মন ফিরিয়া গেল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন—কেহ কেহ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনও আরম্ভ করিয়াছেন। যে মুখে মহাপ্রভুর নিন্দাবাদ প্রচারিত হইয়া ভক্তগণকে ক্লিষ্ট করিয়াছে এখন তাহা "কৃষ্ণ হরি" নামে ভরপুর হইল।

নাম সংকীর্ত্তনে মাদকতা আছে। নাম স্ব মাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে। মন বিষয়াশক্ত না হইলে নাম কীর্ত্তনে অনুরাগ আসিতে অধিক বিলম্ব হয় না।

শ্রীপ্রমথ নাথ মজুমদার বি, এল।

শিবরাত্রি

[শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয়-লিখিত]

যার তার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া ক্ষুদ্র হইতে যাও কেন? ব্যক্তি মধ্যে বল, পরিবার-মধ্যে বল, সমাজ-মধ্যে বল, জাতি-মধ্যে বল, চারিধারে দুঃখের সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। এই কালে ইহাই হইবে। এ দুঃখের প্রতিকার করিবে কে? কেহই করিতে পারিবে না। কেহই কি পারিবে না? এ কথা বলি না। কোন মানুষে পারিবে না। তবে যিনি পারিবেন, তাঁহাকেই বলিলে কাজ হইবে, অন্যত্র বিফল।

এই প্রবল দুঃখের প্রতিকার একমাত্র শ্রীভগবান তুমি ভিন্ন অন্য কেহই

করিতে পারিবে না। তাই দুঃখের কথা তোমাকে জানাইতে চাই। সকল দ্বারে বিফলমনোরথ হইয়া আজ তোমার দ্বারে আসিয়াছি দুঃখের কথা বলিতে। তুমি বধিরও নও, তুমি অন্ধও নও। তুমি সব দেখিতেছ, তুমি সব শুনিতেছ। আর আমার আত্মার মত তুমি আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া রহিয়াছ। তবু আমার দুঃখ যায় না কেন? তুমি প্রতিকার কর না কেন? আমি সব ছাড়িয়া তোমার আশ্রয় লই না বলিয়াই তুমি আস না। হায়! আমার দুর্ব্বল বিশ্বাস! আমার বিশ্বাসে কোথাও বুঝি একটু চিড় আছে—কোথাও যেন কোন অবিশ্বাসের বীজ আছে—আমি বুঝি সংশয়াত্মা হইয়া আছি, তাই দুঃখে দুঃখে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছি। তুমি ভিন্ন আমার দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে আর কেহ পারিবে না। তুমি পারিবে, আর তুমি ভিন্ন যাহার আর কেহ নাই, যিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন ও অনুভব করিতেছেন, তিনি পারিবেন। তুমি আর তোমার যথার্থ ভক্ত ভিন্ন চারিধারের দুঃখ সরাইতে আর কেহ পারিবে না। মানুষ তোমার আশ্রয়ে না আসিয়া কোনও বুদ্ধি কৌশলে জীবের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না।

তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে আছ সত্য, কিন্তু কালে কালে বিশেষ বিশেষ ভাবে নিজের সত্তা উপলব্ধি করাইয়া থাক। শিবরাত্রি একটি সেইরূপ সময়। শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিয়া আশুতোষ তুমি—তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে 'নমো নমঃ' করিয়া প্রার্থনা করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সকল দুঃখ দূর করিয়া থাক। যিনি হৃদয়ের ঐকান্তিকতার সহিত 'নমো নমঃ' করিতে পারেন—ঠাকুর আমার কিছুই নাই, সব তোমার—আমি কেহ নই—আমিও তোমার—হৃদয়ে এই ভাব আনিয়া—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া—যিনি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁর জন্য তোমার অভয় হস্ত সর্ব্বদা বরপ্রদ। তবে তোমার স্বভাবটিও

গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে শুনিয়া রাখা চাই। আমাদের জাতীয় কে না জানে ঠাকুর তুমি অগতির গতি, তুমি শরণাগতের অভয়-দাতা, তুমি ভবভীতের ভয়ত্রাতা, তুমি পাপী তাপীকে উপেক্ষা কর না,তুমি কাঙ্গালের বন্ধু—তুমি যথার্থ আর্ত্তজনার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তুমি যথার্থ বিপন্নের আহ্বান শ্রবণ কর। যে তোমাকে ঠিক ঠিক বলিতে পারে আমার আর কেহ নাই, আমার তুমিই আছ—তুমি আমাকে দেখা দাও, তাহার পূজা তুমি গ্রহণ কর, তাহার দুঃখ তুমি দূর কর।

বলিতেছিলাম শিবরাত্রির রাত্রি বড় প্রশস্ত সময়। যেমন রাত্রি যায় দিন আসে, এইসন্ধিকালে সন্ধ্যা বা সম্যক ধ্যান করিতে হয়, সেইরূপ শিব-রাত্রির রাত্রিও এক বৎসর যাইতেছে অন্য বৎসর আসিতেছে ইহার সন্ধি কাল। এই সন্ধিকালে পূজা সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। যিনি নিত্য, যিনি সর্ব্বগত, যিনি সূক্ষ্ম, যিনি সদানন্দ,যিনি জ্ঞানস্বরূপ,যিনি নির্ব্বিকার, যিনি সাক্ষী আর যিনি নিজশক্তি গ্রহণ করিয়া—শিবরাত্রি হইয়া—শিব শিবা হইয়া সকলের প্রভু জগন্ময় সর্ব্ব-কর্ত্তা, সর্ব্ব-ভোক্তা, সর্ব্ব-সংহর্ত্তা—সেই তিনিই—সেই পর-ব্রহ্মই শক্তিময় হইয়া জগদাকার ধারণ করিয়া জগতের নিয়ন্তা হইয়া জগৎ-বাসীর দুঃখ দূর করেন। ইনি যেমন নির্গুণ হইয়াও শক্তি জাগাইয়া সগুণ, ইনি সেইরূপ আত্মা হইয়াও ভক্তচিন্তানুসারে রূপ ধারণ করেন—অবতার হয়েন। শিব-পূজাতে চারিবর্ণেরই অধিকার আছে। 'নমো নমঃ' করিয়া হৃদয় গলাইয়া ভক্তি উৎ-কণ্ঠিত কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে এই "বামাঙ্গে দধতং" শিবচরণে নিপতিত হইয়া বলি এস—

"বিশ্বেশ্বর! বিরূপাক্ষ! বিশ্বরূপ! সদাশিব।
শরণং ভব ভূতেশ করুণাকর শঙ্কর॥
হর শম্ভো মহাদেব বিশ্বেশামরবল্লভ।
শিব শঙ্কর সর্ব্বাত্মন্ নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে॥

মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় শম্ভবে।
অমৃতেশায় সর্ব্বায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥"

আহা এই তুমিই—

"রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্মা সাত্ত্বিকেন স্বয়ং হরিঃ।
তামসেন স্বয়ং রুদ্রস্ত্রিতয়ং ত্বয়ি সংস্থিতম্ ॥
নমামি ত্বাং বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব নমোঽস্তু তে।
ত্রিনেত্রায়নমস্তুভ্যমুমাদেহার্দ্ধ ধারিণে ॥
ত্রিশূলধারিণে তুভ্যং ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
পিনাকিনে নমস্তুভ্যং মীঢ়ুষ্টমায় তে নমঃ ॥
নমামি ত্বাং মহাদেব পতয়ে ত্বাং নমাম্যহম্।
ভোক্তা ভোজ্যং ত্বমেবেহ ভক্তানাং শর্ম্মদঃ স্বয়ম্।
সূর্য্যরূপং সমাসাদ্য দেহিনাং দেহধারকঃ।
মুনীনাং মুক্তিদাতা চ ভক্তানাং ভক্তিদঃ স্বয়ম্ ॥
যদৃচ্ছয়া সর্ব্বমিদং ত্বামভ্যেতি চ যাতি চ।
নান্যস্য বিজয়ং দাতুং শক্তিরস্তি ত্বয়া বিনা ॥"

আহা! এই নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার তুমি—আর সকল অবতারও এই নির্গুণ, সগুণ আত্মা ও অবতার সমকালে। কাজেই সর্ব্বপ্রকার সাধকের ইষ্ট দেবতা এই একই তুমি। কাজেই বিরোধ কোথাও নাই। যাহাকেই পূজা কর, সেই একেরই পূজা সর্ব্বত্র। বেদ বলেন—

"যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্ ॥
যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্ ॥"

(রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ)

যাঁহারা গোবিন্দকে নমস্কার করেন, তাঁহারা শঙ্করকে নমস্কার করেন, যাঁহারা শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা শিবের উপাসনা করেন। যাঁহারা শিবকে দ্বেষ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে দ্বেষ করেন। যাঁহারা রুদ্রকে জানেন না, তাঁহারা কৃষ্ণকেও জানেন না।

উপরে যাহা লেখা হইল, সেইরূপ ভাবে অথবা যাঁহার সামর্থ আছে, তিনি আরও ভাল ভাবে হৃদয়কে কাতর করিয়া—এস এস আমরা যদি শিবপূজা পূর্ব্বে নাও করিয়া থাকি তবে এই শিবরাত্রির রাত্রিতে চারি প্রহরে শিব-শিবার পূজা করিয়া নিত্য এই শিবপূজা করি এস।

শিব পূজা করিতে করিতে ভাবনা করি এস—শিব সন্মুখেই শিবার সহিত আসিয়াছেন। অবোধ শিশু গোপনে যখন পিতার ছবি একা বসিয়া আঁকে তখন তাহার পিতা যে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আনন্দে ভরিত হয়েন আর বলেন, আহা এই বালক আমাকে বড়ই ভালবাসে, সেইরূপ তোমার গড়া এই শিবলিঙ্গের সন্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়া সেইরূপ আনন্দ করেন। এই খানেই শিব পার্ব্বতীর সহিত আসিয়াছেন—বিশেষভাবে ভাবনা কর। করিয়া বেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিব—এই সংকল্প প্রথমেই করিয়া লও।

প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা কর "মম সর্ব্বারিষ্টনিবৃত্তিপূর্ব্বক তথা পূর্ব্বজন্মনি কৃত ইহ জন্মনি অর্জ্জিত—কায়িক, বাচিক, মানসিক, সাংসর্গিক, জ্ঞাতাজ্ঞাত, মহাপাতক উপপাতকানাং, নানাব্যাধিরূপেণ পরিপচ্যমানানাং বিনাশার্থং ভগবতঃ শ্রীসদাশিবস্য প্রীত্যর্থং শিবপূজনমহং করিষ্যে।

"পাবনং সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরূপিণঃ।
অনুগৃহ্নন্তু মাং সদ্যো শিবপূজাখ্যকর্ম্মণি।"

হে পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা, হে ক্ষমার আধার, হে দয়ার সাগর, হে কাঙ্গালের আশ্রয়দাতা আমার সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত কর, আমার

পূর্ব্বজন্মকৃত, ইহজন্মে অর্জ্জিত, কায়িক, বাচিক, মানসিক জ্ঞাত অজ্ঞাত, মহাপাতক, উপপাতকাদি— যাহারা নানাবিধ ব্যধিরূপে আমাকে ক্লেশের উপর ক্লেশ দিতেছে—যাহারা আমাকে নানাবিধ মনের জ্বালায় জ্বালাইতেছে—যাহারা আকাকে তোমায় ভুলাইয়া তোমার চরণ হইতে দূরে আনিতেছে—সেই সমস্ত পাপ তাপ তুমি বিনাশ করিয়া দাও—তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে আমাকে ভক্তি দাও, আমি সেইজন্য তোমার প্রীতিলাভ জন্ম তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। কর না এই ভাবে প্রার্থনা। কর না এই ভাবে প্রাণ ভরিয়া পূজা। ঐ যে বলিতেছিলাম, সেই তোমার পূজার স্থানে দাঁড়াইয়া—এই মনে করিয়া পাঠ কর না—

"হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপানে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতি ভয়সূদন মামনাথং সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥"

এই স্তবটি সমস্ত পাঠ কর আর ধ্যান কর—

"বন্দে দেবমুপাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্য-শশাঙ্ক -বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥"

বিধিমত পূজা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর না—

"আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর॥"

কর এই সব; আপনিই বুঝিবে আশুতোষ তোমার প্রতি তুষ্ট হইতেছেন—তোমার দুঃখও দূর হইতেছে। (বঙ্গবাসী ৫।১১।৩৪)

শ্রীমতী রাধিকার বসন্ত বিলাপ

[মাথুর]

(বেহাগ মিশ্র—ঢিমে তেতালা)

ব্রজপুরে আওল মধুর বসন্ত।
বহল মলয়ানিল, ফুটল কুসুম কুল,
ছুটলহি পরিমল দিক দিগন্ত ॥
লুবধ ভ্রমরগণ, ধাওল কুসুম বন,
গাওল পঞ্চমে মদন-সামন্ত।
নবীন লতিকা কুল, বেঢ়ল তমাল মূল,
ধাওল কুলু কুলু যমুনা অশান্ত ॥
"কাঁহা পিয়া কাঁহা পিয়া," ঘন বোলে পাপিহা
হিয়া মঝু রোয়ত কাঁহা প্রাণকান্ত।
কাঁহা শ্যাম নটবর কাঁহা সো মুরলীধর
কাঁহা ব্রজ বধূজন নয়ন আনন্দ ॥
এ সুখ সময়ে সো-ই কাঁহা গেল ভাগই
বারেক না পাওব উরসক অন্ত।
খেদে কহে কাঙ্গালিনী আওব সো গুণমণি,
হাম চললু মথুরা কি পন্থ ॥

শ্রীশিব কৃষ্ণ রায়

সত্য দর্শন

(২)

মানবের অস্তিত্ব যেমন তাহার প্রাণে বা জীবনে আশ্রিত, এই বিশ্বের সত্ত্বাও তেমনি উহার প্রাণে বা জীবনে আশ্রিত। সেই সমষ্টি জীবন বা সম্পূর্ণ জীবনই—বিশ্বপ্রাণই বিশ্বাধার। তিনি বিরাট অর্থাৎ চরাচর জগৎপ্রকাশক বা 'অ'; তিনি হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সকলের আদি ও উৎপত্তিস্থান এবং আশ্রয়স্বরূপ বা 'উ'; এবং তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিস্বরূপ বা 'ম'। বেদ এইজন্য 'অ+উ+ম' বা প্রণব নামে তাঁহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

নাম।

মানবপ্রাণ এবং মানব, বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্ব, সত্ত্বা বা অস্তিত্ব এবং তাহার প্রকাশ, অথবা বিষয় এবং আশ্রয়, একই বস্তু হইলেও আমরা দুইভাবে সেই একেকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা মানব দেখিয়া বা মানবের কর্ম্ম দেখিয়াই মানবপ্রাণের ধারণা করি, প্রকাশ দেখিয়া তবে বস্তুর সত্ত্বা বুঝিয়া থাকি। সুতরাং সম্যক্‌রূপে উপলব্ধির জন্য আমাদিগকে আপাততঃ একই বস্তুর এই দুই ভাবকে লইতে হইবে,—প্রকাশের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকাশ স্থূল ও সূক্ষ্ম বা ভাব, দুইপ্রকারে হইয়া থাকে।

বিষয় ও আশ্রয়।

বিশ্বাধার এক, কিন্তু বিশ্বরূপে বহু। বিশ্ব বহু ব্যষ্টির সমষ্টি। বহু ব্যষ্টিই বহু অংশ। প্রত্যেক মানবই বিশ্বের এক একটি অংশ, এ সংবাদ আমরা মানবের চাঞ্চল্যের মধ্যেই পাইয়াছি। আমি, তুমি, তিনি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান,—সকলেই বিশ্বের অংশ। কিন্তু আমরা কি আপনাদিগকে অংশরূপে বোধ করিয়া থাকি? না; আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ

স্বাতন্ত্র্যই বহুত্বসাধক।

বোধ করিয়া থাকি। ইহার কারণই বহুত্ব। অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়াই বিশ্বের বহুত্ব সিদ্ধ করিতেছে। এককে বহু হইতে হইলেই, উহার অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র হইতে হইবে। তাই প্রত্যেক মানব বিভিন্নাংশ, সুতরাং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। অংশের এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য আমরা উদ্ভিদ জগতের দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

কোন বৃক্ষ বা লতার সমগ্র প্রকাশ সূক্ষ্মভাবে একটি বীজের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। বীজ প্রকাশোন্মুখী হইলেই অঙ্কুরিত হয়, এবং ক্রমে উহার সমগ্র মূর্তিটিকে বিকশিত করিয়া থাকে, ফলফুলসমন্বিত একটি বৃক্ষ বা লতারূপে পরিণত হইয়া থাকে। একটি কুষ্মাণ্ডলতার উদাহরণ লওয়া যাউক। একটিমাত্র বীজই একটি বহু-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত লতারূপে পরিণত হইয়া বহু ফল-ফুলে শোভিত আপনার সম্পূর্ণ প্রকাশটি বিকশিত করিল। উহার প্রত্যেক ফলটিই উহার অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত প্রত্যেক ফলের মধ্যস্থিত বহু বীজগুলিও এক একটি ক্ষুদ্র অংশ। এখন ঐ লতাটির এক অংশ যে একটি কুষ্মাণ্ড ফল, তাহার মধ্যস্থিত বহু বীজের প্রত্যেকটি মূল লতার, সুতরাং মূল বীজের অংশের অংশ বা এক একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। ওই বীজগুলিকে মাঠে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া দিলে উহার প্রত্যেক বীজ হইতে বা মূল লতার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশ হইতে এক একটি স্বতন্ত্র লতার উদ্ভব হইবে। এই স্বতন্ত্র লতাগুলির প্রত্যেকেই আবার মূল লতার এক একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ, অথচ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এখন এই অংশ লতার এক একটির গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা হইতে আবার বহু অংশাংশ বীজের উৎপত্তি, এবং সেই অংশাংশ বহু বীজ হইতে কালে অংশাংশ বহু স্বতন্ত্র লতারও উৎপত্তি হইতেছে। এইভাবে যত অগ্রসর হওয়া যায়, দেখা যায়, একটি বীজ

বহু স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র অংশ আবার বহু স্বতন্ত্র অংশাংশে বিভক্ত হইল। এমনিভাবেই এক বহু হইয়াছে, এখনও হইতেছে, চিরকাল সৃষ্টিস্রোত এই প্রকারেই বহিতেছে। মানবজগতেও সৃষ্টিস্রোত এইভাবেই প্রবহমান।

কুম্ড়াওলতার দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতেছি কেমন করিয়া প্রত্যেক স্বতন্ত্র অংশ আবার বহু স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হইতেছে, এবং প্রত্যেক অংশই বিশ্বের এই বহুত্বমুখী বা বহির্মুখী গতির সহায়করূপে বর্ত্তমান। এ বিশ্বে একভাবে কেহই থাকিতে পারে না, এককে বহু হইয়াই থাকিতে হয়, ইহাই বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। আমরা যে প্রত্যেক স্বতন্ত্র লতার ফুল, ফল এবং অঙ্কুরের বীজরূপে বিকশিত হওয়ার পর অন্তর্দ্ধান বা মরিয়া যাওয়া দেখি, উহাই একের বহুত্বে বিলীন হওয়া, অর্থাৎ একরূপে না থাকিয়া বহুরূপে বর্ত্তমান হওয়া। যতদিন একের বহির্মুখীভাব প্রবল থাকে, ততদিন সে বহু প্রসব করিতে থাকে; ঐ বহির্মুখীভাব বা বিশ্বশক্তি তাহা হইতে অন্তর্হিত হইলেই তাহার একভাবে বিকাশের অন্তর্দ্ধান ঘটে, এবং সে বহুরূপেই বর্ত্তমান হয়।

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা আর একটি চিত্রও দেখিতে পাই। সকল বীজেই গাছ হয় না, কোন কোন বীজ,—যদিও তাহার সংখ্যা খুবই কম,—আদৌ অঙ্কুরিত হয় না; কোনটি বা অঙ্কুরিত হইয়াও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না; এবং কাহারও বিকাশের সীমা পুষ্পশোভা পর্য্যন্ত, সে আর ফল ধারণ করে না, নূতন বীজরূপে আপনাকে আর বহু বিভক্ত করে না। যথাসময়ে এই চিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

প্রত্যেক মানবই একটী স্বতন্ত্র, সুতরাং বিভিন্ন অংশে, একথা আমরা বুঝিয়াছি। এই বিভিন্নাংশত্বই প্রত্যেক মানবের সত্ত্বা বা স্বরূপ। প্রত্যেক

মানব তাই মূল সত্তার বা অংশীর বা সম্পূর্ণ সত্তার সহিত অংশাংশিভাবে অভেদ হইয়াও প্রকাশে বিভিন্ন, অর্থাৎ প্রত্যেক মানবই এক সত্যের ভেদাভেদ প্রকাশ। এই ভেদাভেদ প্রকাশ সম্পূর্ণ সত্তার ইচ্ছাধীন, কোন অংশের বা মানবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন নহে; তাই ইহা মানবের খণ্ড চিন্তার অতীত তত্ত্ব, এবং সেইজন্যই ইহাকে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব' বলা হইয়া থাকে। সেই সম্পূর্ণ সত্তাই সচ্চিদানন্দ, মানব সচ্চিদানন্দেরই ভেদাভেদ প্রকাশ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি বস্তুকে বিষয় এবং আশ্রয় এই দুইটী ভাবের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করা হইয়া থাকে। সত্তাই উহার বিষয় এবং আশ্রয়েই উহার প্রকাশ। সত্তা বা বিষয়ই প্রকৃত এবং আশ্রয়ই প্রকৃতি। সত্তাই পুমংশ বা পুরুষ এবং আশ্রয়ই স্ত্রীঅংশ বা স্ত্রী। বহির্মুখ সত্তাই পিতৃত্ব এবং বহির্মুখ আশ্রয়ই মাতৃত্ব; এতদুভয়ের সহায়তায় সৃষ্টিস্রোত প্রবাহিত, এতদুভয়ই বহুত্বের মূল, সুতরাং বিশ্বমূল। বিশ্বমাতা মহামায়াই বিশ্বের আশ্রয়, মহামায়া হইতেই বিশ্বের বহুত্বের উৎপত্তি, এবং বিশ্বপিতা বিরাট পুরুষই বিশ্বের বিষয়। এই পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বরূপী বিষয় এবং আশ্রয়ের মধ্য দিয়া, অর্থাৎ এই দুইটী কুলের মধ্য দিয়া সৃষ্টির বিভিন্ন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন পিতা-মাতা, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম,—আর নূতন সৃষ্টি করেন না। যথাকালে এই চিত্রের বর্ণনা করা হইবে, আপাততঃ শুধু দিক্‌দর্শন করা থাকিল।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব।

মানব বিভিন্নাংশ হইলেও তাহাতে অংশত্ব অপেক্ষা বিভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যই পরিস্ফুট। তাই মানব অপূর্ণ হইয়াও আপনাকে পূর্ণ বোধ করে,

নিজ অপূর্ণতা ধরিতে পারে না—অভাব ধরিতে পারে না। মহামায়াশ্রয়ে মানবের এই স্বাতন্ত্র্য উপস্থিত হইয়াছে; যাহা নহে তাহা বোধ করানই মায়ার কার্য্য; মানব স্বতন্ত্র না হইয়াও মায়াধীনতাবশতঃ আপনাতে এই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ দেখে; এবং তাই নিজ অভাব ধরিতে পারে না, ইহাই মানবের অবিদ্যা কিন্তু যখন সে বাস্তবিক অসম্পূর্ণ, তখন সে আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রযুক্ত আপনাকে যতই কেন সম্পূর্ণ বোধ করুক না,—তাহার অভাব থাকিবেই, তাহার চাঞ্চল্য থাকিবেই। প্রত্যেক মানব তাই ভোগের জন্য,—নিজ অভাব পূর্ত্তির জন্য, চঞ্চল হইয়া আপনার অজ্ঞাত অভাব মিটাইতে চাহে এবং বহু বাসনার সৃষ্টি করে।

মায়া।

মানবের সামান্য ধর্ম্ম এই বাসনা পূর্ত্তি লইয়া। তাহার বাসনাও বহু, বাসনা পূর্ত্তির চেষ্টাও বহু, এবং তাহার সামান্য ধর্ম্মও তাই বহুত্ব বিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্নতাময়। মানব ভাবে সকলেই সতন্ত্র বা স্ব স্ব প্রধান। তাহার পূর্ণতা সাধনও তাই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারূপে বিকশিত। আপনাপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই মানব মাত্রেরই লক্ষ্য, সেই পথে ক্রমাগত বিভিন্ন বাসনা পূর্ত্তিই প্রত্যেক মানবের সাধনা। একের স্বার্থের সম্পূর্ণতা সাধনায় অপরের স্বার্থের হীনতা সাধন করিতে যাইয়া মানবে মানবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে,—কেবলই হিংসা দ্বেষাদি বিষোদ্গারণ করিতেছে, এই ভাবেই সামান্য ধর্ম্ম বহু হইয়া জগতে বর্ত্তমান। কোন বিশেষ স্বার্থ সাধনায় একজনের উন্নতি দেখিয়া ওই প্রকার স্বার্থ সাধনা নিরত অপর জনের উক্ত একজনের সহিত যোগদান এবং এইরূপে দলপুষ্টি; উৎকৃষ্টতর ভোগের আশায় নিকৃষ্টতর ভোগের ত্যাগ; প্রবল জীব মানবের সাধনা সিদ্ধির জন্য কোন দুর্ব্বল জীব বিশেষের জীবন বলিদান, একজনের বা এক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রক্ষা কল্পে অপর জনের বা অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশের চেষ্টা, ইত্যাদি কতইনা বিরোধ জনক অঙ্গ সামান্য

সামান্য ধর্ম্ম।

ধর্ম্মে আছে, তাহার পরিচয় আমরা সাধারণ মানব জগতে প্রচলিত বহু ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া পাইতে পারি। ফলাকাঙ্খা সংযুক্ত ভোগ বাসনা তৃপ্তির জন্য প্রার্থনাদিতে পরিপূর্ণ সামান্য ধর্ম্মও মানবের বৈশিষ্ট্য স্বরূপে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তবে বিভিন্নতাময় বহির্মুখ বিশ্বের বিশিষ্টতা পোষক বলিয়া এই বহির্মুখী সামান্য ধর্ম্ম চিরকাল জগতে ছিল, আছে এবং থকিবেও। ইহা ধর্ম্ম হইলেও চরম বা পরম ধর্ম্ম নহে।

বিশেষ ধর্ম্ম বিশ্বাধারের সহিত বিশ্বের, বা সচ্চিদানন্দের সহিত জীব জগতের সম্বন্ধ বা আকর্ষণ। যদিও বিশ্বে বিভিন্নতা বর্ত্তমান, তথাপি বিশ্বাধার এক সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বা আকর্ষণ যেন একটি বৃত্তের পরিধিস্থিত বহু বিন্দুর উহার একমাত্র কেন্দ্রের সহিত আকর্ষণ। ঐ একমাত্র কেন্দ্রকে স্থির রাখিয়া প্রথমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত উহার বাহিরে আর একটি বৃহত্তর বৃত্ত, এমনি ভাবে বহু বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে,

বিশেষ ধর্ম্ম।

যাহাদের প্রত্যেকের কেন্দ্র ওই একটি মাত্র বিন্দুই হইবে। উহাদের মধ্যে সকল বৃত্তের পরিধি বৃহত্তম বৃত্তের অন্তর্গত হইবে। এখন ওই বৃহত্তম বৃত্তকে বিকশিত বিশ্ব রূপে গ্রহণ, এবং উহার অন্তর্গত এক একটি পরিধি বিশ্বের অন্তর্নিহিত এক একটি ভাবান্তর রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং সকল বৃত্তের একমাত্র কেন্দ্রকেই বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বাধার বা সচ্চিদানন্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রই পরিধিস্থিত সকল বিন্দুকে আকর্ষণ করতঃ বৃত্তটিকে ধারণ করিয়া রহে বলিয়া উহাকে 'আধার' নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা 'আধার'কে তদাশ্রিত 'আধেয়' অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর কল্পনা করিয়া থাকি, কারণ, আমরা সাধারণতঃ আকার দেখিয়াই বস্তুর ধারণা করি। যদি বস্তুর শক্তিকে লইয়া উহার পরিমান স্থির করিতে চেষ্টা

করি, তাহা হইলে দেখিব প্রত্যেক বস্তুই উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তিতে ধৃত বা আশ্রিত হয়, এবং উহার কেন্দ্রই সেই শক্তির মূল স্বরূপে উহাকে ধারণ করিয়া রহে বলিয়া উহার 'আধার' রূপে বর্ত্তমান। সুতরাং বিশ্বকেন্দ্রই বিশ্বাধার; এবং উহার সহিত বিশ্বস্থিত যাবতীয় বস্তুরূপ বিন্দুর আকর্ষণ উক্ত বস্তুগুলির অবস্থান অনুসারে,—যে স্তরে উহারা স্থিত হয়, তদনুসারে সমান।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রাম দাস বাবাজী মহাশয়ের

কীর্ত্তনের তালিকা।

১৩৩৪সাল২৩এ ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৬এ শনিবার রাজসাহি।

২৭এ ফাল্গুন রবিবার হালিসহর

২৮এ ,, সোমবার হইতে ৩রা চৈত্র শুক্রবার পর্য্যন্ত ইস্‌লামপুর

৪ঠা চৈত্র হইতে ৬ই চৈত্র কোঁড়ার বাগান, ভাগবতাশ্রম, হাওড়া।

৬ই ,, বৈকালে বরাহ নগর, শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী।

৭ই ,, মঙ্গলবার উত্তর পাড়া

৮ই ,, হইতে ১২ই চৈত্র—খড়দহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির

১৩ ,, ,, ১৫ই ,, বেনাপোল

১৬ই ,, বৃহস্পতিবার গোবরডাঙ্গা

১৭ই ,, হইতে ২০শে চৈত্র সিঙ্গুর

২১এ ,, মঙ্গলবার সিনামন্

২২শে ,, বুধবার সেওড়াফুলী

২৩এ চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে ২৫এ চৈত্র শনিবার ভবানীপুর

২৫এ বৈকাল ও ২৬এ সকাল চাতরা শ্রীরামপুর

২৬এ চৈত্র বৈকাল হইতে ২৮এ কুমারটুলী

২৯এ চৈত্র হইতে ১৮ই বৈশাখ শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

১৯এ বৈশাখ বুধবার জাঙ্গিপারা, কৃষ্ণনগর

২০এ ,, হইতে ২২এ জঙ্গলপাড়া

২৩এ ,, হইতে ২৫এ কুর্চি

২৬এ ,, হইতে ২৮এ আঁটপুর (অনুকুল দাদা)

২৮এ রাত্র ও ২৯এ সকাল আঁটপুর পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের পাট

২৯এ রাত্র হইতে ৩রা জৈষ্ঠ সকাল পাইতাল

৩রা জ্যৈষ্ঠ বৈকাল হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ গোঘাট (জাহানাবাদ)

৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ কোতলপুর

১১ই ,, শুক্রবার বিষ্ণুপুর

১২ই ,, শনিবার বাঁকুড়া

১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ই চন্দ্রকোণা

১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পানিহাটী (দণ্ড মহোৎসব)

১৯এ ,, হইতে ২২এ জ্যৈষ্ঠ বসন্তপুর (আমতা)

২৪এ ,, বৃহস্পতিবার হইতে ২৬এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার আন্দুল, ঝোড়হাট

৩০এ ,, হইতে ১লা আষাঢ় শালিখা

১লা আষাঢ় শুক্রবার রাত্রে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম পুরী যাত্রা।

রথযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার স্থিরতা নাই, তাই তাহার পর যে ব্যবস্থা হয় তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

ষড়রিপু।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ঘোষ ই, এম, ডি, লিখিত)

সংসার সাগর হয় অকুল পাথার।
ষড়রিপু তার মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।
এই ছয় রিপু করে মানবে অধৈর্য্য॥
কামের প্রভাবে নরে করে কুকরম।
গুরু লঘু নাহি মানে না রহে সরম॥
ক্রোধের জ্বালায় সবে জ্বালায় সংসার।
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হাঙ্গর আকার॥
লোভাবর্ত্তে পড়ি নরে সঞ্চে' পাপ রাশি।
আশা স্রোতে পড়ি নর সদা যায় ভাসি॥
মোহ৷ গর্ত্তে যেই জন হয় নিমগন।
মায়া সূত্রে বাঁধা থাকে না তরে কখন॥
মদ কাল কূট যার দেহে বিদ্যমান।
মাৎসর্য্য ভুজঙ্গ তরে করয়ে দংশন॥
ষড়রিপু, ভয়ঙ্কর জন্তু আছে দেহে।
তরিতে এদের হাত ফণীন্দ্র যে কহে॥
বিবেক স্রোতেতে পড়ে' দাও গো সাঁতার।
বৈরাগ্য আশ্রয় ল'য়ে ঝুলি কর সার॥
সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কর উচ্চারণ।
সর্ব্বজীবে যেই জেন স্থিতি সর্ব্বক্ষণ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

ভক্তি

চৈত্র
১৩৩৪

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা-গীতি।

যদি, রূপ্‌খানিকে লুকিয়ে রেখে
অরূপ হ'য়ে থাক্‌বে হরি।
তবে, চোখের মাঝে রূপের নেশা,
প্রাণের পরে এমন তৃষা,
কেন জাগালে হে বংশীধারি॥
রূপের তরে আজ মন মেতেছে,
আর কি হরি রইতে পারি?

ডুব্‌দেব আজ রূপ সাগরে,
প্রাণ ভরে পান কর্‌ব ওরে
বিশ্বে আছে যত রূপের বারি ॥
আজি, রূপের মাঝে দাওগো ধরা
ওগো আমার অরূপ-ধারি !
যে রূপে, মন মেতে যায় ভালবেসে,
আজ, সেই রূপেতে দাঁড়াও হেসে,
(আমি) মোহের ধার আর কি ধারি ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থে

(৪)

আজ ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে সমুদ্রের গর্ভে সূর্য্যোদয় দর্শন করিবার আশায়, সমুদ্রের দিকে ছুটিলাম। কিন্তু নৈরাশ্যের সহিত দেখিলাম যে, যে সুবিস্তৃত জলাশয়কে দূর হইতে সমুদ্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা সমুদ্র নহে; সমুদ্রের একটী অপ্রশস্ত অগভীর অংশ অর্থাৎ "খাড়ি" মাত্র। উহার জল তরঙ্গহীন, নিশ্চল, নিস্তব্ধ। সুতরাং বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তদনন্তর স্নানাদি করিয়া—পুনরায় ৺ রামেশ্বরদেব দর্শনে বহির্গত হইলাম। পথি-মধ্যে গণ্টুর নিবাসী পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণ মহোদয়কে দেখিতে পাইলাম।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোন্ দিকে যাইতেছেন?" তিনি কহিলেন—"লক্ষ্মণ কুণ্ডে যাইব।" আমি কহিলাম—"তথায় স্নান করিবেন কি?" তিনি উত্তর দিলেন আমি এক বিন্দু জল মস্তকে দিব মাত্র। আমার আর সে দিকে যাইতে ইচ্ছা হইল না, বরাবর মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলাম। পথিমধ্যে ৺ রামেশ্বরদেবের জন্য ফুলের মালা, একটী ডাব এবং গঙ্গা জল দিবার জন্য একটী নূতন পিতলের ঘটী ক্রয় করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পূজারী ব্রাহ্মণেরা কহিলেন —৺রামেশ্বর দেবকে গঙ্গা জল দিতে হইলে দুইটাকা প্রদান করিয়া পাস লইয়া আসুন। আমি কহিলাম—"আমার পাসে প্রয়োজন নাই। ৺ বাবার পূজার জন্য এক টাকা প্রদান করিতেছি এবং অপনাদের দাক্ষিণ্য স্বরূপ কিছু দিতেছি। আমাদের প্রদত্ত মালা, ডাব, গঙ্গাজল ৺বাবার পূজায় অন্য কোন সময় ব্যবহার করিবেন। পূজারী মহাশয়, আমাদের সাক্ষাতেই আমাদের মালা ৺ বাবাকে পরাইয়া দিলেন। আমাদের প্রদত্ত টাকাটী ৺ বাবাকে নিবেদন করিয়া—লৌহসিন্ধুকে নিক্ষেপ করিলেন; আর কহিলেন "গঙ্গাজল কোন সময় ৺ বাবারপূজার জন্য ব্যবহার করিব আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মাতা ৺রামেশ্বরী দেবীর যথাযোগ্য পূজা প্রদান করিলাম। তৎপরে মন্দিরের নানা অংশ দর্শন করিয়া কতকগুলি ফটো, চিত্রপট, পুতুল প্রভৃতি ক্রয় করিলাম। বাসায় ফিরিবার পথে কচি তাল খরিদ করিলাম। তাহাও সস্তা নহে। এক পয়সায় ৩।৪ খানি মাত্র। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদির উদ্যোগ হইল। আহারান্তে আসিয়া ট্রেনযোগে ধনুষ্কোটী তীর্থ সন্দর্শনে চলিলাম। বালুকাময় পথের মধ্য দিয়া আমাদের ট্রেণ চলিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা ধনুষ্কোটী ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। কিন্তু এখান হইতে সমুদ্র অন্ততঃ একক্রোশ দূরে। তখন বেলা ২টা, প্রচণ্ড রৌদ্র।

আমরা পাদুকাহীন। সেই বালুকাময় স্থানে শূন্য পদে হাঁটিয়া যাওয়া কষ্টকর বলিয়া এবং স্ত্রীলোকেরা ছিলেন বলিয়া অগত্যা দুই খানি গরুর গাড়ী ভাড়া করা হইল। প্রত্যেক খানির ভাড়া যাতায়াতে দুই টাকা। আমরা গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আমাদের শকট চালক একটী অল্পবয়স্ক বালক। তাহার ভাষা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে মধ্যে মধ্যে বলদদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—'যা' 'যা'। এই 'যা' 'যা' শব্দ আমরাও ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং এ কিরূপ ভাষা, ভাষা তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারিবেন। যাহা হউক ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গাড়ী সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। বালুকা ক্ষেত্রে এমন প্রবল ভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যিনি যিনি হাঁটিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা কিছুতেই ছাতা খুলিয়া রাখিতে পারেন নাই। সমুদ্রতীরের দৃশ্য অপূর্ব্ব। নীল মহোদধির তরঙ্গ বিভঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইতে হয়, বিশেষতঃ সম্মুখে সুপ্রসিদ্ধ Adam's Birdge বা Palk strait পাক্ প্রণালী। শুনা যায়, এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের-অনুরোধে স্বকৃত সেতু, ধনুর সাহায্যে ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। Adam's Bidge এর অবস্থা দেখিয়া উহাকে ভগ্নসেতু বলিয়াই মনে হয়। এই সমুদ্র তত গভীর নহে তথাপি গভর্ণমেণ্ট একখানি সাইনবোর্ডে লিখিয়া দিয়াছেন, "কেহ তিন ফিটের অধিক গভীর জলে নামিতে পারিবে না"।

এই ধনুষ্কোটীতে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি দানাদি করিয়া থাকেন। আমি সমুদ্রজল মস্তকে ধারণ করিয়া সমুদ্রতটে মনে মনে পিতৃতর্পণ করিলাম। যাহা হউক বহুক্ষণ সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন এবং শ্রীভগবানের বিশ্বলীলা চিন্তা করিয়া আমরা ট্রেণে ফিরিয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইলাম। অদূরে এক

খানি খেয়া ষ্টীমার যাত্রীদিগকে লঙ্কাদ্বীপে লইয়া যাইতেছে। শুনিলাম এখান হইতে ষ্টীমারযোগে লঙ্কাগমন করিতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে। তবে লঙ্কাগমনে অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ Quarantine দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক যাত্রীকে Customs Houseএ ৬০৲ টাকা জমা দিতে হয়। নিঃসম্বল ব্যক্তি ও ভিক্ষুকের পক্ষে লঙ্কা প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা গো-শকটে আরোহণ করিয়া যথাসময়ে ধনুষ্কোটী ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা ৺রামেশ্বর ক্ষেত্রে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেদিন বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম সুতরাং আর দেবদর্শনে যাওয়া ঘটিল না। আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইলাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার আমাদের ৺রামেশ্বর ত্যাগ করিবার কথা। তাই তাড়াতাড়ি শৌচ-স্নানাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া, বেলা ৯টার মধ্যে আহারাদিও সমাপন করা হইল। আহারান্তে একবার আমরা ৺রামেশ্বর দেবকে দর্শনার্থ গমন করিলাম। এবার আমরা ৺বাবার নগ্ন মূর্ত্তি সুস্পষ্ট ভাবে দর্শন করিতে পাইলাম। দেখিলাম ১০৮টি সুবৃহৎ পিত্তল কলসীর জলে ৺বাবার স্নান বা অভিষেক হইতেছে। মন্দিরের নিকটেই বাঁধান কূপ। সেই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া পূজারিরা ৺বাবার মস্তকে ঢালিতেছেন। ৺বাবার এই স্নান-যাত্রা মহোৎসব দর্শন করিয়া আমরা পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর পূজারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম মৎপ্রদত্ত গঙ্গাজল ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না। তিনি আমাদের চিনিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন—"হাঁ, হইয়াছিল।" আমাদের প্রদত্ত যৎসামান্য গঙ্গাজল ৺বাবার কার্য্যে লাগিয়াছিল শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। এই সময় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা গঙ্গার দেশে বাস করিলেও আগমন কালে গঙ্গোদক সঙ্গে আনয়ন করিতে বিস্মৃত

হইয়াছিলাম। সহযাত্রী রায় সাহেব হরিদাস গোস্বামি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের আনীত গঙ্গাজল আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক মনে মনে ৬বাবার শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা মাতা ৬রামেশ্বরী দেবীকেও পুনরায় দর্শন করিলাম এবং তাঁহার দ্বারদেশে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে একটি এদেশীয় পিত্তলের করঙ্গ ক্রয় করিলেন। এই করঙ্গের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গেলাস আছে এবং করঙ্গের মুখ স্ক্রু সাহায্যে আবদ্ধ। করঙ্গটি বেশ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। নানা আকারের করঙ্গ পাওয়া যায়। কিন্তু এটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া মূল্য ১।৵০ মাত্র।

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পাণ্ডা মহাশয় "সুফল" দিতে আসিলেন। আমি এক টাকা মাত্র প্রদান করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলে তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাহার কোন কর্ম্মচারী তাঁহাদের সুবৃহৎ খাতায় আমাদের নাম ধাম ইতঃপূর্ব্বেই লিখিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা ৬রামেশ্বর তীর্থকে মনে মনে প্রণাম করিয়া এইবার বাসা ত্যাগ করিলাম এবং ষ্টেসনে উপনীত হইয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় আমরা ট্রেণে উঠিয়া মাদুরা অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বেলা ৪-৩০ টার সময় ট্রেণ মাদুরা পৌঁছিল। আমরা সকলেই মাদুরায় অবতরণ করিয়া District Boardএর পরিচালিত ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে এক আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হইল। তাহার পর একটি ব্রাহ্মণ পরিচালকের সমভিব্যাহারে মন্দিরাদি দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। মাদুরার ৬মীনাক্ষী দেবীর যে মন্দির দেখিলাম তাহাও স্থপত্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন। মন্দিরের বর্ণনা করা অসম্ভব। শুনিয়াছি এরূপ

সুন্দর, প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। এখানকার দেবতা সুন্দরেশ্বর স্বামী (শিবলিঙ্গ) এবং মীনাক্ষী দেবী। এই মন্দিরের ৯টি গোপুর। তন্মধ্যে প্রধান গোপুর ১৫২ ফিট উচ্চ। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বিঘ্নবিনাশন গণেশজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। ইহার পর আমরা সুন্দরলিঙ্গ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। দেবতার সম্মুখে স্বর্ণস্তম্ভ বা সোণার তালগাছ (flag staff)। তৎপরে আমরা মীনাক্ষী দেবীকে সন্দর্শন করিলাম। ৺রামেশ্বরী দেবী যেরূপ দেখিতে, এই দেবী মূর্ত্তিও প্রায় তদ্রূপ। দেবীর গাত্রে নানাবিধ হীরা-মুক্তা জড়িত অলঙ্কার। দেবীর সম্মুখেও সোণার তালগাছ। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের চূড়া সমস্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত। দেবীকে দর্শন করিয়া আমরা এক স্থানে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী দর্শন করিলাম। তাহার দন্ত, চক্ষু ও প্রত্যেক সংযোগস্থল স্বর্ণ নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন দেবীর আরও কত বৈভব তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবালয় দর্শন করিয়া আমরা তিরুমল নায়কের রাজ-ভবন দর্শন করিতে গমন করিলাম। রাজভবনটি অতি সুন্দর এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ দ্বারা পরিশোভিত। অধুনা এই সুদৃশ্য রাজভবন ইংরাজ বাহাদুরের আদালত রূপে পরিণত।

মাদুরার বাজারও বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। এখানকার অধিবাসিগণ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। স্ত্রীলোকদিগের কর্ণের ছিদ্র অতি বৃহৎ। তাহারা কাঁচুলি ব্যবহার করে। মাদুরা, জেলার প্রধান নগর। শুনিলাম এখানকার District Magistrate ও collector একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ। শীত ঋতু নাই বলিলেও চলে। তবে বর্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বাসায় আসিয়া খিচুরী পাকের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। আমি হাত মুখ

ধুইয়া বাসার প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রহিলাম। গ্রীষ্ম কাল, মস্তকের উপর অনন্ত আকাশ। স্বগৃহে ছাদের উপর শয়ন করিয়া যেমন একদৃষ্টিতে নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বলিত নীল নভোমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি কত গভীর বিষয়ে চিন্তানিমগ্ন থাকিতাম, এখানেও সেইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই সুদূর বিদেশেও সেই একই চন্দ্র ও একই অসীম আকাশ সন্দর্শন করিতেছি মনে করিয়া মন কেমন এক প্রকার বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইল। আর One touch of nature makes the whole world kin—অর্থাৎ মনুষ্য প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান এবং আমরা সকলেই একই সূত্রে আবদ্ধ এই তত্ত্ব মনে জাগিয়া প্রাণটাকে বড়ই উদার ও বিশাল করিয়া দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতে আমার কেহ পর নাই—সকলেই আমার ভাই। অথবা আমরা সকলেই সেই ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিবিম্ব। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই কথাটা যেন বেশ বুঝিলাম। এমন সময় ডাক পড়িল, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে। আহার করিয়া আসিয়া দেখিলাম সেই বেঞ্চের উপর আর এক ব্যক্তি অর্দ্ধ শয়ানভাবে উপবিষ্ট রহিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্য রচিত অন্নপূর্ণা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। আমি তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া সেই স্তব শুনিতে লাগিলাম। স্তব শেষ হইলে তাঁহাকে ইংরাজিতে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি ইংরাজি বুঝিতে পারিলেন না। হয়ত সংস্কৃত বুঝিতেন। কিন্তু আমাদের শীঘ্রই মাদুরা ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আর আলাপ করা হইল না।

মাদুরার বাসা ত্যাগ করিয়া আমরা মাদুরা ষ্টেসনে আসিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম রাত্র ১টার সময় ট্রেণ আসিবে। অধিক রাত্রিতে বাসা হইতে দ্রব্যাদি আনিবার জন্য মুটে মিলিবে না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাসা ত্যাগ করিলাম, নতুবা বাসায় ২।৩ ঘণ্টা বিশ্রাম

করা যাইত। যাহা হউক এই স্থানে বসিয়া নানা প্রকার লোক দেখিতে লাগিলাম। নিয়ত 'চা' ও 'কফি' হাঁকিয়া যাইতেছে। আমি 'কফি'র কথা শৈশবকাল হইতে পাঠ করিলেও জীবনে কখন 'কফি' খাই নাই। সাহস করিয়া এক পেয়ালা গরম 'কফি' পান করিলাম। দেখিলাম 'কফি' বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা উচ্চস্থান হইতে নিম্নের গ্লাসে কফি ঢালিয়া দিল। এরূপ না করিলে বোধ হয় জল মিশ্রিত 'কফি' ভাল মিশ্রিত হয় না। যাহা হউক 'কফি' আস্বাদন করিয়া দেখিলাম উহার স্বাদ প্রায় 'চা'র মতই। একটু বিশেষরূপ গন্ধ আছে। 'কফি' পান করিয়া কোনরূপ নেশা হয় না।

ক্রমে রাত্রি একটার সময় ট্রেণে উঠিলাম। সারা রাত্রি নিদ্রা নাই। আমি জাগিয়া বসিয়া আছি। এক স্থানে একটী মাঠের মধ্য হইতে একজন নগ্নপ্রায় অসভ্য মানুষ হঠাৎ আমাদের চলন্ত গাড়ীর দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল। আমাকে জাগ্রৎ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া, সে ব্যক্তি ট্রেণের প্লাট্‌ফরম্ দিয়া দ্রুতপদে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। মনে হইল, তাহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে বেলা প্রায় ৮টার সময় আমরা ত্রিচনপল্লী ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। সেখানে নামিয়া আমরা ষ্টেসনে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ত্রিচনপল্লী ফোর্ট ষ্টেসনে যাইবার জন্ম স্বতন্ত্র গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। বেলা প্রায় ৯৷৹টার সময় আমরা ত্রিচনপল্লী ফোর্ট ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। নিকটেই একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা, আমরা তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ফোট ষ্টেসন হইতে দুই আনা মূল্যে একখানি "Hindu" সংবাদ পত্র রিদ করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পূর্ব্বে Hindu সংবাদ পত্রেই জানিয়াছিলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষার

ফল বাহির হইয়াছে। এবং উক্ত পরীক্ষায় শতকরা প্রায় ৫৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ কয়েক দিবসের মধ্যে দেশের আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। সেজন্য কোন উৎকণ্ঠাও ছিল না। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতেই বিভোর হইয়াছিলাম। তথাপি দেশের কথা শুনিবার জন্য ও জানিবার জন্য প্রাণে একটা প্রচ্ছন্ন লালসা থাকে। এবারকার হিন্দু পত্রিকাতে দেখিলাম শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বাসায় আসিয়া অবগত হইলাম নিকটে কাবেরী নদী। তখন প্রায় ১০॥০টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্র। এজন্য যাতায়াত আট আনায় একখানি গোযান ভাড়া করিয়া আমরা স্নানার্থ বহির্গত হইলাম। সহর দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমরা কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইলাম। নদীতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, নদী বড় খরস্রোতা। স্থির হইয়া স্নান করিবার যো নাই। অনেক বার ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে হইল। যাহা হউক কোনরূপে স্নান সমাপন করিয়া তীরে বসিয়া তর্পণাদি করিলাম। বাসায় ফিরিতে বেলা ১২।৩০টা বাজিয়া গেল। ইটের উনানে আহার্য্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে ভাতের হাঁড়ীতে আদৌ জ্বাল পাইল না। সমস্ত অগ্নি বহির্দ্দেশ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। দুই চারিটী চাউল সিদ্ধ হইল, অবশিষ্ট সমস্ত চাউলই অবিকৃত রহিয়া গেল। আতপ তণ্ডুলের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমরা অগত্যা সে সমস্ত অন্ন বা চাউল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। সঙ্গে স্বদেশজাত চিপিটক ছিল। তাহাই কদলী, আম্র ও চিনি সংযোগে আহার করিয়া কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে একটী আলুর তরকারী ইতঃপূর্ব্বে কোনরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। চিঁড়া খাইবার সময় তাহাও কাজে লাগিল। কিন্তু এখন প্রত্যাবর্ত্তন কাল। সুতরাং চিঁড়েও যথেষ্ট ছিল না। সকলের পূর্ণ

ভোজন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, বেলা ৪টার সময় আমরা শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শনার্থ নির্গত হইলাম। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের ন্যায় বৃহৎ মন্দির আর ভারতবর্ষে নাই। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী গোপুর। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিকের সীমা প্রায় ১ মাইল। মূল মন্দিরে শেষ পর্য্যাঙ্কে ভগবান শ্রীরঙ্গজী শয়ান আছেন। নিম্নে নানালঙ্কারভূষিত শ্রীরঙ্গজীর সুন্দর ভোগমূর্ত্তি। দেবতার বলয়, ও পদক বহুমূল্য হীরকাদিখচিত। মন্দিরের সম্মুখে সোণার তালগাছ। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের গঠনপ্রণালীও শিল্পকৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মন্দির সংলগ্ন বাজারে শ্রীরঙ্গজীর ফটো এবং নানাপ্রকার চিত্রাদি বিক্রীত হইতেছিল। আমরা কয়েকখানি ফটো সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

ত্রিচন পল্লী সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত। একটী ত্রিচনপল্লী ফোর্ট, অপরটী সহর। দুই স্থানেই ষ্টেসন আছে। শ্রীরঙ্গম হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে জম্বুকেশ্বর মহাদেব। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অপ্ মূর্ত্তি বিরাজমান। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মূর্ত্তি আমরা দর্শন করিতে পারি নাই।

ত্রিচনপল্লী ফোর্ট নামক স্থানে পূর্ব্বে দুর্গ ছিল। এক্ষণে তথায় আর প্রাচীন দুর্গ নাই। উত্তরে পাহাড়, তাহার উপরে একটী শিবমন্দির আছে। শিখরদেশে উঠিবার পথের উপর চাঁদনি। তথায় স্ত্রীপুরুষের বহুসংখ্যক মুর্ত্তি আছে। মন্দিরে পার্ব্বতী গণেশ ও স্কন্দের বিগ্রহ আছে। আমাদের একটী সহযাত্রী এই সমস্ত দেখিয়াছিলেন। আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। ত্রিচনপল্লী ও শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষ্টেসনের জন্য বাসা হইতে রওনা হইলাম। ষ্টেসনে দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। একটী স্থানীয় লোকের সহিত বহুক্ষণ

ইংরাজীতে আলাপ হইল। লোকটী একজন Railway Contractor। তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু খুব চতুর ও বুদ্ধিমান। তিনি এদেশের অনেক সন্ধান দিলেন। আর একটী বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি সুন্দর ইংরাজি বলিতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীগণের তুলনা-মূলক সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমরা শাখা রেলে উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ত্রিচীনাপল্লীসহর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পুনরায় Main Lineএর ট্রেণে উঠিয়া মাদ্রাস অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের কামরাতে একটী মাদ্রাজী ভদ্র-লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি একখানি ইংরাজি নভেল পাঠ করিতে করিতে চলিলেন। আমার সহযাত্রীরা সুবিধামত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। আমার প্রায় কোথাও নিদ্রা হইল না। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বেলা প্রায় ৮টায় সময় আমরা মাদ্রাজষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এবার আমরা শ্রীযুক্ত সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। একটী দ্বিতল গৃহে আশ্রয় পাইলাম। রন্ধন-গৃহও দ্বিতলে। বহুতর হিন্দুস্থানী নরনারী এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। এইখানে আমরা আহারাদি করিয়া অনেকক্ষণ সুখে বিশ্রাম করিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে আমরা মাদ্রাজের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা বাসা ত্যাগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইলাম। ৺পুরীধামে নামিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া খুর্দ্দারোড জংসন পর্য্যন্ত টিকিট করা হইল। ক্রমে ট্রেণে উঠিয়া মনে হইল আমার ঘড়ি বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছি। তখনও ট্রেণ ছাড়িবার অনেক বিলম্ব ছিল। ধর্ম্মশালা ১০ মিনিটের পথ। আমার ভায়া তাড়াতাড়ি যাইয়া ঘড়ি আনিয়া দিল। ভায়া ট্রেণে প্রবেশ করিলেও

ট্রেণ প্রায় এক কোয়ার্টার পরে ছাড়িল। পথিমধ্যে ভিজিয়ানা গ্রাম ষ্টেসন হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন নামক একটী বাঙ্গালী যুবক আমাদের কামরাতে উঠিলেন। এতক্ষণে একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া জুড়াইলাম। হরিপদ বাবু ভিজিয়ানা গ্রামে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তাঁহার নিবাস কাশীপুর, কলিকাতা। তিনি তাঁহার পীড়িত পুত্রকে কর্ম্মস্থানে আনিবার জন্ম বাটী গমন করিতেছেন। লোকটী বড়ই সদালাপি। আর একটী হ্যাট কোট পরিহিত যুবাব্যক্তি আমাদের কামরাতে উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি গোয়া হইতে কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি প্রায় নির্ব্বাক ছিলেন। মধ্যে এক জায়গায় কিছু আহার করিলেন। আমরা আহারার্থ পাউরুটী ও দুগ্ধ খরিদ করিলাম। চিনি সঙ্গে ছিল। কিন্তু দুগ্ধে কেমন একপ্রকার গন্ধ। বোধ হয় মহিষের দুগ্ধ, এজন্ম মূল্যও কিছু অল্প ছিল। বস্তুতঃ এ অঞ্চলে খাঁটি গোদুগ্ধ পাওয়া কঠিন। কেবল ৺রামেশ্বর তীর্থে চারি আনা মূল্যে আমাদের দেশের ন্যায় এক সের খাঁটি দুগ্ধ পাইয়াছিলাম। এবং দুগ্ধ ৺বাবা রামেশ্বরের পূজার জন্ম লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু পূজারীরা কহিলেন, "দুগ্ধ ভোগে লাগিবে না।" অগত্যা তাহা ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছিলাম; তাহা বিশুদ্ধ বটে। যাহাহউক হরিপদ বাবু একস্থানে কহিলেন, 'এই পর্ব্বতের উপর পানা নৃসিংহদেব আছেন।' আমি এই নৃসিংহদেবের কথা ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু এবারেও দেখিবার সুবিধা হইল না। ক্রমে আমরা উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। হরিপদ বাবু কহিলেন, উড়িষ্যার পাহাড় সকল প্রায়ই জঙ্গলাদি শূন্য। এজন্য এখানে একটীও হিংস্রজন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের কামরাতে এইবার একটী যাত্রীর মুখে ৺শ্যামাবিষয়ক গান শুনিলাম। বুঝিলাম তিনি বাঙ্গালী। কহিলাম

—"মহাশয়! আবার গান করুন।" এতদিনে বাঙ্গলা কথা ও বাঙ্গলা গান শুনিয়া কাণ জুড়াইল। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোকটীর মুখে আর গান আসিল না!

আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, অবশ্য তিনি মাদ্রাজী। তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর। তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ চলিল। তাঁহার সঙ্গে একটী L. T. মাদ্রাজী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাদের দেশে চাকুরী মিলে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি কত কম বেতনে চাকুরী স্বীকার করিতে পারেন? তিনি কহিলেন,—আমি মাসিক ৮০৲ টাকা বেতন পাইলে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারি। আমি উত্তরে বলিলাম—"কলিকাতা অঞ্চলে সাধারণ গ্রাজুয়েট-গণের মূল্য মাসিক ৪০৲ টাকার অধিক নহে।" তাহা শুনিয়া তিনি বিষণ্ণ ও মৌনী হইলেন।

ক্রমে আমাদের গাড়ী চিল্কা হ্রদের পার্শ্ব দিয়া রাত্রি প্রায় ১টার সময় খুর্দ্দারোড জংসন ষ্টেসনে উপনীত হইল। সেখানে পুরীর ট্রেণ ধরিবার জন্য আমাদের ৪ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। যিনি যেমন পারিলেন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমার আদৌ নিদ্রা নাই। ষ্টেসনের পায়খানায় শৌচাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ উপস্থিত হইল। আমরা এই ট্রেণে আরোহণ করিয়া পরদিবস ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় পুরী ষ্টেসনে অবতীর্ণ হইলাম।

আমি পুরীতে ইতঃপূর্ব্বে আরও দুইবার আসিয়াছিলাম। তথাপি অতি আগ্রহের সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পুরীতে আমরা মানুষটানা গাড়ীতে চড়িয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুইনকোয়ার মহাশয়ের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বাসায় পায়খানা ও জলেরকল ছিল, স্নানাদির পর আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

শ্রীশ্রীঅমিয়-নিতাই-চরিত

(১৪)

নিতাইর বাল্যভাব।

'গৌর জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কর্ণে গেল, কেবা কাণে মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহারে কহিব মনোব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্দিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা লুকাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনে মোরে ডাকিল, মন আমায় ভুলে গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী॥

---

* শ্রীশ্রীঅমিয়-নিতাই-চরিত ধীরে ধীরে লিখিত হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। প্রথমেই বলিয়াছি এই কার্য্য বড়ই দুরূহ। একে এই লোকপাবনী লীলা বড়ই গূঢ়, তাহার উপর ইহার বিস্তারিত বর্ণনা কিছুই পাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনাই প্রধান অবলম্বন কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি একখানি বৃহৎ নিত্যানন্দ-জীবনী লিখিতেছিলেন, কিন্তু সেই পুস্তকের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়

আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত,
ক্লান্ত চিত্ত বিশ্রাম যে মাগে॥
আর ত চলিতে নারি, লহ মোর হাতে ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস অকিঞ্চন॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাগ্যের সীমা নাই। চিরকাল "নিষ্কপটে" তিনি নিতাইকে সেবা করিয়াছেন। নিতাইও তাঁহার গৃহে বাস করেন,

---

নাই। কবি বলরাম মাধবী লিখিত "পতিত পাবনাবতার" গ্রন্থ দীননাথ সরস্বতী মহাশয় প্রকাশ করিলেন না। ইহা বৈষ্ণব সমাজের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই সমস্ত কারণে ইহা আশানুরূপ উপকরণে সজ্জিত করিতে পারা যাইতেছে না। আমি শ্রীযুক্ত দীননাথ সরস্বতী মহাশয়ের ঠিকানা জানিনা। তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তিনি এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন। অপরাপর সুধী বৈষ্ণবমণ্ডলীর শ্রীচরণেও আমার ইহাই প্রার্থনা। কারণ এই কার্য্য মাত্র আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির চেষ্টায় হইতে পারে না। যিনি যেরূপ পারেন প্রবন্ধ, প্রাচীন পুঁথি, গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশিত হয় নাই এমন কোন নিত্যানন্দ প্রভু-সংক্রান্ত পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া বা উপদেশ দানাদি দ্বারা, মোট কথা যিনি যে ভাবে পারেন আমাকে সাহায্য করুন। আশাছিল কোন যোগ্য ব্যক্তি এই কার্য্যে হাত দিবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর না হওয়ায় মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তি গৌরভক্তগণের আশীর্ব্বাদ ভরসা করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। এই গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশ সম্বন্ধে যিনি যে ভাবে আমাকে সাহায্য করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত এই পত্রিকায় উল্লেখ করা হইবে। (লেখক)

তাঁহাকে বাপ বলিয়া ডাকেন, দিবানিশি বাল্যভাব। ৩২ বৎসরের যুবক যেন পঞ্চমবর্ষীয় শিশুটী। মালিনীদেবীকে যে কেবল মাত্র তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয় তাহা নয়, নিতাই তাঁহার স্তন্যপানও করেন। মালিনীদেবী বৃদ্ধা, শচীদেবীর সখী ও সমবয়স্কা,—কিন্তু নিতাই তাঁহার শুষ্ক স্তন স্পর্শ করিলেই তাহাতে দুগ্ধের সঞ্চার হইত।

কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয় ॥ (চৈঃ ভাঃ)

এই যে বেদগোপ্য নিত্যানন্দ মহিমা, ইহা সাধারণে জানিতে পারিল না। মালিনীদেবীকে প্রভু অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিতের উপযুক্ত বংশধর, গৌরাঙ্গলীলার ব্যাসদেব বৃন্দাবন দাস, প্রভুর অচিন্ত্যনীয় কৃপাবলে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আবার একদিন প্রভু নিতাইকে রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, তুমি পণ্ডিতের গৃহে চঞ্চলতা করিও না।" অমনি সদানন্দ নিতাই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু আমার চঞ্চলতা কখনও পাইবেন না, আপনি কি নিজের মত সকলকে ভাবিতেছেন।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমায় ভালরূপই জানি।" নিতাই বলিলেন, "আমার কবে কি দোষ পাইয়াছ বল দেখি শুনি?" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার আর দোষ কি, তবে মাঝে মাঝে ঘরে অন্নবৃষ্টি কর এই মাত্র।"

নিতাই বলিলেন, "পাগলেই অন্ন ছড়ায়, বুঝিয়াছি আমাকে আর

নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিবেন না, তাই এই মিথ্যা নিন্দার প্রচার করিতেছেন।"

প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তোমার চঞ্চলতায় আমরা লজ্জিত হই, তাই বলিতেছি।"

নিতাই প্রভুর বাক্যে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "বেশ বেশ, আমার চঞ্চলতা দেখিলে তুমি চিরকার শিক্ষা দিও। আমি যে চঞ্চল তাহা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ দেখিতেছি।" এই বলিয়া আবার খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হাসিতে হাসিতে নিতাই আপনা হারাইয়া ফেলিলেন। বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। তখন পরিধানের বস্ত্রখানি শিরে বাঁধিয়া যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিতেছেন। হাসিতে হাসিতে সারাটী অঙ্গনে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। আনন্দময় নিতাই সারাটা অঙ্গ ব্যাপিয়া যেন আনন্দের লহরী তুলিয়াছেন।

গদাধর হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ সেখানে উপস্থিত। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ, এই যে বলিলে 'আমি কি পাগল?' আর এখন কি করিতেছ।" কিন্তু কে শুনিবে, নিতাইর বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। তখন প্রভু নিজহাতে তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিয়া স্থির করিলেন।

"চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥"

* * * *

একদিন একটী পিতলের বাটী কাকে লইয়া গেল। ঠাকুরের ঘৃতপাত্র, শ্রীবাস পণ্ডিতের নিত্য ব্যবহার্য্য। মালিনীদেবীর বড়ই ভয় হইল যে, তাহারই অসাবধানতায়—আজ বাটীটা কাকে লইয়া গেল। শ্রীবাস পণ্ডিত শুনিলে বড়ই অনর্থ হইবে—তাঁহার বড়ই তীব্র ব্যবহার।

কাক বনে বাটী রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার শূন্য মুখ দেখিয়া ভয়ে মালিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই আসিয়া। বলিলেন, "মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? দেবী বলিলেন, "বাবা' কাকে পণ্ডিত ঠাকুরের ঘৃতপাত্রটী লইয়া গিয়াছে। ইহাতে নিতাই বলিলেন, মা! ইহাতে আর ভয় কি? আমি এখনই বাটী আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি কাকের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—

"কাক তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন।"

আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য যে, নিতাইর এই বাক্যে কাক উড়িয়া গেল।

সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি॥

বিশুদ্ধ আনন্দময় নিত্যানন্দ, আর জীবমাত্রের হৃদয়েই আনন্দময় কোষের অবস্থিতি। সুতরাং নিত্যানন্দের আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। কাক যেখানে বাটী রাখিয়া আসিয়াছিল সেই স্থান হইতেই আবার আনিয়া মালিনীর নিকট রাখিল। মালিনীদেবী নিত্যানন্দের প্রভাব ভালরূপই জানিতেন। তিনি এই অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বলা হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "দ্বাপর যুগে যিনি বলরামরূপে সন্দীপনি মুনির মৃতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, যিনি সমস্ত ভুবন পালন করেন তিনি যে কাকের নিকট হইতে বাটী আনিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনন্ত ভুবন যাঁহার শিরে অবাস্থত, যাঁহার নামে অনাদি অবিদ্যার ধ্বংস হয় তিনি যে কাকের নিকট হইতে বাটী আনিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি ত্রেতায় লক্ষ্মণরূপে বনবাসে নিরন্তর সীতার রক্ষক রূপে ছিলে, তাঁহার অঙ্গান্তে অবয়বে তোমার দৃষ্টিমাত্র পড়ে নাই, তোমার বাণে

রাবণ বংশ ধ্বংশ হইয়াছিল, সেই তুমি যে কাকের নিকট হইতে বাটী আনিয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহার চরণ প্রান্তে পূর্ব্বে কালিন্দী নদী আসিয়া স্তুতি করিয়াছিল, যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের পালনে শক্তি ধর, তিনি যে কাকের নিকট হইতে বাটী আনিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তথাপি তোমার কার্য্যে অল্পতা দৃষ্ট হয় না। তোমার অবয়ব যে সর্ব্বদাই সত্য ইহা বেদ সমূহে উক্ত হইয়াছে ”

মালিনীদেবী এইরূপে স্তব করিতেছেন, আর নিতাই বাল্যভাবে হাসিতেছেন। স্তব সমাপ্ত হইলে, নিতাই বলিলেন, মা! আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দাও।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতাইকে দেখিলে মালিনীর স্তনে, দুগ্ধ ঝরিত। আসুন আমরা কবি বৃন্দাবন দাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন করি।—

——অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব সে মানয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশি ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমন ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥

* * *

এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষাকরে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বদাই কীর্ত্তনানন্দে বা গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ সাথে, কৃষ্ণকথা রসে মগ্ন থাকিতেন। শচীমার ইহা ভাল লাগিত না। তাঁহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার নিমাইচাঁদ। মাতার একান্ত সাধ পুত্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূর সহিত আর পাঁচজনের মতই সাংসারিকধর্ম্ম পালন করিয়া আনন্দ করুক।

প্রভু মায়ের মনোভাব বুঝিতেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রিয়াজীর নিকট থাকিয়া, মাতার চিত্তে আনন্দদান করিতেন।

একদিন মহাপ্রভু, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত, একত্র বসিয়া আছেন। এবং দেবী মহাসুখে তাঁহাকে তাম্বুল যোগাইতেছেন, এমন সময় পরম চঞ্চল নিত্যানন্দ, আনন্দবিহ্বল হইয়া, প্রভুর বাড়ী আসিলেন। তিনি প্রিয়াজীর সহিত উপবিষ্ট প্রভুর যুগলমূর্ত্তি দেখিলেন। নিতাই, প্রভুর বিলাসমূর্ত্তি দেখিয়া বাল্যভাবে বিহ্বল হইয়া নাচিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—

"প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী-শ্রীরাম।
রাধা-কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম।
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥"

এই অপূর্ব্ব চির ঈপ্সিত দৃশ্য দেখিয়া নিতাই আজ আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। তখন—

ভাবে গর গর, নিতাইসুন্দর, হেরি গোরা চাঁদের ছটা।
কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে, প্রতি অঙ্গে নব পুলক ছটা॥

কিবা উনমাদ, ক্ষণে সিংহনাদ, ক্ষণে লোটে ধরাতলে।
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস, ক্ষণে মহাহাস, খসে বাস, ভাসে আঁখির জলে॥

নিত্যানন্দের বসন খসিয়া পড়িল, তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরানন্দের স্বাদ পাইয়াছেন, কাহাকেও লজ্জা নাই।

উলঙ্গ নিত্যানন্দ আসিয়া, প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন! শ্রীমতী লজ্জা পাইয়া, গৃহের ভিতর পলাইয়া গেলেন। তখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! উলঙ্গ কেন?

নিত্যানন্দ—"হয়, হয়।

প্রভু—নিত্যানন্দ! পরহ বসন।

নিত্যানন্দ—আজি আমার গমন।

প্রভু—নিত্যানন্দ! ইহা কেন কর?

নিত্যানন্দ—আজ খাইতে না পারি।

প্রভু—এক কহি, কহ কেন আর?

নিত্যানন্দ—আমি গেনু দশ বার।

প্রভু—(স-ক্রোধে) মোর দোষ নাই।

নিত্যানন্দ—প্রভু! হেথা নাহি আই।

প্রভু—কৃপাকরি পরহ বসন।

নিত্যানন্দ—আমি করিব ভোজন

"চৈতন্ত আবেসে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায়॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, এরূপ লোকের সহিত বাদানুবাদ করা বৃথা। তখন তিনি নিজে উঠিয়া, নিত্যানন্দকে বসন পরাইয়া দিলেন। তথাপি নিতাইয়ের বাহ্য হইল না। তিনি আপনা আপনি হাসিতেছেন আর মনে করিতেছেন, যেন তাঁহার বিশ্বরূপ দাদা। মুখখানি, কথাগুলি, ঠিক

যেন বিশ্বরূপের মতই। নিত্যানন্দকে দেখিলে, শচীমার মাঝে মাঝে, এইরূপই মনে হইত। তিনি মনের কথা কাহাকেও বলিতেন না, পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দকে, সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

কতক্ষণ পরে, নিতাই বাহ্য পাইয়া,—ভাল করিয়া কাপড়খানি পরিলেন। শচীমা তখন, ঘর হইতে পাঁচটী ক্ষীরের সন্দেশ আনিয়া, তাঁহাকে খাইতে দিলেন। নিতাই তাহার একটী খাইয়া, চারটী ছড়াইয়া ফেলিলেন। মাতা, পাগল ছেলের কাণ্ড দেখিয়া, হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। বলিলেন—বাছা! কেন ছড়াইয়া ফেলিলে, আর ত ঘরে নাই, কি খাইবে?

নিতাই বলিলেন, মা! এক সঙ্গে অতগুলি কেন দিলে, তাই ছড়াইয়া ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর গিয়া দেখ, আরও সন্দেশ দেখিতে পাইবে।

মাতা গৃহমধ্যে যাইয়া অপরূপ দেখিলেন। দেখিলেন, সেই চারিটী সন্দেশই রহিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, ভাবিলেন নিতাই যাহা বাহিরে ছড়াইয়া ফেলিলেন, তাহা গৃহমধ্যে কিরূপে আসিল। সেগুলি ধুলা ঝাড়িয়া, নিত্যানন্দের হাতে দিবার জন্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু এবার আরও অপরূপ দেখিলেন—

"হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখয়।
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়॥"

তখন আই, * আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ! ইহা কোথায় পাইলে?"

---

* কবি বৃন্দাবন দাস শচীমাকে 'আই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন, "মা! যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাই তোমার দুঃখ দেখিয়া খুঁজিয়া আনিলাম।" আই তখন নিত্যানন্দের মহিমা বুঝিতে পারিলেন। প্রকাশ্যে বলিবেন "নিত্যানন্দ! বুঝিলাম তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, তুমি আমাকে কেন বৃথা ভাঁড়াইতেছ, আমি অজ্ঞান বশতঃ তোমার মহিমা না বুঝিয়া পুত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম। তুমি আমার চক্ষের মায়ার আবরণটি ঘুচাইয়া দাও। এই ঘটনার পর ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়েছেন—

"এই মত নিত্যানন্দ-চরিত অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতের কার্য্য বাধ॥
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥"

আর এই দিন হইতে শচীমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল—

"নিত্যানন্দ-মহিমা না জানে কোন জনে।"

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ দাস ঘোষ

রসরাজ-গোরা ।

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায় লিখিত)

নদীয়া নাগর, রসের সাগর,
পিরিতি-মূরতি গোরা ।
প্রেমরসকূপ, লাবণ্যের ভূপ,
ভাবনিধি চিতচোরা ॥
অকলঙ্ক শশী, সুধা রাশি রাশি,
চরণ নখর শোভা ।
গজেন্দ্রগমন, বাহুর দোলন,
যুবতীর মনোলোভা ॥
বক্ষ পরিসর, অতি মনোহর,
ভূষিত চন্দন মালে ।
অঙ্গ গন্ধে অন্ধ, খসে নীবিবন্ধ,
কি করিবে কুলে শীলে ॥
মুচকি হাসনি, তেরছ চাহনি,
মরমে পশিয়া বিঁধে ।
চাঁচর কুন্তলে, চরাচর ভুলে,
জীবন যৌবন বধে ॥
মলয়জ বিন্দু, ভালে শোভে ইন্দু,
অলকার অতি শোভা ।
গোরা বিনোদিয়া, রসের নাটুয়া,
ত্রিজগত মনোলোভা ,

মধু-রস বাণী, প্রেম মন্দাকিনী,
মধুর রূপের জ্যোতি।
সর্ব্ব চিত্তহরি, করিল বাউরি,
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপতি॥
রসিক শেখর, নদীয়া-কিশোর,
পরশ রতন সার।
আনন্দ বর্দ্ধন, রসিক রঞ্জন,
পিরিতি-কুসুম হার॥
ললিত ত্রিভঙ্গে, নেহারি অপাঙ্গে,
মজায় যুবতীকুলে।
জাহ্নবীর তীরে, সর্ব্বচিত্ত হরে,
নাচে গায় হরি ব'লে॥
কামের কামিনী, হ'য়ে পাগলিনী,
গৌরাঙ্গ বলিয়া ঝুরে।
বিনোদ নগরে, রসের সাগরে,
নিয়ত সিনান করে॥
পিরিতির সার, অমিয়া পাথার,
বিবর্ত্ত বিলাসকারী।
মদনমোহন, শ্রীশচীনন্দন,
রসরাজ গৌরহরি॥
দরশন দিয়া, পরশ করিয়া,
সরস করিল জীবে।
রসে ডগমগ, পিরিতি সোহাগ,
হাসিছে নাচিছে সবে॥

প্রেম চিন্তামণি, নবদ্বীপ ভূমি,
ভক্তি-মন্দাকিনী ধারা।
নদীয়া যুগলে, হেরি কুতূহলে,
এ 'যোগেন্দ্র' আত্মহারা ॥

—o—

সত্যদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বিশেষ সম্বন্ধটি কেমন? জীবজগৎ তাঁহার বিভিন্নাংশ হইলেও, যখন এই সম্বন্ধে অবস্থিত, তখন তাহাদের বিভিন্নতাকে নিষ্প্রভ করিয়া অংশত্বই উজ্জ্বল হইয়া থাকে। সকলেরই তাঁহার সহিত এক সম্বন্ধ, অংশ-অংশী সম্বন্ধ অথবা আশ্রিত-আশ্রয় সম্বন্ধ। যতদিন মানব এই সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারে, যতদিন তাহার স্বাতন্ত্র্য বা বিভিন্নতা অংশত্বকে ঢাকিয়া আপনি পুরোবর্ত্তী হইয়া রহে, ততদিন সে সামান্য ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকে। এই বিশেষ সম্বন্ধ শুধু মুখের কথায় স্বীকার করা মাত্র নহে। প্রত্যেকের নিজ নিজ সত্তাকে বা জীবনকে অংশভাবে সত্য বোধকরাই মানবের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধের জাগরণ। সামান্য ধর্ম্মের সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ এই জাগরণ ঘটিয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে মানব যতই

বিশেষ সম্বন্ধের জাগরণ।

সাধনা দ্বারা নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হউক না কেন, সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যরূপে তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অংশকণা স্বতন্ত্র ভাবে চিরকালই অসম্পূর্ণ থাকে। অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহার অভাব থাকিবেই,

সুতরাং অতৃপ্তিও থাকিবেই। সম্পূর্ণ না হইলে অভাবও ঘুচে না, তৃপ্তি লাভও হয়না। ক্রমাগত অভাব-পীড়নে পীড়িত হইতে হইতে, এবং নানা-বিধ সাধনা দ্বারা তৃপ্ত হইবার পথে পদে পদে অতৃপ্তি-কণ্টকের বেদনায় ব্যথিত হইতে হইতে যখন মানব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর তৃপ্তি লাভের আশাটুকুও ধরিয়া রাখিতে পারে না, চিরদিনের আশ্রয়রূপে গৃহীত জগৎ ক্রমশঃই নিজ নশ্বরত্ব দেখাইয়া তাহাকে নিরাশ্রয় করিতে থাকে, তখন সে অদৃষ্ট আশ্রয় ধরিবার জন্য আকুল না হইয়া থাকিতে পারে না। স্বতন্ত্র মানব বিবিধ দেবতার সাধনা করিয়া ধন-ধান্য পুত্র-কলত্র লাভ করিল, এবং উহাদিগকে লইয়া সুখের ঘর বাঁধিল! তখন তাহার আশা বা বাসনা তাহাকে আরও বিবিধ প্রকার সুখের জন্য উদ্বোধিত এবং তৎসাধনায় নিযুক্ত করিল! তাহাকে পূর্ব্বপ্রাপ্ত সুখে স্থির হইয়া থাকিতে দিল না! এদিকে পূর্ব্ব সঞ্চিত সুখের বস্তুগুলি,—তাহারাও ত স্বতন্ত্র?—সুতরাং সময় বুঝিয়া,—তাহাকে অন্য সাধনায় নিবিষ্ট দেখিয়া,—একে একে তাহার অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য পলায়নপর হইল, তাহার সুখের বাঁধা ঘরে আগুণ লাগিল! প্রাণপণে সঞ্চিত বিষয়-বৈভবাদি প্রবঞ্চক দস্যুর কবলিত হইল, বুকজুড়ান ধন প্রিয় সন্তান হয়ত কালের কলঙ্কিত করের মৃত্যু-কালিমায় মলিন হইয়া তাহারই বক্ষে ঢলিয়া পড়িল; নতুবা, হয়ত স্বেচ্ছাচারী পুত্র-রূপে সঞ্চিত ধন-রত্নাদি অপব্যয়ে উড়াইতে লাগিল; প্রিয়তমা কামিনী হয়ত নিরাশার ছুরি বুকে বসাইয়া দিয়া অপরের সঙ্গিনী হইতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল! এমনি ভাবে এক আনিতে গিয়া অন্য হারাইয়া, যখন সেই স্বতন্ত্র মানব বিশ্বাশ্রিত নশ্বর সুখের আশায় জলাঞ্জলি দেয়, তখন তাহার স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বিত মস্তক আপনিই প্রণত হইয়া পড়ে, একটি অদৃষ্ট আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, অদৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বাশ্রয়-

ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বিশেষ সম্বন্ধের পথে বাহির হইয়া পড়ে, চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে 'কে আছ করুণাময়, আমায় বলিয়া দাও আমি কে ?' সুখের জন্য এত সাধনা করিলাম, কিন্তু আমার চারিদিকে এ দুঃখের অনল কেন জ্বলিয়া উঠিল ? আমিত বুঝিতে পারিতেছি না কিসে আমার এ জ্বালার শান্তি হইবে! এইরূপেই বিশেষ সম্বন্ধের জাগরণ হয়। এখনও সেই বিশেষ সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে আছে,—তবে উহা জাগ্রত নহে, নিদ্রিত। বিশেষ সম্বন্ধের জাগরণ প্রথমে মানব-হৃদয়ে শ্রদ্ধা রূপে উদয় হয়। মানব তখন শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে সুখ রূপ-দুঃখময় বিশ্বের অতীত সত্বার বার্ত্তা জানিতে উৎসুক হইয়া বিশ্ব-সুখে-অনাসক্ত সাধুদ্বারে উপনীত হয়। সাধুগণের নিকট অনন্ত সচ্চিদানন্দ-বার্ত্তা লাভ করিতে করিতে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে, ক্রমশঃ তাহার চৈতন্যোদয় হইতে থাকে, এবং যাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া সাধুগণের নিকট অকপটে নিজ মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তখন কোন সাধু করুণাবশে তাহাকে সচ্চিদানন্দ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মের সাধনার কথা উপদেশ দেন, সেই উপদেশানুসারে সে তখন ধর্ম্ম সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করে। এই ধর্ম্ম সাধনফলে ক্রমশঃ তাহার সকল অনর্থের নিবৃত্তি,—তাহার বিভিন্নতার বা স্বাতন্ত্র্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সে তখন সচ্চিদানন্দ তত্ত্বে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া, তদ্ব্যতীত আর যত কিছু তাহার চিত্তে ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সকলকেই তাহাদের উদয়ের পরম্পারাক্রমে ত্যাগ করিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে রুচিসম্পন্ন ও অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট বা আসক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে

শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ব্যাকুলতা, তদনন্তর ধর্ম্ম সাধনা।

অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি।

ভাব ও প্রেম বা রস।

সেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই ভাবতনু গ্রহণ করিয়া,—সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বের পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ-অনুভূতি-রূপে পরিণত হইয়া,—সাধকের চিত্তে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর সে তখন সচ্চিদানন্দ-আকর্ষণ বা প্রেমের সুপ্রকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই অবস্থিত বা সত্যরূপে বর্ত্তমান হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ধর্ম্মের এইপ্রকার ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

পাঠক, লক্ষ করুন—শাস্ত্র বলিতেছেন 'প্রেমের অভ্যুদয় হয়'। ইহাতে কি বুঝিব? বুঝিব যে প্রেম আছেই, তবে এখন অগোচরে আছে, সাধনফলে উহা গোচরে আসিবে,—তখন আমরা উহাকে সত্যরূপে চিনিব। প্রেমের অভ্যুদয় হইলে মানব আপনার স্বরূপ অংশত্ব এবং অংশীর সহিত উহার সত্যসম্বন্ধ, শুধু অনুমানে নয়, প্রত্যক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়া অংশী সচ্চিদানন্দের সহিত উক্ত সত্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়া থাকেন,—অভাবমুক্ত হইয়া থাকেন,—তৃপ্ত হইয়া থাকেন। স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া,—এখন আমরা যে ভাবে আছি সেই ভাবে থাকিয়া,—এই অভাবমুক্তি ও তজ্জনিত তৃপ্তির কথাটি ঠিক বুঝান যায় না। তবে এজগতে উহার অনুরূপ কোন ভাব থাকিলে তাহার দৃষ্টান্তে উহার আভাষমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। আমরা পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যান হইতে এই অভাবমুক্তির ও তজ্জনিত তৃপ্তির একটু আভাষও পাইতে পারি।

একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তি বহু কষ্টে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিতেন। দারিদ্র্য বা ধনাভাব তাহার জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। অন্নগতপ্রাণ দরিদ্র ভিক্ষা ব্যতীত উদরান্ন সংস্থানের আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া প্রত্যহ ধনীগণের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহার্থে উপস্থিত হইত। কত তোষামোদ করিয়া কোথাও কোন দিন ভিক্ষা মিলিত, কোথাও বা কোনদিন বিদ্রূপ ও তিরস্কার লাভ করিয়াই ফিরিতে হইত; কোনদিন হয়ত পেটভরিয়া খাইবার মত পর্য্যাপ্ত মিলিত, কোন দিন বা অর্দ্ধাশনের মত মিলিত। এইরূপে প্রত্যহ ধনীগণের দ্বারে তাহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ধনীগণও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহারা সকলেই সেই দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ধনপ্রিয় ধনীগণ প্রত্যহই সেই একইজনের অভাব পূর্ণ করা অপব্যয় ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে একদিন সকলেই হাত গুটাইলেন। প্রত্যেক দুয়ারে প্রত্যাখ্যাত ও তাড়িত হইয়া সেদিন সেই দরিদ্র দিবাবসানে ক্লান্তদেহে নিজ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল, এবং আপন অদৃষ্টের প্রবল প্রভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল; দিনটিও অনশনে অতিবাহিত হইল।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে আবার ক্ষুধার তাড়না! সে তাড়না ধনীগণের পূর্ব্বদিনের তাড়নাকে পরাভূত করিল! সকল লাঞ্ছনা ভুলিয়া দরিদ্র আবার সেই সকল ধনীগণের দ্বারে ছুটিল! প্রত্যাখ্যানের পরেও আবার সেই একই ভিক্ষুককে দ্বারে দেখিয়া এদিন ধনীগণ অধিকতর বিরক্ত হইলেন, এবং বহু দুর্ব্বাক্য বলিয়া ও ভবিষ্যতে প্রহারেরও ভয় দেখাইয়া সকলেই সেদিনও তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। দিনশেষে দুর্ব্বল ও পরিশ্রান্ত দেহ এবং নিরাশাক্রান্ত মনটি লইয়া সেদিনও দরিদ্র কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আপন দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার কোলে তনুখানি ঢালিয়া দিয়া অনশনের দ্বিতীয় দিনটি অতিবাহিত করিল।

পাঠক, জীবনে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিবার অবসর যদি না পাইয়া থাকেন, কোন দরিদ্রের মুখে উহার ভীষন যন্ত্রণার কথা শুনিয়াও বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের প্রসঙ্গাধীন দরিদ্রটি পরদিনের নিদ্রাভঙ্গে আবার দুঃসহ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভিক্ষার্থে ছুটিয়া

বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বদিনের দুর্ব্বাক্যের কথা, প্রহারের ভয় প্রদর্শনের কথা,—ক্ষুধার জ্বালা তাহাকে সকলই ভুলাইয়া দিল! পূর্ব্ব দুইদিনের অনশনে দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, কিন্তু ক্ষুধা তাহাকে সে কথা একটুও ভাবিবার অবসর দিলনা! পায়ে চলিবার শক্তি নাই, তবুও ক্ষুধা তাহাকে পথে টানিয়া বাহির করিল! ভিখারী ধীরে ধীরে আবার ভিক্ষার আশায় ধনীর দ্বারে যাইতে লাগিল! নিজ প্রাধান্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত ধনী আবার আজ সেই ভিখারীকে দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। 'যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, কটুক্তিসহ বিদায় দিয়া পুনরায় আসিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে আবার আজ দ্বারে উপস্থিত! এ নিশ্চয়ই তাহার পরিহাস! সে নিশ্চয়ই এই প্রকারে তাঁহাদের নিষেধ বার বার অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের প্রাধান্য অস্বীকার করিতেছে! ভিখারীর এইপ্রকার গুপ্ত পরিহাস অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য নহে!'—ইত্যাকার নানা চিন্তায় ধনমদমত্ত ধনী আজ ভিখারীর আগমন-কারণ ক্ষুধার তাড়নার কথা ভবিবার অবসর পাইল না। যে ক্ষুধার তাড়নার ভীষনতা উপলব্ধি করিবার অবসর জীবনে পায় নাই, সে কেমন করিয়া উহা ভাবিবে? ইহাই বিশ্বের বিচিত্রতা! ক্রোধের উত্তেজনায়-লক্ষ্মীমন্ত ধনী স্বকল্পিত পরিহাসের জন্য লক্ষ্মীছাড়া ভিখারীকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে বাহির হইলেন, এবং নির্ম্মমভাবে প্রহার করিলেন! দুই চারি দুয়ারে এইপ্রকারের ভিক্ষালাভ করিতে করিতে ভিখারীর ধারাপ্লুত নয়নে অদৃষ্টদেবতার সর্ব্বশক্তিমত্তা-মণ্ডিত প্রচণ্ডমূর্ত্তি পরিস্ফুট হইতে থাকিল! এদিকে প্রহারের উপর প্রহারে জর্জ্জরিত এবং জ্বালায় ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া ধূলিধুসরিত দেহ আর অধিক প্রহার সহ্য করিতে পারিল না! অঙ্গে রক্তধারা ছুটিল! অনশনে ক্ষীণ, দুশ্চিন্তায় কাতর, রক্তধারানির্গমনে অধিকতর দুর্ব্বল সেই দরিদ্র প্রহারের ভীষণতর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইতে না হইতে বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া সেই স্থানেই সেদিনের জন্য বিশ্রামলাভ করিতে শয়ন করিল। এদিন আর তাহার নিজ কুটীরে ফেরা হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা } ভক্তি { বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

প্রার্থনা

দীনবন্ধু, দয়াল গুরো! তোমার লীলা খেলা বুঝা ত দূরের কথা, সাধু জনের কাছে যাহা শুনি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে যাইয়াই বিহ্বল হইয়া পড়ি। তুমি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানরূপে, বিভব অর্থাৎ সম্পদ রূপে প্রতিনিয়ত জীবের নিকট প্রকাশ পাইতেছ। তোমারই বলে জীব নিত্য নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া হৃদয়ের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করিতেছে, তোমারই বলে জীব হিতাহিত জ্ঞান পাইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া কর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইতেছে ও নিজ নিজ অভাব মোচনে সমর্থ হইতেছে। আমি সাধন ভজন হীন দুরাচারী হইলেও তোমার এই অসীম কৃপাসিন্ধুর বিন্দু লাভে একেবারে যে বঞ্চিত রহিয়াছি তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। তবে আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ স্থায়ীভাবে আমায় কিছু হইতেছে না, এই যা দুঃখ।

বিশ্বারূপে যখন তুমি হৃদয়ে বিরাজ কর, তখন কত সুখ, কত জ্ঞান, কত কি যে সদ্ভাবের উদয় হয় তাহা ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিতে পারি না, আবার তুমি যখন হৃদয় হইতে সরিয়া যাও অমনি হৃদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার পূর্ণ হইয়া কলুষিত চিন্তাদিদ্বারা যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তখন যে হৃদয়ে কত সন্দেহ, কত কুতর্ক, কতকি কুভাব এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবের উদয় হয় তাহার আর সীমা নাই। তখন ভাল করিতে মন্দ হইয়া যায়, সুখ খুঁজিতে যাইয়া দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি তোমাকে ভুলিয়া তোমাকে ছাড়িয়া কিছুই হইবে না। তাই প্রার্থনা—যাহাতে আমার মঙ্গল, যাহাতে আমার সুখশান্তি, যাহাতে আমার সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি এবং পরমাগতি লাভ হয় তাহা করিয়া তোমার দীনশরণ নামের সার্থকতা কর। আমি আজ তোমার অভয় পদে একান্ত শরণ লইলাম।

দীন—শ্রী—

ছলনা

(শ্রীযুক্ত নবীন চাঁদ দত্ত)

হৃদয়-কাননে নিতুই কতই আলেয়ার আলো জ্বলে।
কত প্রলোভন ভুলায়ে আমারে দূরে ল'য়ে যায় চ'লে ॥
আলেয়ার আশে আকুল হৃদয়, পাছু ছুটে যাই, এই—এই—নয়;
ছলেতে ছলিয়ে যায় ছলাময় অসার আশাতে ব্যথিত মন।
যদি কোন রূপে কভু আপনারে, ভুলাইয়ে রাখি না ভাবি তাহারে,
তার-ই স্মৃতি শুধু আসিয়া আমারে নিরাশা সাগরে করে নিমগন ॥

তৃষিত হৃদয়ে সলিলের আশে, বৃথা ছুটে যাই মরুভূমি পাশে,
তৃষা বেড়ে যায় মরু হেরি হাসে সরমে ফিরিয়ে আসি নিরাশায় ।
সম্মুখেতে তব প্রেম-প্রবাহিনী, পাতকী-পরাণ কখন' চাহেনি,
কেনবা সেজন ব্যথিত হবেনি হেন নির্ঝরিণী যেবা ছাড়ি যায় ॥
হৃদয়ে উঠিয়া অতৃপ্ত বাসনা, নিয়ত আমারে করিছে তাড়না,
ভাবি কতবার আর চাহিবনা এ দুঃখ যাতনা সুখের বলিয়া ।
তবু কেন সদা তোমারে ছাড়িয়ে, দুঃখ পাই বৃথা সুখেতে মজিয়ে,
এস শান্তিময় 'শান্তিসুধা' দিয়ে স্থান দাও পদে আপন করিয়া ॥

মর্ম্মব্যথা

(শ্রীযুক্ত অনন্তপ্রসাদ রায়)

আকুল প্রাণের বেদনা আমার জানাব কাহার কাছে ?
না পেনু সেবিতে গোরার চরণ কুল-ভয় লোক-লাজে ॥
মনে হয় গৃহে আসন পাতিয়ে বসায়ে গৌরমণি ।
নিরব কুটিরে বদ্ধ দুয়ারে তাহারে সেবিব আমি ॥
গুরুজন ভয় সাধে তাতে বাদ—একি ? লাজেতে মরি !
হৃদয় বাসনা হৃদয়ে জাগিছে কহিতে কাহারে নারি !!
সখিগণ সহ উদ্যান ভ্রমণে যখন আমি গো যাই ।
তরুলতা শাখে গোরারূপ দেখি, চমকিয়া উঠি তায় ॥
সুরঙ্গ করেতে চাঁদের কিরণে গোরারূপ মাখামাখি ।
কুঞ্জ কাননে গহন বিপিনে গোরারূপ শুধু দেখি ॥

গোরা মনোচোরা মানস মাঝারে সদাই দিতেছে উঁকি।
বল লো সজনি হেন গোরাচাঁদে না সেবে কি ক'রে থাকি ?
বকুলের শাখে কোকিলার ডাকে—'গোরা গোরা গোরা'—তান।
হৃদয় মাঝারে আসিয়া ঝঙ্কারে আকুল করিয়া প্রাণ ॥
এততে কি হায় প্রাণে বাঁচা যায় না পেলে সেবিতে তারে।
হৃদয়ে যে জাগে না সেবে তাহারে অভাগী থাকিতে নারে
"অনন্ত" হৃদয় ধৈরজ না ধরে না মানে শাসন লাজ।
গোরার লাগিয়া কলাঙ্কিত নাম যাচিয়া লইল আজ ॥

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাইচরিত

[১৫]

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস)

[মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন]

"ভক্ত পদধূলি, আর ভক্তপদ জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ, এই তিন মহাবল ॥
এই তিন সেবা হ'তে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥" (চৈঃ চঃ।)

প্রভু নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর সহিত এইরূপ বহুরঙ্গে, নবদ্বীপে লীলা করিতে লাগিলেন। নিতাই সর্ব্বদা অলৌকিক কৃষ্ণানন্দে মগ্ন থাকিতেন। বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের মত। মালিনীকে মা এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাপ বলেন। আর যাহাকে দেখিতেন তাহার

সহিতই মধুরভাবে কথা কহিতেন। আপনা আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, হুঙ্কার প্রভৃতি করিতেন লোকে সে স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। এক একদিন এমনভাবে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন যে, তিন চারি দিনেও সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিত না। বর্ষায় গঙ্গা কুম্ভীরে পূর্ণ, কিন্তু নিতাইর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। একবার স্নান করিতে নামিলে আর উঠিতে চান না। লোকে, সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া হায়, হায়, করিতে থাকে।

একদিন নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাল্যভাব, দিগম্বর মূর্ত্তি। শ্রীবদনে অপূর্ব্ব হাস্য, আর শ্রীনয়নে অপূর্ব্ব আনন্দধারা। মাঝে মাঝে এই বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন—

"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার।"

বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে নিতাই একেবারে ডগমগ। একটী প্রাচীন পদে আছে,—

"শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥
সই, কহনা গৌর কথা।
গৌরনাম, অমিয় ধাম, পিরীতি মুরতিদাতা॥
গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর করিলাম সার।
ভাবিয়ে দেখিনু, গোরা চাঁদ বিনে গতি যে নাহিক আর॥
গৌর পিরীতি, গৌর মূরতি, গৌর মুখের হাসি।
গৌর গমন, গৌর গঠন, হৃদয়ে রহিল পশি॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, যাহার হৃদয়ে জাগে।
নরহরি দাস, অনুগত তার, চরণে শরণ মাগে॥"

মহাপ্রভু এই মহা জ্যোতির্ম্ময় দিগম্বর মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া স্বীয় মস্তকের বস্ত্র তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। নিতাই তখনও হাসিতেছেন, তাঁহার হাস্যের বিরাম নাই। প্রভু নিজ হস্তে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে দিব্য গন্ধ লেপন করিয়া দিলেন, এবং গলে সুগন্ধ মাল্য প্রদান করিলেন। পরে যত্ন করিয়া নিজের সম্মুখে একটী আসনে তাঁহাকে বসাইলেন। তখন ভক্তগণের সম্মুখে প্রভু নিত্যানন্দকে এইরূপে স্তব করিলেন,—

"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ-পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"

প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য রসে ভাবিত হইয়া যাহা করেন, যাহা বলেন তাহাই সকলের মনোমত হয়।

প্রভু বলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"

মহাপ্রভু নিতাইর কৌপীন চাহিলেন কেন? নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শ্রীচৈতন্যবেত্তা শ্রীনিত্যানন্দ আর শ্রীনিত্যানন্দবেত্তা শ্রীচৈতন্য।" দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ! শ্রীনিত্যানন্দের সমস্ত আবরণ কৃষ্ণরসময়, তাঁহাকে সেবা করিলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম জন্মে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, দ্বিতীয় স্বরূপ।

প্রভু নিতাইর কৌপীন লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে মস্তকে বাঁধিতে বলিলেন, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, নিতাইকে "বৈষ্ণবের অধিরাজ"

বলিয়াছেন। এখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদে বৈষ্ণবের মহিমা শ্রবণ করুন,—

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

* * * *

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ—
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, ভূষণ করি মস্তক
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

প্রভু কৌপীন খণ্ড ভক্তগণকে শিরে বাঁধিতে বলিয়া বলিতেছেন, "অন্যের কি কথা এই বস্ত্র খণ্ড স্বয়ং মহাদেবেরও বাঞ্ছিত। নিত্যানন্দের প্রসাদে বিষ্ণুভক্তি জন্মে। নিশ্চয় জানিও নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, নিত্যানন্দ বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাই, নিত্যানন্দই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী, সখা শরণ, ভূষণ, বন্ধু। তাই, নিত্যানন্দের চরিত্র বেদের অগম্য। নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবের জনক, রক্ষক ও মিত্র। নিত্যানন্দকে সেবা করিলে, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি জন্মে। ভক্তি করিয়া নিত্যানন্দের কৌপীন শিরে বন্ধন কর এবং ঘরে যাইয়া মহাযত্নে ইহা পূজা কর।"

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিল বন্ধন ॥ (চৈঃ ভাঃ)

অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভুর পাদোদক গ্রহণের কথা—

"প্রভু বলে 'শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রভু বলিলেন—"ভক্তগণ, নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ কর, এই পাদোদক পান করিবামাত্র কৃষ্ণে দৃঢ়াভক্তি জন্মে, ইহাতে অন্যথা নাই।" প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, সকলে নিত্যানন্দের চরণ পাখালিয়া, পাদোদক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মহানন্দ, তাঁহারা এক একজনে পাঁচ বার পান করিতেছেন। নিত্যানন্দের ভ্রূক্ষেপও নাই, বাহ্য ও নাই, তিনি স্বানুভাবানন্দে হাসিতেছেন। সকলে নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় "হরি" "হরি" বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "আজি ধন্য হইল জীবন", কেহ বলিল, "আজি সব ভব বন্ধন খণ্ডিল," কেহ বলিলেন, আজি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম," কেহ বলিলেন "আজিকার দিন বড়ই ধন্য," কেহ বলিলেন "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে, এখনও মুখের মিষ্টতা যাইতেছে না।"

"কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সবে হৈল চঞ্চল-স্বভাব ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায় ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥"

শ্রীগৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং নানারূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও উঠিয়াছেন। দুই প্রভু ভক্তগণকে বেষ্টন করিয়া

নৃত্য করিতেছেন। কে কার গায়ে পড়িতেছে,কে কাকে ধরিতেছে, কে কার পায়ের ধুলা লইয়া শিরে ধারণ করিতেছে, কে কার গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রভু বলিয়া কেহ ভয় করিতেছে না, প্রভু, ভৃত্য, একসঙ্গে নৃত্য করিতেছে। নিমাই নিতাই দুই ভাই আনন্দে কোলাকুলি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিতাইর পদ ভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। সে আনন্দ বর্ণনাতীত। প্রভু সারাদিন তাঁহার ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রভু আবার নিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বলিলেন— যে নিত্যানন্দ স্বরূপকে ভক্তি করে সে আমাকেই ভক্তি করে।

"ইহার চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহাকে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইহাকে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহার বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥"

প্রভুর এই সুধা মধুর বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এ অধ্যায়ের ফলশ্রুতি এইরূপ দিয়াছেন,—

"ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল তাঁহারে সে জানয়ে সর্ব্বথা॥
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥"

[প্রভুর আদেশে নদীয়ায় প্রথম হরিনাম প্রচার।]

"করুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণে কান্দে
তাহে নব প্রেমের আরম্ভ ॥
আনন্দ নদীয়া-পুরে, টলমল প্রেমভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া-চলে, বিজুরি ঝলমল করে,
চমকিত অমর সমাজে ॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহসার,
হেনরূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমেতে নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ মধ্যে ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। এমন কি পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের মধ্যেও তাঁহার বহু ভক্ত হইয়াছেন। ইহাদের সঙ্গ গুণে, আবার প্রভুর ভক্ত সংখ্যা বিস্তার লাভ করিতেছে। লোকে সুমধুর সুধা আস্বাদ করিয়া পবিত্র হইতেছে। তখনকার সমাজের অবস্থা আর একরূপ ছিল। নবশাখ ও তন্নিম্ন শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মই ছিল, ব্রাহ্মণের সেবা করা, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের প্রভুত্ব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা। এইরূপ সময়ে, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের মধ্য হইতে এক নূতন মত প্রচার হইল। সকলে এক নূতন সংবাদ শুনিল—"যেই ভক্ত সেই শ্রেষ্ঠ" "হরিভক্তি হীন ব্রাহ্মণ পশুরও অধম।" হরিদাস যবন, ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন, তাঁহাকে শ্রাদ্ধবাসরে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়াছেন।

নিম্নশ্রেণীর লোক বড়ই আশ্বাসিত হইয়া, ওই নবীন ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আসিয়া জুড়াইতে লাগিল। চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সকলেই যে এই জনরব বিশ্বাস করিতেছে তাহা নহে। তথায় প্রতিদিন বহু দেশ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছে। একটী প্রাচীন গীতে আছে—

"নদীয়ায় চাঁদের উদয় হ'য়েছে।
পাপী তাপী, অন্ধ, আতুর সারি সারি আসিছে॥"

একে নবদ্বীপ তখন বিশাল নগরী। বর্ত্তমান কলিকাতার ন্যায় দিবা-রাত্র লোকের কলরব। তাহার উপর প্রভুর বাড়ীর চারিদিকে আরও লোকসংঘট্ট, লোকসকল কেহ বা ভবরোগে আবার কেহ বা দেহরোগে প্রপীড়িত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভের জন্য আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে কাহারও বা অপূর্ব্বদর্শন লাভ হইতেছে। তাহারা আর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না। একদিন শ্রীবাসের যবন দরজী শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া "দেখেছি" "দেখেছি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ও সাত দিবস পর্য্যন্ত উন্মাদ অবস্থায় নবদ্বীপ নগরে ভ্রমণ করিয়া চেতনা লাভ করিল। পরে সে প্রভুর ভক্ত হইয়া উদাসীন-ব্রত গ্রহণ করিল। আর তখন যেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে "কোলের ছেলে বাহু তুলে" হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোক লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণ প্রেম অকৈতব

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়)

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়। (শ্রীচৈঃ চঃ)

প্রেম নিরুপাধি। কৈতবের গন্ধও প্রেমে থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কৈতবের স্থান কৃষ্ণ প্রেমে নাই। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম অবিচ্ছিন্ন অকৈতব রূপে সদাই দীপ্তমান। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, জাম্বুনদ হেম সদৃশ অনুদিন বর্দ্ধনশীল। এই বর্দ্ধিত প্রেমের একটা সীমা নাই। "অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল"। একমাত্র পুরুষ শ্রীকানাইয়া লাল আর সব প্রকৃতি। জীব প্রকৃতি গোপী আনুগত্যে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম পিপাসী হইবে; ইহাই পূর্ব্বাপর মহাজনগণের আচরিত ও প্রচারিত চিরন্তন ধারা। তাহার ব্যতিক্রমে ব্যভিচার দোষে জীব প্রকৃতি কলুষিত হয়। এই প্রেম সম্বন্ধ শুধু জীবাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভবে। মহাজনগণ বলেন, গোপীগণের কামই প্রেম। অখিল জীবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জীব বুদ্ধিতে ও গোপী-গণ, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমসহ সেবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ভাবই অমৃতময় হইয়া পরমানন্দ রস উৎসারিত হয়। যাঁর পাদপদ্ম ক্ষরিতা সুরধুনীতে, অনন্ত নদ নদীর জল প্রবেশ করিয়া গঙ্গোদকই হয়; তখন সেই অনন্ত মূলাধার মহাপুরুষের সঙ্গগুণে কি না হইতে পারে? অকৈ-তব কৃষ্ণপ্রেম নরলোকে অর্থাৎ নরে নরে হইতেই পারে না। এবং হইবার আশাও দুরাশা। তাই সিদ্ধ মহাজনগণ বলিয়াছেন :—

যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥

যদিই বা কশ্চিৎ নরে নরে এহেন প্রেমের সংঘটন হয়, তা'হলে বিয়োগ অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি হয় না। কারণ দুই প্রাণে এক হইয়া যায়। দেহ দুই, আত্মা এক। এক সঙ্গে জীবন, এক সঙ্গে মরন। কশ্চিৎ কোন রসিক-শ্রেষ্ঠ মহাজন সেই ভাব রসে সিদ্ধিলাভ করিয়া, জগতে চিরকালের জন্য অমরকীর্ত্তি রাখিয়াগিয়াছেন। তাহারা ছিলেন কৃপাসিন্ধু। তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিতে যাওয়া শুধু বাতুলতা। রসিকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস রজকিনীকে দেখিতেন ও ভাবিতেন :—

তুমি বেদ বাসিনী, হরের গৃহিনী, তুমি সে নয়ন তারা।
তোমার কারণে, ত্রিসন্ধ্যাযাজনে, আমি যে পাগল পারা ॥
রজকিনারূপ, কিশোরি স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনীপ্রেম, নিকসিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

অপ্রাকৃত দেহ বুদ্ধি লইয়া সিদ্ধভাবের আরোপে, চণ্ডীদাস ঠাকুর রামি রজকিনীকে কিশোরিধ্যানে, কৃষ্ণপ্রেম সেবার সংচরী মনে করিতেন। চণ্ডীদাস মরিলেন, চিতাশয্যায় উঠান লইল কিন্তু রজকিনীর প্রেমের ডাকে আনন্দে জাগিয়া বসিলেন। 'এক পিরিতে দু'জন মরে, রসিক বলি তারে ॥' চণ্ডীদাস ছিলেন রসিক' শ্রেষ্ঠ। তাই অঘটন ও সংঘটন হইয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রেমের হাটে দীক্ষাদাতা গুরুও সখীরূপা হইয়া পরেন। যথাঃ—

গুরুরূপা সখিবামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে।
চামরের বাতাস করিব। (ঠাকুর মহাশয়)

একজন সিদ্ধ মহাত্মা সমবেত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, বন দাবানলে দগ্ধ হইলে, হরিণদম্পতি প্রচণ্ড তপনতাপে তাপিতাবস্থায়, এক মাঠে উপস্থিত হইল। জলপিপাসায় উভয়েরই প্রাণ যায় যায়। হরিণী ছিল আবার

পূর্ণাগর্ভবতী। বহু চেষ্টায় একটু জল পাওয়া গেল বটে কিন্তু সেটুকু পান করিলে একজনের প্রাণ রক্ষা হয়। দুজনে পান করিলে কাহারও তৃষ্ণা নিবারণ না হইয়া, উভয়েই মরিবে। এমতাবস্থায় পরস্পরে সে জলটুকু পান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন পান করিতে কিছুতেই চাহিল না। উভয়েই আকুল পিপাসায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।" এই গল্পটী বিস্তারিত ভাবে বলিয়া সাধুমহাত্মা প্রশ্ন করিলেন, বল দেখি এখানে কার প্রেম বেশী? কেহ কেহ অনেক যুক্তিদ্বারা হরিণ এবং হরিণীর প্রেমের তারতম্য দেখাইতে লাগিলেন। সাধুমহাত্মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এখানে প্রেমের গন্ধ মাত্রও নাই। ইহা শুধু কৈতব বা মায়ার কার্য্য। যদি শুদ্ধ প্রেম হইত, তবে একজনে পান করিলে দু'জনেই বাঁচিত। কারণ প্রেমেতে দুইপ্রাণ এক হয়।"

মহাত্মাগণ কামপ্রেমের লক্ষণ দেখাইয়াছেন ঃ—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥

* * *

কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ (চৈঃ চঃ)

প্রেমেতে আত্মবুদ্ধি বিলোপ হয়। জগন্ময় শুধু প্রেমময় রসিকশেখরের প্রেমরসের অভিনয় নিত্য নব নব ভাবে উপলব্ধি হয়। তখন রসাল নন্দন জগতে ভক্ত,—"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রই হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

প্রেমের একমাত্র আপদ, পরম করুণ রসিকশেখর, নবীননাগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণহ্লাদিনী শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রয় ভিন্ন, প্রেমের সন্ধান পাওয়া সুদুর্লভ। তাই প্রেমপিপাসি ভক্তগণ, রাধাভাবের নিত্যসিদ্ধ রাধানুগতা

ভাবসিন্ধুর কণা লাভে যুগল সেবানন্দ সুখামৃত লাভ করিতেন। সিদ্ধ চণ্ডীদাসঠাকুরও রামি রজকিনীর প্রতি শুদ্ধপ্রেমের আরোপে ব্রজরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। ইহা অপ্রাকৃত দেহ, মন ও বুদ্ধির কাজ। রসিক ভক্তগণের ভজনপ্রাণালীই সিদ্ধদেহে প্রেম সেবা। রসিক ভক্ত কোটীতে গুটীক মিলান ভার। তাই রসিক মহাজন বলেন:—"সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।" অন্য একজন রসিক মহাজনের পবিত্র প্রেম-কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। ঠাকুর জয়দেব বৈষ্ণবজগতের এবং সাহিত্যজগতের চির আদর্শস্থানীয়, চিরস্মরণীয় এবং চিরপূজ্য। তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দে ত্রিভুবন আমোদিত ও আলো-কিত। ঠাকুর জয়দেব তৎপত্নী পদ্মাবতীর সহিত যে অভিনব প্রেম-রসের জোয়ারে ভাসিলেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। তাঁহাদের একটী প্রেমকথা এই:—শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবানন্দরসে আত্মহারা হইয়া দম্পতী-যুগল ছিলেন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বাড়ীতে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন ঠাকুর জয়দেবের সঙ্গেদিবানিশি কৃষ্ণকথারসে বিভোর থাকিতেন। রাজমহিষীর ভাই মরিয়াছেন এবং তৎপত্নী সহগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে রাজ্ঞী ভ্রাতৃজায়ার সতীত্বের ও প্রেমের গৌরব করিয়া পুরনারীবৃন্দের নিকট কত কথাই বলিতেছেন।

পদ্মাবতী বলিলেন—ইহাতে আনন্দ ও গৌরবের কিছুই নাই। এখানে কর্ত্তব্য কার্য্যই হইয়াছে, কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নাই। ইহা দূর-সম্পর্কের কার্য্য। ভক্তমালে পদ্মাবতীর বাক্য:—

প্রিয়াধীন প্রাণ প্রিয়হীন ক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র॥

প্রেমাধীন প্রাণের স্বভাবই "বিয়োগ হইলে কেহনা জীয়য়।"

পদ্মাবতীর সৃষ্টিছাড়া কথা শ্রবণে রাণী বিস্মিতা হইলেন বটে, সঙ্গে সঙ্গে রাগও আসিল। মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে যুক্তিকরিয়া, হঠাৎ একদিন জয়দেবের মৃত্যুসংবাদ অন্তঃপুরে প্রচার করিয়া, পদ্মাবতীর কথার সার্থকতা পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। সুরম্য রাজোদ্যানে মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে জয়দেবঠাকুর কৃষ্ণকথারসে বিভোর আছেন, হেন কালে পূর্ব্বযুক্তি অনুযায়ী ঠাকুরের মৃত্যুর মিথ্যাসমাচার অন্তঃপুরে পৌঁছিল। তখন :—

রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদ্বার।
শুনিমাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার॥ (ভক্তমাল)

শ্রীভক্তমালের অমিয় নিষ্যন্দিনী ভাষাতেই উপসংহার করিতেছি। যথা :—

* * *

রাণী অপরুদ্ধ হইয়া করে হাহাকার॥
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিল সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোসাঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণ-নামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার॥
এত কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে॥
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে।
স্বামীবুদ্ধি করি হয় আসক্ত কুরসে॥

পাছে বুঝ পদ্মাবতী তেমতি-আশয়।
স্বামী সম্বন্ধ মতে কৃষ্ণ প্রেমময়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত।
অতএব স্বামী প্রেম ব্যক্তি অপ্রাকৃত॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জগৎ স্বামী। কৃষ্ণপ্রেমে প্রাকৃত অপ্রাকৃত হয়, কাম প্রেম হয় আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সুরসাল হইয়া নিত্য নব নব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। তখন জীব নিত্যানন্দের নিত্য সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী একমাত্র কানাইয়ালাল। সেই সচ্চিদানন্দ স্বামীর সেবাসাহচর্য্যের সম্বন্ধে কেহ বন্ধু, কেহ সখি ইত্যাদি। স্বামী স্ত্রী সংযোগের উদ্দেশ্য এই যে, যুগলে মিলিয়া সেই অপ্রাকৃত নিত্য-যুগলের চরণ সেবা। সেই নিত্য জগতের ছায়াই এই মরজগত। ইহা ভিন্ন স্বভাবই প্রাকৃত ও কাম। প্রাকৃত মন বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করা বিপজ্জনক। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাহা ভুলিয়া যাওয়াতেই মায়াপাশে বদ্ধ হইল। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসাধ্য, শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে তাহা জাগ্রত হয়। প্রেমলাভের একমাত্র উপায় একান্ত ভাবে নাম গ্রহণ। প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরি প্রেমের সুদুর্লভতা দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন :—

দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিও নিশ্চয়॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুগত্যে আকুল ব্যাকুল চিত্তে, দীনহীন কাঙ্গাল অভিমানে ভক্তের সদাই ভাবনা :- -

২

'কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ। (ঠাকুর মহাশয়)

চাই শুধু অবিচ্ছিন্ন লালসা ও আর্ত্তি। ঠাকুর নরোত্তম প্রবল লালসা উদ্বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিতেছেন :—

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব,

প্রেমধন আর্ত্তি বিনা লাভ হয় না। প্রেমের কণালাভে জীব আনন্দ লাভ করে। প্রেমেতে আত্মপর ভুলিয়া জীব ইষ্টসেবায়রত হয়, এহেন প্রেম সেবা সুদুর্লভ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে মহাজনগণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপরাধী জীব কোটী জনম সাধনেও প্রেম লাভে অসমর্থ। সর্ব্বযুগসার কলিযুগ মহাজনগণ কেন বলেন ? না ; এইযুগে —

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যে কা কথা॥—(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর আর করিলেন কি ?

ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়া করতালী॥ (মনঃশিক্ষা)

সে জন্ম মহাজন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন :—

গোরা দ্বিজনটরাজে, বান্ধহ হৃদয়মাঝে,
কি করিবে সংসারশমন।
নরোত্তম দাসে কয়, গোরা সম কেহ নয়,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।

আমি মায়াবদ্ধ কামের দাস। তাই :—

"নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥"

আমার— দিন গেল মিছাকাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবৃন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মারায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥

আর আমার :—

স্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল।
ছাড়াইতে না পারিলাম এ ভব জঞ্জাল॥

অগতির গতিদাতা পতিতপাবন হা গৌরনিতাই! এ দীনহীন কাঙ্গালের আপন বলিতে আর কেহ নাই। কুসঙ্গে কুরসে মত্ত হইয়া রহিয়াছি। নিজগুণে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দাও। আমার আর বলিবার কি আছে! জয় কাঙ্গালের বন্ধু পরম দয়াল শ্রীশ্রীগৌরনিতাই!

শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্যের বৈরাগ্য

(শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা)

যমুনাচার্য্য রাজা হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রজাপালনের প্রভাব জাগ্রত হইল। রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি হইল। প্রতাপান্বিত হইলেও প্রজারঞ্জকের সম্মান ও প্রশংসার অধিকারী হইলেন। বিবাহিত হইলেন। পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

ভাণ্ডার ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইল। সুখ সাচ্ছন্দ্যে রাজ্য যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে লাগিল। রাজা রাজকার্য্যে তন্ময় হইলেন।

এই সময় মহাত্মা নম্বী চিন্তান্বিত হইলেন। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দির হইতে বাহির হইলেন। পাণ্ড্যরাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিরূপে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের সেবাকার্য্যে তাঁহার সুযোগ্য অধিকারী শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্যকে আনিতে পারেন মনে মনে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

রাজধানীতে আসিলেন। রাজদ্বারের রাজপথ অগণ্য রাজন্যগণের যান বাহনে সমাকীর্ণ দেখিলেন। তাহার মতন নগণ্য সন্ন্যাসীর রাজদর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিলেন। শেষে সমী শাক সংগ্রহে বাহির হইলেন। এই শাক সত্ত্বগুণ উদ্দীপক। রাজ-গণের প্রিয়খাদ্য। সাধুগণেরও বাঞ্ছনীয়। অনেক স্থানে দুষ্প্রাপ্য।

নম্বী শাক সংগ্রহ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়া দাস দাসীগণের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাহাদের সাহায্যে পাচকব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করিলেন। এবং তাহাকে শাক দিয়া বলিলেন, "মহারাজকে এই শাক পাক করিয়া খাইতে দিও।"

পাচক শাক পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। মহারাজ যমুনাচার্য্যকে উত্তমরূপে রান্না করিয়া খাইতে দিল। নম্বী প্রত্যহ শাক আনিয়া দিতে লাগিলেন। প্রত্যহ ব্রাহ্মণ মহারাজকে শাক রান্না করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে এক মাস গত হইল। একদিন নম্বী আর আসিলেন না।

মহারাজ ভোজনে বসিয়া, সেদিন শাক না দেখিয়া বলিবেন, "আজ শাক রান্ধ নাই?"

ব্রাহ্মণ—একটী সাধু প্রত্যহ আপনার জন্য শাক দিয়া যান। তিনি আপনাকে খুব ভক্তি করেন। আজ আর শাক আনেন নাই।

রাজা—শাকের মূল্য দিয়া থাক ?

ব্রাহ্মণ—না, তিনি কোন মূল্য নেন না। আপনাকে ভক্তি করিয়াই দিয়া যান।

রাজা—আবার আসিলে আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করাইও।

পরদিন নম্বী আবার শাক নিয়া যেমন প্রাতে উপস্থিত, পাচক ব্রাহ্মণ অমনি তাঁহাকে রাজার নিকটে উপস্থিত করিল। মহারাজ উৎফুল্ল হইলেন। উচ্চাসনে উপবেশন করাইলেন। এবং কোন প্রার্থনা থাকে ত জানিতে চাহিলেন।

নম্বী করযোড়ে ধীর ভাবে, সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমার নিকটে আপনার বহু মণি মাণিক পূর্ণ এক অতি বৃহৎ স্বর্ণকলস গচ্ছিত আছে। তাহা আপনার পৈতৃক সম্পত্তি। তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে আপনার এই রাজৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ। অতএব আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আপনার সম্পদ আপনাকে দিয়া আমি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। সেই সম্পত্তি গোদাবরী তীরে রক্ষিত আছে। এক ভীষণ সর্প তাহা আপন কুণ্ডলের মধ্যে করিয়া তদুপরি স্বীয় ফণা বিস্তৃত করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছে। এক মহাকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস প্রতি দ্বাদশ দিনে তাহা পরিদর্শন করিয়া চলিয়া যায়। আপনি যাওয়া মাত্র তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তবে আপনার এক মাস সময় লাগিবে।

মহারাজ যমুনাচার্য্য সংবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তখন কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য অধিকার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তজ্জন্য বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। সৈন্য সামন্ত লইয়া নম্বীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু নম্বী বলিলেন, আপনার পিতৃলোকের আদেশ আছে, তাহা লইতে প্রথমতঃ আপনার

একাই যাইতে হইবে। তাহা অতি গোপনীয় ধন। গোপনেই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভার বহনের লোকের অভাব হইবে না।

মহারাজ যমুনাচার্য্য নম্বীর সঙ্গে চলিলেন। রাজকার্য্যের ভার এক মাসের জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাণীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিলেন। সমস্ত দিকের সুবন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন।

নম্বী ও যমুনাচার্য্য একত্রে চলিলেন। ক্রমে স্নানের সময় হইল। এক জলাশয়ে স্নান করিয়া তীরে ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে বসিলেন। এই সময় নম্বী একটু গীতা পাঠ করিতে বসিলেন। পাঠের সময় গীতার দু এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া মহারাজ যমুনাচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। যমুনাচার্য্য গীতা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। যেন অপহৃত মাধুর্য্যের আভাস প্রাপ্ত হইলেন। যেন বিস্মৃত স্বজনের কথা স্মৃতি পথে উদিত হইল।

পরদিন নম্বী আবার স্নানান্তে গীতাপাঠ করিলেন। একটু বেশীক্ষণ পাঠ করিলেন;—ব্যাখ্যা ও একটু বেশীক্ষণ করিলেন। যমুনাচার্য্য নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ক্রমে সাত দিন এইরূপে গত হইল। নম্বী কহিলেন "মহারাজ, আর পাঁচ দিন পরে আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইব।" যমুনাচার্য্য হাত যোড় করিয়া অবনত শিরে বলিলেন "আপনি আর আমাকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।"

নম্বী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দেব, আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন, আমিই আপনার শিষ্য।"

উভয়ে এইরূপ গীতা অধ্যয়ন করিয়া চলিতে লাগিলেন। দশম দিনে অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হইল। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" পাঠ শেষ হইল। নম্বী কহিলেন "দেব, আপনার বড় পথশ্রম হইতেছে।

আর মাত্র দুই দিন পরেই আমরা আপনার পৈত্রিক ধনরত্নের ভাণ্ডারে উপস্থিত হইব।" যমুনাচার্য্য কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "দেব! আর আমার পৈত্রিক ধনরত্নের আবশ্যক নাই। আর আমার রাজ্য বিস্তারে আকাঙ্ক্ষা নাই,—ভোগসুখের ধনরত্নের প্রয়োজন নাই,—প্রভুত্বের সিংহাসনে বসিবার ও প্রবৃত্তি নাই। আপনি আমাকে ত্রিতাপের গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—আমার মোহ পাশ ছিন্ন করিয়াছেন—দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন। আপনি আমাকে যে ধন দান করিয়াছেন তাহাই আমার যথেষ্ট—যথেষ্ট হইতেও যথেষ্ট। আর সেই পৈত্রিক ধনরত্নের নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। সেই মহাকায় রাক্ষস এবং ভীষণ কাল সর্পের কবল হইতে সেই ধনরত্ন গ্রহণের ও প্রবৃত্তি নাই। আর দারাপুত্র স্বজনগণ পরিবেষ্টিত রাজধানীতে যাইবারও আমার প্রয়োজন নাই। এখন কোন নির্জ্জন পবিত্র ক্ষেত্রে আমাকে লইয়া চলুন। আমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমপুরুষ পরমকরুণাময় নারায়ণের উপাসনায় নিযুক্ত হইব।"

নম্বী যমুনাচার্য্যের সঙ্কল্প শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার সুপবিত্র সংকল্প অনুসারেই কার্য্য হইবে। তবে আমার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ করিতে হইবে। না হইলে আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গপাপে লিপ্ত হইব।"

দ্বাদশ দিনে গোদাবরী তীর্থে উভয়ে স্নান করিলেন। তার পরে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মনোহর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ প্রিয়তম সেবক শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্যকে দর্শন দেওয়ার প্রথম দিন। শ্রীবিগ্রহে শ্রীশ্রীনারায়ণের আবির্ভাব হইল। শ্রীমন্দির অঙ্গকান্তিতে উদ্ভাসিত হইল। ইন্দ্র নীলরত্ন মণির মনোহর প্রভায় মন্দিরে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হইল। অনন্ত নাগদেবের সমুজ্জল

কুণ্ডলোপরি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ—উপরে—মণিরত্ন খচিত ফনাসমূহ। আজ সমস্ত জীবন্ত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্য নীরবে নিস্পন্দ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন নম্বী কহিলেন, "এই সেই আপনার পৈত্রিক ধন। ঐ মহাসর্প-রূপ দেবদেব অনন্ত আপনার কুণ্ডলমধ্যে রাখিয়া উপরে ফনা বিস্তার করিয়া ইহা রক্ষা করিতেছেন। আর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথদেবের অভিন্নহৃদয় মহাভক্ত বিভীষণ প্রতি দ্বাদশ দিনে আসিয়া এই অমূল্য ধন পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কল্য সেই আসিবার দিন। আমি আপনার পৈত্রিক ধন আপনাকে দেখাইয়া দিলাম,—আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। এখন আপনার যাহা অভিরুচি আপনি করুন।"

শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্য সজল নয়নে নিস্পন্দ হইয়া এক ধেয়ানে সেই ত্রিভুবন-মোহন রূপ দেখিতে লাগিলেন। তিল তুলসী পরশ করিয়া মন প্রাণ তাঁহার শ্রীচরণকমলে অর্পন করিলেন। রঙ্গময় রঙ্গনাথের রঙ্গ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই। অথবা যাহাকে তিনি করুণা করিয়া শক্তি দান করেন, সেই কিছু বুঝিতে পারে। যে বুঝে সেই মজে সেই ভজে। আর সেই আনন্দ পিপাসু মোহান্ধ মানুষকে ডাকিয়া বলে,—

"ভজ গোবিন্দং স্মর গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে।"

যে যমুনাচার্য্য একদিন মহারাজ আলোয়ার ছিলেন, তিনি আজ হইতে অনন্ত রঙ্গময় শ্রী রঙ্গনাথ জীউর সেবক, মোহান্ত মহারাজ শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্য হইলেন।

———

সত্যদর্শন

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৪)

পরদিন সংজ্ঞালাভে চক্ষুরুন্মীলন করতঃ ভিখারী দেখিল, সে তাহারই কুটীরে তাহারই মত অপর এক ভিখারীর ক্রোড়ে শুইয়া রহিয়াছে। তাহার আশ্রয়রূপী ভিখারীর মুখে মৃদু মধুর হাস্য! সে তখন অতি ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" উত্তরে জানিল তিনি একজন দৈবজ্ঞ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি যখন দৈবজ্ঞ, তখন গণনা করিয়া আমার অদৃষ্ট আমাকে বলুন। আর কতকাল এইরূপ দুঃখভোগ করিতে হইবে।' দৈবজ্ঞ তখন হাসিয়া বলিলেন, 'স্থির হও, ভাই, আগে সুস্থ হও। তুমি নিজ অজ্ঞতায় অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়াছ! তোমার পিতা তাঁহার দেহাবসান কালে তোমার জন্য যথেষ্ট সঞ্চিত ধন রাখিয়া গিয়াছেন! যদি তুমি তাহা জানিতে, তাহা হইলে কি এতকষ্ট পাইতে?' এইকথায় ভিখারীর দেহে যেন নূতন জীবনের সঞ্চার হইল! সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, 'আমার ধন আছে? কই? কোথায়? অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উহার সন্ধান বলিয়া দিন!' দৈবজ্ঞ বলিলেন, 'ওইগুলি তোমার এই কুটীরেরই পূর্ব্বদিকে মাটীর নীচে প্রোথিত আছে। সুস্থ হইয়া উঠিয়া ওই ধন উঠাইয়া লইও! দেখিও যেন দিক্‌ভ্রমে পতিত হইয়া অন্যদিকের মাটী খুলিও না! কারণ, দক্ষিণদিকে খুলিলে সেখানে ভীমরুলের বাসা আছে, তাহারা উঠিয়া তোমায় দংশন করিবে; পশ্চিমদিকে এক যক্ষ আছে, ওদিকে খুলিলে সে উঠিয়া তোমার ধনপ্রাপ্তিতে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে; এবং উত্তরদিকে এক

কৃষ্ণবর্ণ অজগর সর্পের বাসা আছে, সেদিকের মাটী খুলিলেই তাহার কবলে পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বদিকে তোমাকে অধিক মাটী খুলিতে হইবেনা, অল্প মাটী উঠাইলেই ধনের "জাড়ি" তোমার হস্তগত হইবে।'

ধনের সন্ধান পাইয়া দরিদ্রের ক্ষীণদুর্ব্বল দেহ আশার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল! সে আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই দৈবজ্ঞের উপদেশমত পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া মাটী খুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতৃধন আছে এই বিশ্বাসে তাহার পূর্ব্বদুঃখ সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, এখন অল্প মাটী খুলিতেই ধনের 'জাড়ি'র প্রত্যক্ষ সন্ধানও পাওয়া গেল! ধনপ্রাপ্তির আশা ফলোন্মুখী দেখিয়া শতগুণ উৎসাহে আজন্ম অভাবগ্রস্থ ভিখারী,—তাহার বাহুতে তখন কত বল তাহার সীমা নাই, —সবলে ধনসহ বিপুলভার "জাড়ি" উঠাইয়া ফেলিল! ধনপ্রাপ্তিতেই দারিদ্র্যনাশ! দারিদ্র্যনাশেই অভাবমুক্তি!

এ জগতে মানব স্বকর্তৃত্বে,—নিজ চেষ্টায় নিজ অভাবমোচনের জন্য প্রত্যহই কত বিবিধ সাধনায় নিযুক্ত হইতেছে। ধনাধিদেবতার, যশাধিদেবতার, অন্নাধিদেবতার,—এমনি কতই না অধিদেবতার শরণাপন্ন হওতঃ তাঁহাদের পূজায় রত হইতেছে, এবং ধন-যশ-অন্নাদি প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু সকলেই কি পূর্ণকাম হইতেছে? নিশ্চয়ই নহে; তাহা হইলে সকলেরই ওই সকল পাইবার জন্য চাঞ্চল্য চিরদিনের জন্য লোপ পাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। তবে কেহ কেহ ভাগ্যবশে ওই চাঞ্চল্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষাতীত অদৃষ্ট সত্যের বিকাশ দর্শন করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পড়েন, এবং সাধুরূপী দৈবজ্ঞের উপদেশমত নির্দ্দিষ্ট দিক বা সাধনমার্গ অবলম্বন করতঃ আপনাপন পৈত্রিক ধন বা ভগবৎ প্রেম,—যাহা প্রত্যেকের সত্ত্বাতেই নিহিত আছে, তাহা লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য অভাবমুক্ত হইয়া থাকেন। ভগবৎ প্রেমই

বিশ্বকেন্দ্রের আকর্ষণ, উহা সকল মানবেই আছে, তবে অজ্ঞতাবশতঃ যে উহার সন্ধান পায় না, তাহাকে বিশ্বের বহু ব্যষ্টিকে লইয়া পূর্ণ হইবার চেষ্টায় নিয়ত চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে হয়।

বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বকেন্দ্র বা বিশ্বাধারই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বস্থিত প্রত্যেক স্বতন্ত্র অণু-পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়াই সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার আকর্ষণেই বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যষ্টি,—সুতরাং প্রত্যেক মানবও,—ধৃত বা অবস্থিত রহিয়াছে। আমরা আছি শুধু তিনি আছেন বলিয়া নহে,—তিনি আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া। তিনি ও তাঁহার আকর্ষণ অথবা আকর্ষক তিনিই বিশ্বাধার,—বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়। অতএব শুধু তিনি নহেন, তিনি ও তাঁহার প্রেম, অথবা প্রেমময় তিনিই আমাদের সকলের আশ্রয় সত্যস্বরূপ। তিনি আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাঁহার নামও 'কৃষ্ণ',—এইরূপেই—আকর্ষক বা কৃষ্ণরূপেই তিনি সত্যস্বরূপ। অন্যরূপেও তিনিই আছেন বটে, তবে উহা বিচিত্র বিশ্বে তাঁহার বিচিত্র প্রকাশ, শুদ্ধ-সত্য-স্বরূপ-প্রকাশ নহে। বিশ্বে তাঁহার এই সত্যরূপের প্রকাশ আকর্ষণের বা প্রেমের মধ্যদিয়া, তাই এই বিশ্বে তিনি প্রেমময়। মানব তাঁহাকে আকর্ষণ ব্যতীত—প্রেমব্যতীত ভাবিতেই পারে না। আকর্ষণকে তাঁহা হইতে পৃথক করিলেই বিশ্বের সহিত তিনি সম্বন্ধ শূন্য। এই প্রেমই তাঁহার শক্তি, প্রেমেই বিশ্ব আশ্রিত, প্রেমই বিশেষ ধর্ম্ম। এই প্রেম বিশ্ব যতকাল আছে তত-কালই বর্ত্তমান, ইহা পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, এবং এখনও আছে, অতএব ইহা সনাতন ধর্ম্মও বটে। তিনি আছেন, তাঁহার এই অস্তিত্ব প্রেমের ভিতর দিয়াই বিশ্বে

কৃষ্ণই সত্যস্বরূপ।

প্রেমময় রূপেই তিনি বিশ্বাশ্রয়।

প্রেমই সনাতন ধর্ম্ম।

প্রকাশিত, এবং এই রূপেই—প্রেমময় রূপেই তাঁহাকে পাইয়া বিশ্বের আনন্দলাভ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সচ্চিদানন্দত্ব তাঁহার প্রেমময় প্রকাশেই সত্যরূপে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বে যে আমি আছি, আমার এই থাকা বা অস্তিত্ব আমি কেমন করিয়া বুঝি? আপনাকে পৃথক করিয়া। আমি আমার চতুর্দ্দিকে যত কিছু দেখিতেছি ওই সকল হইতে আমার 'আমি'কে বা অস্তিত্বকে পৃথক করিয়া লইয়া এবং সেই ভাবে চিন্তা করিয়া। আমি তুমি নহি, সে নহি, রাম নহি, রমণী নহি, গরু নহি, ঘোড়া নহি, গাছ নহি, মাটী নহি, পর্ব্বত নহি, ইত্যাদিরূপে সমস্ত হইতে 'আমি'কে পৃথক করিয়া লইয়া তবে বুঝি 'আমি' আছি। আমাকে আমার 'অস্তিত্ব' বুঝাইতে 'আমি' ব্যতীত 'তুমি', 'সে', প্রভৃতি অন্য কিছু,—যাহার সহিত তুলনা করিয়া নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইতে পারা যায় এমন অন্য কিছু আমার চাই-ই, নতুবা আমার 'অস্তিত্ব'ই আমার কাছে সত্য হয় না, জানা হয় না। আমার সত্যরূপে থাকার জন্য,—আমার 'আমাকে' জানিবার জন্য তোমাকে, তাহাকে, আমার প্রয়োজন; নতুবা আমি যে আছি, কি করিয়া বুঝিতাম? অতএব আমি আছি তোমাকে বা তাহাকে বা অন্য কিছুকে,—যাহার সহিত নেতিমুখে বিচার করিয়া আমি আমার থাকাটি বিশেষ করিয়া বুঝি, সেই কিছুকে আশ্রয় করিয়া। এখানে 'আমি' বিষয়, 'তুমি' আশ্রয়। প্রত্যেকেই আপন সত্ত্বাকে এই বিষয় ও আশ্রয় সাহায্যে বুঝে। আবার প্রত্যেক সত্ত্বাকে বুঝিতেও এই বিষয় ও আশ্রয় প্রয়োজন। সেই বিশ্বকেন্দ্রকে সত্য করিয়া বুঝিতে হইলেও বিষয় ও আশ্রয় এই দুই ভাবের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি বিষয়, আছেন প্রেম আশ্রয় করিয়া,—শক্তি আশ্রয় করিয়া। সেই প্রেম কিরূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি আছেন?—প্রত্যক্ষরূপে যদি

এই প্রেমকে বুঝিতে চা'ন, তবে প্রেমের মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। আমি কাহাকেও যদি আকর্ষণ করি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আকৃষ্ট হইয়া আমার নিকট উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ আপনি কি আমার আকর্ষণ বুঝিতে পারেন? কখনই না। আমার আকর্ষণ তাহাকে আকৃষ্ট করতঃ আমার নিকট তাহাকে আনিয়া দিয়া তাহাতেই মূর্ত্ত হয়, তখন আপনি দেখিতে পান আমার আকর্ষণ আছে, এবং উহা তাহাতেই প্রকাশিত বা মূর্ত্ত। ফলের ভূতলে পতনেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মূর্ত্ত। আকৃষ্ট হইয়া যাহা সমীপাগত হইয়া আছে তাহাতেই আকর্ষণ মূর্ত্ত, অথবা তাহাই আকর্ষণের মূর্ত্তি। মানবসত্ত্বা মানবদেহে মূর্ত্ত হইয়া আছে বলিয়াই দেহকে মানবের মূর্ত্তি বলে। এখন দেখুন কে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিয়ত কৃষ্ণারাধনময়ীরূপে কৃষ্ণসঙ্গতা? কাহার নেত্র শুধু কৃষ্ণই দেখে, কর্ণ শুধু কৃষ্ণ কথাই শুনে, নাসিকা কৃষ্ণাঙ্গসৌরভেই মত্ত, জিহ্বা কৃষ্ণরসই আস্বাদন করিতেছে, অঙ্গ কৃষ্ণালিঙ্গনেই অবস্থিত, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণতোষণ কর্ম্মরত, মন কৃষ্ণচিন্তাতেই মগ্ন, বুদ্ধিতে কেবল কৃষ্ণেরই প্রকাশ, অহংকার কৃষ্ণসম্বন্ধে, চিত্ত কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময়? যাঁহাতে আকর্ষণের এবম্বিধ প্রকাশ,—যিনি প্রেমের এইরূপ বিকাশময় মূর্ত্তি, তিনিই প্রেম; তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বিশ্বকেন্দ্র বিশ্বে মূর্ত্ত। এইরূপে সেই সত্যকে দর্শন করিয়াই উপনিষদ্‌কার গাহিয়াছেন,—

"তদেতন্মিথুনমোমিত্যে তস্মিন্নক্ষরে
"সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত
"আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামন্॥"

(ছাঃ উঃ ১ম ৬ষ্ঠ)।

ওই রূপেই—যুগলেই—সেই সত্যস্বরূপ 'ওম্' এই অক্ষরে বা প্রণবে নিত্য বর্ত্তমান; এই যুগলরূপেই তিনি স্বপ্রকাশ, পূর্ণকাম বা সম্পূর্ণ।

ইহাই বিশ্বপ্রাণ! ইহাই চরম এবং পরমতত্ত্ব,—তুরীয় যুগল! বেদেও দেখিতে পাই,—

"আনীদবাতং স্বধয়া তদকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥"—(ঋগ্বেদঃ ১০ম)।

সকলের পূর্ব্বে অর্থাৎ এই বহুত্ব বিশিষ্ট বিশ্বের কেন্দ্রে একটি অচঞ্চল প্রাণ (শ্বাস প্রশ্বাস রূপে যাহা চঞ্চল নহে) স্বধা দ্বারা বা নিজ আশ্রয় শক্তিসহ বর্ত্তমান, অর্থাৎ যুগলে অবস্থিত। গীতাতেও কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।" (১৩।১৯)

এই প্রকৃতি ও পুরুষ,—শক্তি ও সত্ত্বা,—আশ্রয় ও বিষয় উভয়কেই অনাদি (সুতরাং অনন্তও) জানিবে। দুইটি অসীম সত্ত্বা অসম্ভব, একাধিক হইলেই অখণ্ডত্ব—অসীমত্ব—অনাদিত্ব আর সম্ভব হয় না, উহাদের মধ্যে সীমা চাই-ই, তবেই দুই হইবে। গীতা এমন একটি অসম্ভব তত্ত্ব গান করিলেন কেন? ইহার উত্তর, যদিও বিষয় এবং আশ্রয় এই দুই রূপে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকি, বস্তুতঃ উহা এক, সুতরাং অনাদিত্ব অসম্ভব নহে। ইহাই বিশ্বের তুরীয় ভাব, এই ভাবে বিশ্বের বহুত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নিক্রিয়, কারণনিমগ্ন, বিশ্ব ও বিশ্বকেন্দ্র উভয়ে এক ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেনও। কেমন করিয়া এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত? দেখা যাউক এই প্রত্যক্ষ জগতে আমরা এতদ-স্বরূপ চিত্র পাই কি না!

আমরা একটী বাটী দেখিয়া উহা 'একজন গৃহস্থে'র বাটী বলিয়া থাকি। ওই বাটীতে পাঁচ-সাতজন লোক থাকিলেও আমরা জানি এবং বলিয়াও থাকি উহা 'একজন' গৃহস্থেরই বাটী, এবং অপর সকলেই উক্ত 'একজন' গৃহস্থেরই পরিজন। যদি ওই বাটীতে বহুজন দেখিয়াও,

কেহই উহার মধ্যে 'একজনের' উপলব্ধি করিতে না পারিয়া থাকেন, এত বড় একটা মিথ্যা ভাব কেমন করিয়া সকলকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়া বর্ত্তমান আছে? কেন সকলেই বলেন 'একজন' গৃহস্থ? ওই বাটীস্থ বহুজনের মধ্যে একত্ব ভাব কেমন করিয়া কোথায় বর্ত্তমান, এইটুকু ধরিতে পারিলেই আমরা পূর্ব্বোক্ত সত্যটির একটু আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ওই বাটিতে একাধিক জন থাকিলেও সকলেই উহার মধ্যবর্ত্তী 'একের' সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান, এবং সেই 'এক'জনই গৃহস্থ, অপর সকলে উহার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিজন। যতক্ষণ উক্ত 'এক'জন বা গৃহস্থ তাহার আকর্ষণে সকল পরিজনকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, ততক্ষণই তিনি 'এক'জন গৃহস্থ। আকর্ষণের অভাব হইলেই উক্ত 'একজন গৃহস্থ' একাধিক বহুজন গৃহস্থ হইয়া পড়েন, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। গৃহস্থিত সকলের সম্বন্ধ বা আকর্ষণ যে একজনে কেন্দ্রীভূত, তিনিই সত্যরূপে গৃহস্থ, অপর সকলে নহে। এই আকর্ষণ স্বতন্ত্র ব্যষ্টিকেন্দ্রে কামনা-কলঙ্কিত রূপে—কামরূপে বর্ত্তমান, বিশ্বকেন্দ্রে বিশুদ্ধ রূপে বর্ত্তমান। প্রেমময় ভগবান তাই এক, প্রেমশূন্য ভগবান বস্তু, স্ব-স্ব-প্রধান, বিভিন্নতাময়। প্রেমহীন চক্ষু এক মাত্র ভগবানকে দেখিতে পায় না। সম্বন্ধশূন্য আকর্ষণহীন সংসারে শৃঙ্খলা নাই, সেখানে আনন্দের উপলব্ধিত বহু দূরের কথা।

ক্রমশঃ

পথের দেখা

[শ্রীযুক্ত জীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়]

সেদিন যখন কর্ম্মশ্রান্ত দেহভার আর তার সঙ্গে ক্লান্ত মনটাকেও টেনে নিয়ে কর্ম্মস্থল থেকে বাড়ী ফিরছিনু, তখন কালীতলার কাছেই দেখা হ'ল "ভক্তির" দীনেশদার সঙ্গে।

ভক্তি ও ভক্ত নামের ভেদ মাত্র, কিন্তু বস্তু এক। "ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু, চতুর্নাম বপু এক।" সুতরাং ভক্তের বড় প্রিয়, কণ্ঠাবস্থিত ভগবন্নাম গীতরত্নকে দেখে, বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা না রে'খে আমার মত অভক্তেরও প্রাণটা শীতল করলে। দাদার সেই অমৃত মাখান কথা শুনে তপ্ত প্রাণটা জুড়োলো!

গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শনে মুক্তি, ভক্তের স্মরণেই মুক্তি। সুতরাং স্মরণ মঙ্গল ভক্তকে চোখে দেখায় যে কত আনন্দ তা ব'লে বোঝান যায় না। দাদার আমার সেই একই কথা, বল্লেন যে "ভাই! "ভক্তি"কে ছেড়ে দূরে দূরে স'রে বেড়াচ্ছ কেন? তাঁর আশ্রয় নাও।" জানি না অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে যেন আমার বুকের ভেতর'থেকে আমায় বলতে উদ্বুদ্ধ করলে, 'আচ্ছা এবার থেকে তাঁর আশ্রয় নেব।' দাদার সঙ্গে আমার পথে দেখা ব'লে প্রবন্ধটিরও নামকরণ হ'ল "পথের দেখা।"

বাস্তবিকই ভগবানের সঙ্গে আমাদেরত পথেই দেখা হয়। ঘর ছেড়ে পথে দাঁড়াতে না পারলে কি সেই পথের সম্বলকে পাওয়া যায়?

আসা, যাওয়া এই দুটো পথেই তো সে দেখা দেয়। কিন্তু আমরা যে আসবার সময়ও চোখ বুজে থাকি, আর যাবার সময়ও চোখ বন্ধ

করে যাই, তাই সে সেধে দেখা দিতে এলেও আমরা তার পানে তাকিয়ে দেখি না। সে কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, আমাদিগকে অন্ধ দেখে রূপান্তরিত হ'য়ে, আমাদের অজ্ঞান-নিবদ্ধ-চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেবার জন্য, গুরুরূপে আমাদের কাছে আসে। কিন্তু অনাদি কাল থেকে বহির্মুখ জীব আমরা সে কাছে এলেও ভাল ক'রে তার পানে চেয়ে দেখিনে।

চেয়ে দেখতে চাইনা বলে সে করে কি জান? আমার কাণের কাছে তার সদাপ্রফুল্ল মুখটি রেখে, আমার অসাড় প্রাণে সাড়া জাগিয়ে তোলবার জন্যে কি যে মধুরধ্বনি করে, সে ধ্বনির কথা ব'লতে পারা যায় না। সে ধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া সত্যই এক আনন্দের পথে—শান্তির পথে আমাদিগকে নিয়ে যায়।

সে যে আমার করুণাসিন্ধু, তার কৃপার কি শেষ আছে, তাই আমি তাকে ভুলে থাকলেও সে কিন্তু আমায় ভোলে না। যে যোনিতে যে পথ দিয়েই যাতায়াত করি না কেন, সেই করুণাময়, আমাদিগকে তার ক্ষমা সুন্দর নয়নের দৃষ্টির বার করেন না। আমি বিষ্ঠার কৃমি-কীট হ'য়ে নরকে বাস করলেও, আমায় ফেরাবার জন্য, আমায় প্রকৃত পথ দেখিয়ে দেবার জন্য, অন্তর্য্যামী রূপে সেখানেও সে আমার হৃদয়ে গিয়ে বাস ক'রতে থাকে। জীব অপথে, বিপথে, কুপথে যে পথ দিয়েই যাক্‌না কেন, পথের রক্ষক দয়াল ঠাকুর সেই পথেই তার অভয় হস্ত প্রসারণ ক'রে পশ্চাত থেকে আমাদিগকে রক্ষা করতে থাকেন। নইলে সাধ্য কি আমাদের মত অধম জীবের আত্মরক্ষা করা। ত্রিতাপ দগ্ধ জীবকে চিরশান্তির পথে নিয়ে যেতে, তাদের সেই জ্বালা জুড়োতে পরম করুণাময়; ভক্তির ঠাকুর আমার গোবিন্দ ছাড়া আর কে আছে? ভক্তির শান্তি-সুধা ঢালা পথ আর ভগবানের শীতল চরণ ছাড়া কলিহত

দুর্ব্বল জীবের আর কি গতি আছে? পথ ভ্রষ্ট পথিকের মরু-পর্য্যটন কালীন অসহ্য ক্লেশ নিবারণ করতে, তার তৃষ্ণা-ক্ষাম-কণ্ঠের পিপাসা দূর করতে, সেই শ্যামতরুচ্ছায়া, সেই করুণাসিন্ধু ভিন্ন আর তো কেহ নাই। সংসার মরুতে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান জীবের তাপাপনোদনে ভক্তিই তার একমাত্র অবলম্বনীয়।

পথের দেখা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, যদি ঘরের দিকে টান কম পড়ে! একেবারে ঘর ছেড়ে কুলের বাইরে এসেছিল বলেই ব্রজ-গোপীরা গোবিন্দবল্লভা হ'তে পেরেছিল। পথের কথা না ভেবে, আমাদের ঘরের ভাবনাই বেশী কি না, সেই জন্য পথের দেখা শীঘ্রই শেষ ক'রে ঘরের দিকে ছুটে চল্লুম। গোবিন্দ কৃপা ভিন্ন ভক্তি পাওয়া যায় না, সুতরাং ঘরে ফিরবার সময়, আমার চরম দিনে, যাতে আমি পরম সখার, পথে দেখা পাই তারই জন্য গোবিন্দের কৃপার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রহিলাম। মনে বিশ্বাস, পাতকীকে দয়া ক'রতে কোন কালেই তিনি কৃপণতা করেন না। তার নাম যে পতিতপাবন, পাতকীতারণ, দীনবন্ধু।

বর্ষ-শেষে

[শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সিংহ]

দিন গুলা চলে' যায় স্রোতের ধারা,
খুঁজিয়া তোমায় আমি পাগল-পারা।
ঘুরে ঘুরে বনে বনে
কেটে যায় অনশনে
দয়াল, করুণা তব কেমন ধারা?

তুমি যদি নাহি এলে এখনো কাছে,
জীবনের সুখ বল কি আর আছে।
দিন গুলা যায় চলে
ভাসায়ে নয়ন জলে
বিফল জীবন হয় অতলে হারা।

উপাস্যে নানা মত

[শ্রীযুক্ত হরমোহন দাস]

অধুনা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের মধ্যে নানারূপ ভজন প্রণালী ও উপাসনা পদ্ধতি দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। বস্তুতঃ ভজন প্রণালী নানাবিধ হইবারই কথা; কারণ চৌষট্টি জন মোহান্তের চৌষট্টি প্রকার মত এই জন্যই ভজনও চৌষট্টি প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ভজন পূজন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার বা লিখিবার আমার আদৌ কোন শক্তি নাই। আমি নিজেই ভজন-বিহীন ভক্তি-বিহীন। তবে এ গুহ্য বিষয় আলোচনা আমার পক্ষে বামন হ'য়ে চাঁদ ধরিবার আশা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপা উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া লেখনী হাতে নিয়ে বসা মাত্র। প্রভু যেমনি ভাবে লেখনী সঞ্চালিত করাইবেন, তেমনি ভাবে কাগজে

রেখাঙ্কিত হইবে। ভাল-মন্দ ভুল, শুদ্ধ, দোষ, নির্দ্দোষ ও রস-ভাষা ইত্যাদি বিচারের ভারও প্রভুর উপরেই ন্যস্ত।

উপাসনা কথাটী অতি উচ্চাঙ্গ সমুদ্ভূত। অনেকেই বক্তৃতাচ্ছলে কথাটী উচ্চারণ করেন বটে কিন্তু ইহার সার মর্ম্ম, যিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কিছু সঞ্চয় করেছেন তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন। উপাসনা একটি সুতা সদৃশ। এই সুতায়ই স্বয়ং ভগবান আবদ্ধ। যিনি ভালরূপ সুতা টান্‌তে শিখেছেন, তিনিই টানতে টান্‌তে একদিন গ্রন্থীর নিকট পৌছিতে পারেন। অনেকেই উপাসনা সুতা টানেন সত্য কিন্তু হাতের Balance ঠিক না থাকায় মাঝে মাঝে ছিন্ন হয়। সকল কাজেরই Balance ঠিক পূর্ব্বে করা চাই। তবেই কাজে সুফল ফলে।

উপাস্য শব্দের মোটামুটি অর্থ আরাধ্য। যাহাকে উপন্যাস করা হয় তাহাকেই উপাস্য বলে। ভজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বাহ্যিক তিলক, আহ্নিক মালা ইত্যাদি পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সকল নিত্যকর্ম্মের একটী উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য একজনকে উপলক্ষ্য করেই উপরোক্ত নিয়মাচারাদি পালন করে থাকেন। সেই যে উপলক্ষের জিনিষ, তাহাই একমাত্র সাধকের ভাবনার মূর্ত্তি, তাহাই একমাত্র সাধকের ধ্যানের মূর্ত্তি, তাহাই একমাত্র সাধকের উপাস্য বস্তু এবং সেই বস্তু রাখিবার স্থানই সাধকের হৃদয় মন্দির। উপাস্য বস্তু সকলের নিকটই একটী মূর্ত্তি নয়। মতভেদে কেহ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তি, কেহ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, কেহ রসময় শ্রীগৌরচন্দ্র মূরতি, কেহ দয়াল-শিরোমণি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি, কেহ বা শ্রীগৌর বামে বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে স্থান দিয়া থাকেন।

ভগবান গীতায় নিজ মুখেই বলেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"

কাজে কাজেই যাহার যে ভাবে উপাসনা সেই ভাবেই তার পূর্ণানন্দ এবং সেই ভাবেই তার সিদ্ধি লাভ।

সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।

এ কথা অক্ষরে অক্ষরে অদ্যাপিও ফলিত হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই সত্য; তথাপি কলিকালের মানুষ কুট-বুদ্ধি, জটিল প্রবন্ধই বেশী ভালবাসে। আমার দশাটীও ঠিক তদ্রূপ। আমরা ক্ষুদ্র, কলুষিত মনে উল্লিখিত গৌর বামে বিষ্ণুপ্রিয়া কথাটী বার বার কেন যে উদ্বেলিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি জানিতে চাই, গৌর বামে শক্তি যাহাদের উপাস্য বস্তু তাহারা মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য্য ও রামানুজ এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায় ভুক্ত। যে রসময়, প্রেমময় গৌরাঙ্গসুন্দর, ব্রজেশ্বরী, বৃন্দাবন বিলাসিনী, আহ্লাদিনী শ্রীরাধিকার ভাব, কান্তি, বিলাস নিয়ে কলিযুগে নদীয়ায় অবতীর্ণ, যিনি পূর্ব্ব প্রেম ঋণ শোধার্থে নদীয়ায় দণ্ড, করঙ্কধারী কাঙ্গাল সেজে মুখে রাধা, রাধা, রাধা নাম উচ্চারণ ক'রে অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত ক'রেছেন, যিনি নিজেই প্রকৃতি স্বভাব সম্পন্ন অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রকৃতি, তাঁর বামে শক্তি যেন আমার মত ক্ষুদ্র নির্ব্বোধের মনে কেমন কেমন বোধ হয়। লীলাচ্ছলে মহাপ্রভু, পণ্ডিত প্রবর গদাধরকে বামে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্য, কিন্তু জগন্মাতা বিষ্ণু-প্রিয়াকে বামে নিয়া তো কোথাও দাঁড়ান নাই। তাই ব'লে মাতা বিষ্ণু-প্রিয়াকে যে কেহ পূজা ক'রবে না, তা নয়! তিনি স্বতন্ত্রা ঈশ্বরী। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত হবে ততদিনই তাঁর পূজা প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঘরে-ঘরে বিদ্যমান থাকিবে।

আবার এতদঞ্চলে কদাচিৎ ২।৪ ঘর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ঘোষ, বসু,

গুহ, মিত্র ইত্যাদি জাতি যাহারা কুলের গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করে জাত্যাভিমানে মাটিতে পা ফেলিতে চায় না তাহারা বসুদেব দৈবকী নন্দন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেই উপাস্য বস্তু ধারণা করেন। নন্দ, যশোদা নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর, ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে তাহাদের একটু অবহেলা দেখা যায়। এদেশে কোথাও কাহার বাড়ী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইলে উল্লিখিত ভদ্র মহোদয়গণের জন্য পৃথক ব্রাহ্মণ বাড়ী ভেট দিতে হইবে, নারায়ণের ভোগ ব্যতীত তাহারা প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

কালের করাল কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া ভাণ্ড
এ ব্রহ্মাণ্ডে আয়ত্ত তাহার॥

হায় রে! কি পরিবর্ত্তন। হা মহাপ্রভু! হা দয়াময় গৌরাঙ্গ! আর কি তুমি কলিযুগে দেখা দিবে না! আর কি তুমি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র, বৈশ্য এক সূত্রে বন্ধন করবে না। তোমার সেই অসীম তেজ কোথায় প্রভু? যে তেজে একদিন যবনকেও ধুলি লুণ্ঠিত হইতে হ'য়েছিল? কি আশ্চর্য্য! দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে ধর্ম্মেরও কি গত্যন্তর ঘটিবে? ভগবত্তেজের কি দেশ, কাল পাত্রানুযায়ী লয় হইবে?

উক্ত কুলীন ভদ্র মহোদয়দিগের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন।

আবার দেখা যায় কালাচাঁদের ও মাঝবাড়ীর মতাবলম্বী বাউল সম্প্রদায়। ইহাদের উপাস্য কোন মূর্ত্তি তাহা আজ পর্য্যন্তও আমার বোধগম্য হয় নাই। ইহারা কি সেই প্রাচীন সহজে দল সমুদ্ভুত নেড়া-নেড়ী? এ দলেও তো ২।৪টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিক্রী প্রাপ্ত শিক্ষিত লোক দেখা যায়, যেমন ঢাকার আশানন্দ বাউল। তবে দেখা যায় সকল মতেই একটা নিগুঢ় রস আছে, সকল নেতাই একটা ভাব নিয়ে

পাগল হ'য়েছেন! সকলের মধ্যেই আকর্ষণ শক্তি আছে, নচেৎ এত লোক মাতোয়ারা হয় কেন?

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

কাজে কাজেই কাহারও কোন্ মত নিন্দা করা উচিত নয় ও উপহাস উচিত নয়। আপন আপন খুঁটী সকলেরই ঠিক থাকা আবশ্যক। দশ রকম দেখে শুনে আপনার ধন যেন কেহ হারাইয়া না ফেলে, ইহাই সকলের প্রধান দ্রষ্টব্য। যেমন হাটে জিনিষ ক্রয় করা। যাহার যে জিনিষের দরকার সে সেই জিনিষই ক্রয় করে। সকলে একদিন আর সকল জিনিষ ক্রয় করে না। সুতরাং যাহার যেটুকু রুচিপ্রদ তাহার সেই টুকুই গ্রহণ করা উচিত। তবে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব মহাশয়দিগের শ্রীচরণ সমীপে এ দাসের বিনীত প্রার্থনা এই তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নোক্ত পদ ছন্দটী ভালরূপ বিবেচনা করে দেখেন, তাহা হইলে উপাস্যে বোধ হয় কোন গেল থাকিবে না।

ধন মোর নিত্যানন্দ,　　পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।

কলিতে গৌরাঙ্গ কৃপা ব্যতিরেকে গোবিন্দ লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। বৃন্দাবন লীলা কীর্ত্তন করিতে হইলেই নদীয়ার ভাবটী পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে হইবেই হইবে। পাঠ্যাবস্থায় স্কুল সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হইলে যেমন হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাত দিয়া করিতে হয়। সেইরূপ এ বিশ্বের সেক্রেটারী শ্রীশ্রীগোবিন্দের নিকট দরখাস্ত করিতে হইলেও রসময়, প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর দিয়া লিখিতে হইবে, তবে শীঘ্র শীঘ্র কাজ হবে। পতিই যেমন স্ত্রীলোকের

একমাত্র গতি। এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকেও পতি জ্ঞান করতে হবে কিন্তু মনে রাখা সর্ব্বদাই চাই !

"প্রাণ মোর যুগল কিশোর"

প্রাণ না থাকিলে ধনও কিছু নয়, পতিও কিছু নয়, মৃতের নিকট ধন ও পতি কিন্তু কিছু নয়, তা সকলেই জানেন। এইটুকু লক্ষ্য রাখলে বোধ হয় আনন্দের আর অবধি থাকে না।

———

শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন

[ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস]

শাস্ত্রে আছে,— অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে ক্রমে অধিকতর শক্তি-শালী হইয়া অবতীর্ণ হন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতার। সত্য যুগে তিনি নর-নারায়ণ রূপে তপস্যা করিলেন। ত্রেতায় রামচন্দ্রের আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রাক্ষস বধাদি লীলা। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ লীলা। কিন্তু এই লীলা সাধারণে উপভোগ করিতে পাইল না। এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হইল। একাধারে রাধা-কৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গ আপন পূর্ব্ব লীলা-রস আপামর সাধারণ জীবে, আস্বাদন করাইবার জন্য কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইয়াছিল—ইহা জীবের বহু ভাগ্য। আর বহু ভাগ্যে জীব এই গৌরাঙ্গ ভজন করিবার অধিকারী হয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজন করিতে হয়। এই

প্রীতি-ভজন অনুরাগ ভজন—বিধিমার্গ বহির্ভূত। আমার গৌরের শ্রীমুখের বাণী,—

"যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে।"

অনুরাগে ডাকিলে প্রাণ গৌর আমার স্থির থাকিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তিনি জীবকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়া ছিলেন।

এই প্রেম ভক্তি বৃন্দাবনের সম্পত্তি, দেবগণও ইহার আস্বাদ পায় নাই। অপর দিকে সরলা গোপবালাগণের ইহা সহজলভ্য ছিল। কৃষ্ণ, ভক্তকে ভুক্তি মুক্তি দিলেও—

"কভু প্রেম-ভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়ে।" (চৈঃ চঃ)

এই প্রেম কলির জীবের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে।

"নিতাই গৌর নামে নাহি এ সব বিচার।"

অনুরাগে দয়াল নিতাই গৌরকে ডাকিতে পারিলেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে। ইহা আমরা বৈষ্ণব সাধুর মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারাই ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য!

মানুষ তখনই পরিপূর্ণ যখন তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম জন্মিয়াছে, প্রেমের অপূর্ব্ব শক্তির ক্ষীর ধারার মতই স্বর্গ হইতে নামিয়া মানবকে অমর করে। এই প্রেম মানুষকে, পূর্ণ করে, শান্তি ও আনন্দের অধিকারী করে। আজিও শ্রীগৌর ভগবান প্রেমিকের নিকট বিকাইয়া আছেন। কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা তিনি নিজে প্রেমিক সাজিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই ভক্তের করুণ কণ্ঠ ভেদ করিয়া আজিও ধ্বনি উঠিতেছে—

"যাদের হরি ব'লতে নয়ন ঝরে নদীয়ায় তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

সঙ্কীর্ত্তন-লীলা

[শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস]

নাচত গোরা নদীয়া নগরে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
হাসত রোয়ত গায়ত গোরা অপরূপ ভঙ্গে॥
খোল করতাল মন্দিরা আদি সুমধুর বাজে।
হরি হরি রব সঘনে বোলত ভকতের মাঝে॥
চন্দন-চর্চ্চিত গৌর অঙ্গ শোভিত দিব্য বাসে,
মুকুতা দশন চাঁদ বদন মাল্য রাজত কেশে।
নদীয়া নাগরী হেরে দিশে-হারা নদীয়ার চাঁদে ;
কুল মান ভয় সকলি ত্যজত পড়ি প্রেম-ফাঁদে।
গোরা দ্বিজমণি প্রেম-রসখনি প্রেমে থির নহে,
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে পুলকাদি, কভু শ্বাস নাহি বহে।
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায় কভু বা অট্ট হাসে।
হেরত নিতাই হরিদাস আদি প্রেমানন্দে ভাসে॥
নদীয়া নগরী আনন্দে মগন গোরাচাঁদ হেরে।
গোলক গুপত প্রেম যাচত লভত সর্ব্ব নরে॥
ব্রহ্মা আদি শিব সনক যেরূপ ধেয়ান করে।
দয়াল ঠাকুর নগরে ভ্রমত সকল গোচরে॥
জগতবাসী হইল ধন্য হেরি সে কীর্ত্তন লীলা॥
বঞ্চিত রহিল এদীন অধম স্পর্শ না লভিলা॥

শ্রীহরির মর্ত্ত্যাগমন ও মহাত্মা শ্রীনিবাস

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুরাণতীর্থ)

পতিত পাবনাবতার শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য চরণের অপ্রকটের পর মহাত্মা শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে সর্ব্বপ্রথম মল্লেশ রাজধানী বিষ্ণুপুর নগরে আগমন করেন। পরে তথায় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি মল্লকুল-তিলক মহাত্মা বীরহাম্বীরের নিকট বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাপন করত তাঁহাকে মুগ্ধ করেন। তখন মল্ল মহারাজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশুদ্ধত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতা বিশেষ রূপ অবগত হইয়া জ্যোৎস্না যেমন রজনী করের অনুগমন করে, তেমনি তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবা দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া সপরিবারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুগামী হইলেন। রাজকুল পবিত্র হইল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় ধ্বজা দেশের সর্ব্বত্রই উড্ডীন হইল, পাষণ্ডকুল একেবারে নির্ম্মূল হইল। তখন সংকীর্ত্তন মহাসিংহের উচ্চ গর্জ্জনে কলিকল্মষ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল, রাজকুল হিমাদ্রি প্রসূত ভক্তি স্বর্ণনদীর পবিত্র ধারায় বিশুদ্ধ হইয়া মল্ল-ধরণী যেন কমলাকান্তের ক্রীড়াভূমি হইলেন। জানি না, বৃন্দাবনের সেই প্রেম-পাগল শ্রীনিবাস ঠাকুর রাজকুলে ও রাজ-হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব কৃপামৃত ঢালিয়া দিলেন যে, মল্ল মহারাজ সেই ক্ষণেই যেন পাগল হইলেন এবং রাজ-কার্য্য বিস্মৃত হইয়া দেব-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে নামামৃতে ও কৃপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জ তখন অমরাধিক সৌভাগ্য মদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, রাজকীর্ত্তিময় মণি-মালা ভূষিত মল্লধরণী যে, একদিন আচার্য্য কৃপায় অপূর্ব্ব সৌভাগ্যবতী হইয়া সূর্য্য সমুজ্জল সলিলচ্ছটায় সমগ্র ধরণী ধবলিত করিয়াছিল, বিষ্ণুপুর

মহানগরী যে, এক সময় সত্য সত্যই বিষ্ণুপুর হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। আহা ধর্ম্মভূমির একছত্রী সম্রাট পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি অপার মহিমা? কি ভুবন বিজয়িনী মহামহিয়সী প্রতিষ্ঠা ও কি সুর-নর-তারিণী মহতী শক্তি। যে ধর্ম্মের আভাস মাত্রেই মানব পবিত্র হয়।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপিহি ॥

বলা বাহুল্য সম্যগাদৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে ক্ষুদ্র মানবকেও দেবতা করিয়া তুলে তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মল্লকুলরবি মহাত্মা বীরহাম্বীরই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আর "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" ইহারও একমাত্র উদাহরণ স্থল আমাদের সেই মহাত্মা শ্রীনিবাস। তারপর সেই শ্রীনিবাস ঠাকুরের ভক্তি বাতাস নিজ অপূর্ব্ব সৌগন্ধে মল্লভূমির সমস্ত সুরভিত করত ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে বাতাস জন-লোক, তপোলোক ভেদ করিয়া মণিময় সৌধমালা ধবলিত দিব্য বৈকুণ্ঠ ধামে প্রবেশ করিল। তখন উত্তাল তরঙ্গমালা নিপাতিত ও বায়ু বিঘুর্ণিত তরণীর ন্যায় সে বাতাসে রমাপতিও চঞ্চল হইলেন। রাকাপতির উজ্বল কিরণে সরিৎপতি যেমন উদ্‌বেল হইয়া উঠে, সেইরূপ আচার্য্য ঠাকুরের ভক্তি বাতাসে অগাধ গম্ভীর শ্রীভগবানেরও মন গোলমাল হইয়া উঠিল। শ্রীহরি পাগল হইলেন, বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীনিবাস ঠাকুরের ভক্তি বাতাসের এমনই মোহিনী শক্তি যে, তাহার সৌগন্ধে ভগবানেরও মন লুব্ধ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শুদ্ধ ভক্তের ভক্তির টানে ভগবান যেন অজ্ঞান হইলেন। তখন তাঁহার আহারে রুচি নাই, নিদ্রা মোটেই হয় না, অঙ্কশায়িনী মহালক্ষ্মীতেও প্রীতি নাই। দিক দীর্ঘিকার তরঙ্গ-সংস্পর্শী কমল কাননের মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরণেও মন প্রসন্ন হয় না।

কি জানি, সেই রমারঞ্জন মুনি-চিন্তামনি গোলকপতির চিত্তরত্ন যেন কেহ জোর করিয়া চুরি করিয়া লইল, তাই তিনি আজ ঐরূপ দিশে-হারা। তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার কোনও উত্তর দেন না, কেবল নিম্ন দিকেই চেয়ে থাকেন ও কি যেন আকাশ-কুসুম ভাবিতেছেন

নারায়ণের ভাবগতিক দেখিয়া, তখন মহারমার সেই চন্দ্র-বিনিন্দিত প্রোৎফুল্ল মুখমণ্ডল যেন করিবিদলিত ছিন্ন-ভিন্ন পঙ্কলিত পঙ্কজের ন্যায় সহসা ম্লান হইল, তখন তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস নারদ! আমাদের কর্ত্তাটি সহসা এমন হইলেন কেন, ইহার কি হইয়াছে? তুমি একবার বেশ ভাল করিয়া দেখ ও যাহা করিতে হয় কর, আমি মেয়ে মানুষ, ওসবের কিছু জানি না। এখন কর্ত্তাকে দেখে আমার বড় ভয় হোচ্চে। তা নারদ একবার অশ্বিনীবাবুকে এনে কর্ত্তাটিকে দেখালে হয় না।

নারদ! দুঃখের কথা ব'লতে কি। আমার মদন, এখন বড় হোলেও সে যেন দিন দিন ছেলে মানুষ হ'চ্চে। বসন্তের সহিত সর্ব্বদা পুষ্পবনেই থাকে, সংসারের কোন কিছুই দেখে না, আর কোন কথা বোল্লেও সে কথায় কান দেয় না, এখন দেখছি, ছেলেটিও আমার বশে নয়। তারপর বাগ্‌বাদিনী স্বপত্নীর বাগ্‌বানে ও যেন আমার প্রাণ সদা জ্বালাতন হ'চ্চে। নারদ, আমি কেবল কর্ত্তাকে দেখেই ঐ সব দুঃখ ভুলে থাকি। তারপর, কর্ত্তাটি এখন এমন হোলেন, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি। বাপ নারদ! আমি এখন কি করি বল দেখি? তখন নারদ নারায়ণের ভাবগতি দেখিয়া তাঁহার আধি ব্যাধির কারণ সমস্তই বুঝিয়া লইলেন ও বলিলেন—মা, বাবার বড় কঠিন পীড়া, পীড়াটীও দেখছি বায়ুজ, ইহার নাম মাথাগরম। ইহাতে শ্রীগোপাল বা বিষ্ণুতৈলের ব্যবস্থা। মধ্যমনারায়ণও

চলে কিন্তু ঐ সব তৈল ত এখানে মিলিবে না, সেই কারণ আমাদিগকে একবার বিষ্ণুপুর যেতে হবে। এবং কিছু খরচ পত্রও করিতে হইবে। তখন কমলা বলিলেন বাবা! সে জন্য ত ভাবি না, কর্ত্তার কৃপায় আমার অক্ষয় ভাণ্ডার। তা এখন কর্ত্তাটি ভাল হোলেই ভাল। নারদ, এখন আমার ধন দৌলতের অভাব নাই। তাছাড়া আমার পিতারও আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল। তাঁহার নাম রত্নাকর। তা বোধ হয় তোমারও জানা আছে। নারদ, এখন আমাদের কর্ত্তাটি যাতে শীঘ্রই ভাল হন, তা তোমাকে কর্ত্তে হবে, দেখচ ত, ছেলে আমার ভুবনবিজয়ী, সে রূপে গুণেও অনুপম, কিন্তু তাতেও আমি সুখী নই কারণ ছেলে আমাদের বশে নয়। আর মুখরা সপত্নীর কথা ত তুমি সবাই জান; সে যা হোক, এখন কর্ত্তাকে দেখে আমার যেন বুক ফেটে যাচ্চে। দেখচ ত, আমার এত বড় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সংসারটি কর্ত্তা একা চালাচ্ছিলেন। এমন গুণবান স্বামি কি কারু হয়? এখন তিনি হঠাৎ এমন হোলেন। নারদ, আমি কি আর বেঁচে আছি। দেখে শুনে আমার যেন পেটের ভাত চাল হোয়ে যাচ্চে, আমি এখন উপায় বুদ্ধিহারা হ'য়েচি। বাবা, তোমাকে বলতে কি! অন্য লোকের রোগ ব্যাধি হোলে তারা আমাদের কর্ত্তাকে ডেকে উদ্ধার হয়। আমাদের কর্ত্তার এমনি নামের গুণ। নারদ, কর্ত্তার ত কখন কিছু হয় না, তাই এখন বড় ভাবনা হচ্চে। তখন নারদ বলিলেন মা, আর ভেবে কি হবে। বাবার মাথার ঠিক নাই। আর এখন বৈকুণ্ঠের জল হাওয়াও বড় খারাপ হয়েচে, সুতরাং এখানে আর আমাদের থাকাই চলিবে না। আমাদিগকে শীঘ্রই মর্ত্ত্যলোকের বিষ্ণুপুরে যেতে হবে, এবং কৃষ্ণবাঁদের ঠাণ্ডাজলে বাবাকে স্নান করাইতে হইবে। মা, আমি শুনিয়াছি, কৃষ্ণবাঁদের ঠাণ্ডা জলে অনেক পাগলের মনের গোলমাল সারিয়া গেছে। চলুন চলুন শীঘ্র চলুন। বিষ্ণুপুরের পাগল সন্ন্যাসীর দুষ্টবাতাসেই

বাবারমন এমন গোলমাল হইয়াছে এখন তাহাকেও একবার দেখাইতে হইবে। আমি জানি, সেই সন্ন্যাসী নাকি, বৃন্দাবনের জীবগোস্বামীর নিকট হইতে অনেক রকম ঔষধিপত্র সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসার্থ বিষ্ণুপুরে আসিয়াছে, ও সে অনেককেই ভাল করিয়াছে। বিষ্ণুপুরের মহারাজারও বড় গোলমাল হইয়াছিল, তিনিও তাঁহার ঔষধেই ভাল হইয়াছেন। মা! এখন আপনি একটু তৎপর হউন এবং টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া লউন। এখন আমাদিগকে সেখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে, তার'মত যোগাড় লইয়া চলুন, আর বেশী বিলম্ব করিলে রোগ বেড়ে যাবে। মা আমি জানি, বিষ্ণুপুরের জল হাওয়া খুব ভাল এবং চিকিৎসকেরও অভাব নাই, আর পথ্য দ্রব্যাদিও খুব সুলভ। সেখানে গেলে বাবা শীঘ্রই সেরে যাবেন! মা, বাবার জন্য কোনও চিন্তা নাই। আর সেই পাগল সন্ন্যাসীও একজন ভাল চিকিৎসক, আমি তাহাকে চিনি, তাহার নাম শ্রনিবাস। তাহার চিকিৎসায় উৎপন্ন ব্যাধি অচিরেই বিনষ্ট হয়, তা'ছাড়া রোগীর ভব ব্যাধিও একবারে নিবৃত্তি হয়। কেননা, তাহার হোমিওপাথিক ও এলোপাথিক দুই রকম চিকিৎসাই জানা আছে লোকটা খুব বিজ্ঞ।

তাহার চিকিৎসায় রোগ নাশ তমো নাশ, দুই-ই হয়। ইহাই তাহার চিকিৎসকের বিশেষত্ব।

নদীয়া বল্লভ শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আদেশে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি কএক জন ভদ্রলোক এখন এই প্রকার নূতন ধরণের চিকিৎসা বাহির করিয়াছেন, ইহাদের আবিষ্কৃত ঔষধে কটু তিক্ত বা কোন প্রকার বিস্বাদ রস নাই, তাছাড়া ঔষধ সেবনকালেই রোগীর মন প্রাণ শীতল হয়। এবং একবার সেবন করিলে, রোগী আর এ জীবনে সে ঔষধ ছাড়িতে পারে না, তখন তার মন প্রাণ তার হইয়া যায়, তখন,—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়

কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং। চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং। নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ॥ মা, এই ঔষধ যে কি প্রকার অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না কেননা ইহা যে "নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং"। "ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ"। "মধুর মধুর মেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং"। বৈদ্যগণ উক্ত মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ না জানিয়াই তাহারা কটু তিক্তাদিময় ঔষধের ব্যবস্থা করেন। মা জগদম্বে! বিষ্ণুপুরবাসিগণ এখন এই ঔষধ সেবন করিয়াই চিরতরে অমর হইয়াছে। প্রচলিত ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কটু তিক্তাদি কোন দোষ নাই এবং পথ্যাদিরও কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, আর উপবাসেরও কোনও নিয়ম নাই। কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, এই ঔষধের নাম কাণে শুনিলেই অমনি মানুষ নিরাময় হইয়া যায়, আর এই ঔষধ যত্নপূর্ব্বক সেবন করিলে যে কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেনা। মা! মহাত্মা শ্রীনিবাস গোস্বামী মহাশয় এখন জীবগণের রোগ নিরহরণার্থ এই প্রকার সুমধুর ঔষধ লইয়া শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুর মহানগরীতে আসিয়াছেন। এখন তাঁহার কৃপায় মল্লভূমি প্রায় একরকম সর্ব্বত্রই নিরাময় হইয়াছে। এই ঔষধের আরও একটি অন্যতম সাধারণ গুণ এই যে, ইহা সেবনে মানবের নিরাময়ত্ব ত আছেই, তা'ছাড়া ইহা সেবনে মানুষ মৃত্যু হইতেও চিরতরে নির্মুক্ত হয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে যে, ধ্রুব-প্রহ্লাদ বলি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই ঔষধ সেবন করিয়াই নিরাময় হইয়াছেন, আরও শুনা যায় যে, মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নিং পদং দত্বা আরুরোহ হরেঃ পদং। ও মা কমলালয়ে! উক্ত ঔষধের অপর মহদ গুণ এই যে, ইহা সেবনে মানবগণ সদ্য সদ্যই চিন্ময় হয়। এবং তাহারা ব্রহ্মপদকেও তুচ্ছ করিয়া ফেলে। কেননা—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবং মহৎ পদং পুণ্য যশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎস পদং পরংপদং পদং পদং য দ্বিপদাং ন তেষাম্॥

এই কারণ উক্ত ঔষধ সেবন করিলে মানবগণ আর কখনও বিপদাপন্ন হয় না। মা! বাবার জন্য কোনও চিন্তা নাই। বাবা শীঘ্রই সেরে যাবেন, তবে এখন 'গন্তব্যং শীঘ্রমেবহি'।

তখন নারদের কথা শুনিয়া কমলা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। নারায়ণকে লইয়া নারদসহ পতগরাজ বিমানে শীঘ্রই বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলেন। তখন সৌধমালা ধবলিত প্রকৃতি মনোহর বিষ্ণুপুরের দিব্যসৌন্দর্য্য দর্শন মাত্রই ভগবানের আধি ব্যাধি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল এবং বিষ্ণুপুরের সমুদ্র সদৃশ সরোবর সমূহের স্নিগ্ধ সমীরণে সহসা তাঁহার আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। তখন চতুর্ভুজ দ্বিভুজ হইলেন, আর সেই পরম রমণীয় সুন্দর নারায়ণ মূর্ত্তিখানিও সহসা ধাতুময় খর্ব্বাকৃতি ও ত্রিভঙ্গ হইলেন। তখন তাঁহার শ্রীহস্তে মুরলী, গলদেশে বনমালা ও কটিতটে পীতবাস শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শ্রীচরণে নূপুর ও মস্তকে মণিময় চূড়ায় শিখিপুচ্ছ শোভা পাইতে লাগিল। সহসা তাঁহার এ ভাব হইল কেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন্ না, তবে এইমাত্র বোধ হইল, যেন কোন বিচিত্র চিত্রকর আজ মনের সাধে, ভালবাসার রঙ দিয়া, সেই প্রেমের পুতুলটিকে, নিজের মনোমত ভাবে "মদনমোহন" রূপে চিত্রিত করিয়া লইল এবং সেই কারণেই যেন তাঁহার আকৃতিরও বিপর্য্যয় ঘটিল। তখন কর্ত্তার বিপর্য্যয় দর্শনে গৃহিণীরও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন চঞ্চলা সুন্দরীও নিজ চিরসঙ্গিনী চপলতা চাকরাণীটাকে চিরকালের জন্য জোর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তারপর তখন দেবর্ষি নারদ ও শ্রীমন্মদনমোহন মুখারবিন্দ সন্দর্শনে লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি দেবর্ষি উপাধিটাকে

আধি-ব্যাধি মনে করিয়া তাহা পুঁছিয়া ফেলিলেন এবং খোল ধরিয়া বীণা ফেলিয়া নাড়া বাবাজির দলে মিশিয়া মহানন্দে নাচিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পতগরাজও তখন পাখির দলে মিশিয়া ডালে বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিলীলা গান করিতে আরম্ভ করিল। তখন নারায়ণও নিরাময় হইয়া মন্মথ মথন মধুর মূর্ত্তিতে মল্লরাজ ভবন সমলঙ্কৃত করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদি এদেশে করুণা বরুণালয় আচার্য্য চরণের সমাগম না হইত, তাহা হইলে শ্রীমন্মদনমোহন মুখারবিন্দ সন্দর্শন মল্লধরণীর ভাগ্যে ঘটিত কি। সুতরাং সেই মল্লভূমির সৌভাগ্য ভাস্কর শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণে আমাদের পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তাঁহার শ্রীচরণে কাতর নিবেদন এই যে, হে প্রভো! মল্লকাননের মদমত্ত দুর্নিবার কবিরাজকেও যখন তুমি ক্ষণমাত্রেই দিব্য মানুষ সাজাইয়া সংসার তটিনীর খরতর বেগের ঠিক বিপরীত দিকেই চালাইয়াছিলে এবং যে তোমার অভিনব সঙ্গমে শোভিত হইয়া বিষ্ণুপুর অমরপুরকেও পরাভূত করিয়াছিল। যে তোমার চরণস্পর্শে মল্লধরণী একদিন সমগ্র ধরা ধবলিত করিয়াছিল তখন তুমি যে ভক্তজগতের পরশমণি অর্থাৎ লোহাকে সোনা করিতে পার, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাই বলি ঠাকুর, আমি সোনা হইতে চাই না, আমার প্রতিষ্ঠার দরকার নাই। দয়াময়! তোমার সুপবিত্র চরণ রেণু দিয়া আমাকে কৃপা কর, যেন তোমার কৃপায় আমি ভক্তের দ্বারে বিক্রীত হই। এখন ইহাই আমার প্রার্থনা।

ধন্য শ্রীনিবাস তব মহিমা অপার।
চিরকাল মতি যেন রহে তুয়া পদে,
গাই যেন তব গুণ বিপদে সম্পদে,
বিষয় বাসনা যেন নাহি থাকে আর॥
ছিঁড়ে দিয়ে ফুলহার কন্টকের মালা।
পরিয়াছি গলে আমি অমৃতের ভ্রমে,
শেল সম বিঁধিতেছে মরমে মরমে,
দাও দেব বিশল্যাকরণী পদধূলা॥

আরংজেব প্রদত্ত ফরমান

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট।)

বিগত ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর" বার্ষিক উৎসবের সহিত যে "বৈষ্ণব-প্রদর্শনী" হইয়াছিল, উহাতে নানাবিধ ঐতিহাসিক দ্রব্যের মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র শ্রীমৎ মদনমোহন গোস্বামীকে প্রদত্ত বাদশাহ আরংজেবের সাক্ষরিত একখানি ফারসী ফরমান বা দলিল প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত দলিলখানি বৃটিশ আদালতে মোকর্দ্দমার জন্য এক সময়ে দাখিল হইলে তদানিন্তন ফারসী অনুবাদক উহার যে ইংরাজী তরজমা করেন, সেই তরজমা হইতেই নিম্নে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

ফরমান

(প্রথমে সাঙ্কেতিক মোহর)

দয়ার সাগর খোদাতালার নামে—

(দ্বিতীয় মোহর)

হে বিশ্ববাসীগণ, ঈশ্বর ও তাঁহার দূত সকল ও যাঁহারা তাঁহার প্রিয়পাত্র তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হও।

(এখানে বাদশাহ আলমগীর ও তাঁহার ১০ জন পূর্ব্বপুরুষ—বাদশাহের নাম সম্বলিত মোহর।)

যেহেতু মহামহিম প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট বাহাদুরের নিকট দরবার করা হইয়াছে যে, বাংলা সুবার অন্তর্গত হুগলী চাক্‌লাতের অধীন মানপুর পরগণাস্থ খড়দহ গ্রামের ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ, ফকিরের জীবন

অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত সুবার ও সুবা উড়িষ্যার বৈষ্ণব ও বৈরাগীগণ তাঁহার নিকট হইতে পদাবলী বা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন ও তাঁহার ফকিরী আশ্রমের (মঠের) ব্যায় নির্ব্বাহার্থে প্রতিদিন প্রত্যেকে একটী করিয়া কৌড়ি দান করিতেন; যে—উক্ত নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বীরভদ্র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার পিতার ন্যায় ঐ সকল বৈষ্ণব ও বৈরাগীদিগের পরিচর্য্যা ও ঐরূপ কৌড়ী প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন; যে—তৎপরে তৎপুত্র রুকৃকান্তও (?) উক্তরূপ পরিচর্য্যা করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হয়েন; এক্ষণে নিত্যানন্দের পৌত্র রুককান্তের (?) পুত্র মদনমোহন (আমি), যাঁহার আদেশ সমগ্র জগতে অপ্রতিহত ও অবশ্য পালনীয় সেই মহামহিম সাম্রাট বাহাদুরের (আলমগীর বা আরংজেবের) নিকট প্রসাদ ভিখারী হইয়া পৈত্রিক কার্য্যাবলীর অনুসরণ প্রার্থী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি—

এতদর্থে আদেশ প্রচারে আজ্ঞা হউক, যে,—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মচারী ও মাকদ্দমগণ উক্ত মদনমোহনকে তাঁহার পিতা ও পিতামহের উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিবেন এবং অন্য কেহ ইহাতে অংশীদার নহে এবং যে সকল আত্মীয় মহান্ত,—বৈষ্ণব ও বৈরাগীগণের যাতায়াত ও তাঁহাদের দৈনিক কৌড়িদানের জমা খরচে বাধা দিতেছে তাহাদের নিরস্ত করিবেন। (ইতি)

রাজত্বের ৪৮ বৎসরে, রবিয়া—আল—আওনের প্রথম তারিখে।

সর্ব্বপ্রকারে রাজপ্রাসাদের উপযুক্ত উচ্চ বংশ সম্ভূত সৈয়দের বিভাগে ও সদর দেওয়ানের কার্য্যালয়ে হিজিরা ১১১৪ সনে আভরিজায় লিখিত রেজিষ্টারী সহিত প্রাপ্ত ও অত্র রেজেষ্ট্রী কৃত।

প্রার্থনা পত্র অনুসারে মহামহিম সম্রাটের ফার্ম্মাণ লিখিত হইয়াছে;—ইহার নকল;—

সাল ৪৮ রবিয়া আল শনির ১৫ তারিখে মফঃস্বল তৌজিতে আবুল কাসেম প্রাপ্ত হইলেন। রাজত্বের ৪৮ সালে রবিয়া আল শনির ১০ তারিখে আমি আলমগিরের শিষ্য আসাদ খাঁন জানিলাম। (ফারসী সাক্ষর)

বোখারার রিজা খাঁ, সম্রাট আলমগীরের সদর মাকদুম, (সাক্ষর) বরিআল আওয়াল ১৮ তারিখ। রবিআল শনির ১৫ই তারিখে আমার জ্ঞাত করান হইল। (সাক্ষর) মোহন দাস। সম্রাট আকবরের ক্রীতদাস।

রবিয়ালশনির ৫ই তারিখে তৌজির অধ্যক্ষের কার্য্যালয়ে একটী নকল প্রাপ্ত হওয়া গেল।

ইস্তিফা কার্য্যালয়ে—সফর মাসে ১০ই তারিখে একটী নকল পাওয়া গেল।

(উইলিয়ম চেম্বার্স পার্সিয়াল অনুবাদক)

এই দলিলখানির দ্বারা আমরা কয়েকটী বিষয় জানিতে পারি;—

১। হিন্দু বিদ্বেষী আরংজেবের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরের প্রাত সুবিচার।

২। তৎকালে খড়দহগ্রাম হুগলীর অন্তর্গত মানপুর তৌজির (বোধ হয় মানসিংহের নামানুসারেই মানপুর নামকরণ হইয়াছিল) অধীন ছিল।

৩। মোহনদাস নামক জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারীর নাম।

৪। একটী করিয়া কৌড়ী দান প্রাপ্তে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সুবৃহৎ আশ্রমের ব্যায় নির্ব্বাহ। ইহাতে তৎকালে কৌড়ীর প্রচলন ও দেশের অবস্থা কিরূপ স্বচ্ছল ছিল তাহা জানাইয়া দেয়। *

* পরেও বৈষ্ণবগ্রন্থে জানিতে পারি। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু মাত্র

৫। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশলতা,—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, তৎপুত্র, শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু,—তৎপুত্র রুককান্ত, (রুক্মিণীকান্ত কি হইবে ?) তৎপুত্র শ্রীল মদনমোহন। *

---

৫ গণ্ডা কড়ির দ্বারা ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—

"ষোল কড়া দিয়া তণ্ডুল আনিল।
এক কড়া দিয়া একখানি খোলা নিল॥
দুই কড়ার কাষ্ঠ এক কড়ার লবণ।
লইয়া দারকেশ্বর নদীতে গমন॥ (ভক্তি রত্নাকর)

অধিকন্তু—আচার্য্য প্রভু এক একদিন ৮।১০ কড়া কড়িতেও দিন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়া "প্রেমবিলাসে" লিখিত আছে। শ্রীশ্রীচরিতামৃতে আছে (মধ্য ১৫) পানিহাটীতে খুব ভাল নারিকেল ১টীর জন্য ৫ গণ্ডা কড়ি। চারি পন কড়ির দ্বারা মহাপ্রভু, কাশীশ্বর, ও গোবিন্দের সেবা হইত।

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু, কাশীশ্বর, গোবিন্দ খান তিন জন॥ (ঐ অন্তঃ ৮)

* * * *

আরও—"অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ।"

পরে রামচন্দ্র পুরীর জন্য 'ভিক্ষা সঙ্কোচনে',—

"এক চৌঠী ভাত, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥"

ইহার দ্বারাই প্রভু তিন জনের ভিক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন।

তৎকালে রাজার রাজস্বও কড়ির দ্বারা হিসাব ও পরিশোধ হইত। গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের—

"দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকি হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কড়ি রাজাতো মাগিল॥" (ঐ অন্তঃ ৯)

* কিন্তু প্রভুপাদ ক্ষীরোদচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবলী" গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ দেখা যায় :—যথা ;—

দরদিয়া

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস।)

গৌর হে,

পথ ভুলে' যবে দিশে হারা হ'য়ে
এদিক ওদিক ঘুরেছি।
পথ দেখায়েছ তুমিই আসিয়া
তখনি তোমারে চিনেছি॥
পাপ মেঘে যবে হৃদয় আকাশ
তুমিই আঁধার করে'ছ।

- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
  - শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভু
    - শ্রীশ্রীরামচন্দ্র প্রভু
      - রামদেব
      - কৃষ্ণদেব
      - বিষ্ণুদেব
      - রাধামাধব
        - গোপীকান্ত
          - রুক্মিণীকান্ত
            - ব্রজকিশোর
            - মদনমোহন।

পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভুর নিকট ইহার মীমাংসা পাইলে আমরা আনন্দিত হইব।

মেঘটি সরা'য়ে দিনমনি প্রায়
তুমি নিজে দেখা দিয়েছ ॥
পথের মাঝারে তৃষাতুর হ'য়ে
মরীচিকা পানে ছুটেছি।
সরোবর হ'য়ে সাম্‌নে এসেছ
দয়াল তোমারে জেনেছি ॥
ক্ষুধায় কাতর হইয়ে যখন
ভুবন আঁধার দেখেছি।
সুমুখে হেরেছি—করুণার হাত
তখনি খাবার পেয়েছি ॥
নিদাঘ কালের খর রবি তাপে
দর দর ধারে ঘেমেছি।
ব্যথা-সহচর রূপে দেখা দেছ
চামর ব্যজন লভেছি ॥
শোকের দহনে আধমরা হ'য়ে
তোমারে কত না দুষেছি।
সান্ত্বনা রূপে হৃদে উঁকি দেছ
মরমের সখা জেনেছি ॥
তোমা হ'তে যত দূরে স'রে গেছি
ততই নিকটে এসেছ।
দরদিয়া বঁধূ! তুমি এত কাছে!
কেন বা ধরা না দিতেছ?

স্মরণ মঙ্গল শ্রীহরি নাম।

[শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ]

জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।
জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

ভক্তগণ নিয়ত ভগবদ্ধ্যানে ও ভগবৎ আরাধনাতেই নিরত থাকেন। শাস্ত্রে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিসাধনের কথা উল্লিখিত আছে। উহাদের মধ্যে কোন একটি অঙ্গ সাধন করিতে পারিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে। ভক্তিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের গুণ-লীলাদি শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীহরির গুণমাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণে প্রহ্লাদ, শ্রীহরির পাদসেবনে লক্ষ্মীমাতা, ভগবানের অর্চ্চনায় মহারাজ পৃথু, শ্রীহরির বন্দনায় অক্রূরমহাশয়, শ্রীভগবানের দাস্যে মহাভক্ত হনুমান, সখ্যে পাণ্ডব প্রবর অর্জ্জুন, এবং আত্মনিবেদন ফলে মহারাজ বলি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ শাস্ত্রোক্ত নববিধা সাধন বা ভক্ত্যঙ্গের কোন একটি বিশেষ অঙ্গ অবলম্বন না করিয়া সকল উপায়ই কিছু কিছু আশ্রয় করিয়া থাকেন। সাধনাঙ্গ যিনি যাহা আশ্রয় করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধনকার্য্যে প্রকৃত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার আবশ্যক; ধর্ম্মকার্য্যে শ্রদ্ধারই প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম। এইজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হই-য়াছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।

অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন, ভজনের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি (অর্থাৎ পাপ মোহাদি পরিত্যাগ) অনর্থ নিবৃত্তি হইতে নিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবচ্চরণে চিত্তের একাগ্রতা ; তৎপরে ভগবন্নামগুণাদি শ্রবণে রুচি, রুচি হইলেই ক্রমে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, এবং ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবের ইহাই ক্রম। অতএব দেখা যাইতেছে ধর্ম্মবৃক্ষের শ্রদ্ধাই বীজ। শ্রদ্ধা থাকিলে সকলেই কোননা কোন দিন ভক্তিরূপ অমৃতরস;অস্বাদন করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করিতে পারেন। কিন্তু শ্রদ্ধা যে সহজে হয় না। শ্রদ্ধা থাকিলে আর ভাবনা কি ? প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে আমরা সকলেই মোহাচ্ছন্ন। আমরা শাস্ত্র পাঠ করি, শাস্ত্র আবৃত্তি করি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি, ভগবন্নামাদি কীর্ত্তন করি, তথাপি আমাদের ভক্তিধন লাভ হইতেছে না। বুঝিতে হইবে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব। আমাদের কামিনী কাঞ্চনে যে আসক্তি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সে আসক্তি কোথায় ? শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্য মেকলং জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিতা মতি যদি কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি হইতে লাভের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা (সর্ব্বপ্রযত্নে) ক্রয় কর। (কারণ, ইহা নিতান্তই দুর্লভ।) একমাত্র লোভই ইহার মূল্য। এই লোভ কোটিজন্মের সুকৃত ফলেও সম্প্রাপ্ত হয় না।

এই অমৃতাদপি অমৃততুল্য দুর্লভ ভক্তি সাধন জন্য ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সঙ্গ নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

সাধুসঙ্গ হইতে আমার বীর্য্যব্যঞ্জক যে সকল (মনোহারিণী) কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ণ। সেই হৃদয়ানন্দকর এবং কর্ণের তৃপ্তিসাধক বাক্যাবলি শ্রবণে অতি শীঘ্র আমাতে অবিদ্যাবিধ্বংসিনী শ্রদ্ধা, রতি, এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে সঞ্জাত হয়। অতএব সাধুসঙ্গের মহিমা অপার। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।

ফলতঃ ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গের ফলেই জীব ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ভগবান বশিষ্ঠদেব যোগবশিষ্ঠ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

শূন্যং সঙ্কীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপদ সম্পদ দিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে ॥

সাধুগণের সংসর্গে চিত্তের শূন্যভাব বিদূরীত হয়। মৃত্যু ও উৎসব তুল্য (আনন্দজনক ব্যাপার) হয়, এবং বিপদ সম্পদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অতএব সাধুসঙ্গের জন্য চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য এই :—

ততোদুঃসঙ্গ মুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন। কারণ সাধুগণই হিতকর উপদেশ সমূহদ্বারা ভক্তিপ্রতিবন্ধককারিণী বাসনা নষ্ট করিয়া দেন। সাধুসঙ্গের মহিমা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথায় মহাত্মা নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে কহিয়াছিলেন—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা
অনুগ্রহেণাশ্রণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃন্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্তঙ্গ ! মমাভবদ্রতিঃ ॥

হে মুনে! সেইস্থানে ঋষিগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া প্রতিদিনই মনোহর কৃষ্ণকথা গান করিতেন। আমি সেই হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে পাইতাম। সেই পাবনীকথা নিয়ত শ্রবণ করিতে করিতে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানে আমার অনুরাগ জন্মিল। সাধুমুখে শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণই জীবের পরম মঙ্গল।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম ॥

কৃষ্ণ কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ বিদূরিত হয়। যাঁহারা হরি-কথা শ্রবণ করেন, সাধুগণের সখা পুণ্যশ্লোক শ্রীভগবান তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ হইয়া ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক পাপ সকল বিনাশ করিয়া থাকেন।

সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা এবং হরিকথা শ্রবণের এতাদৃশ ফল হইলেও সংসারী লোকের পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দুর্ঘট। বিশেষতঃ সংসারী লোক দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুগণকে চিনিতে পারেন না। এবং সংসারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভগবদ্ভক্ত নিষ্কাম সাধু. লক্ষের মধ্যেও একজনকে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তবে সংসারীদিগের উপায় কি?

আমার মনে হয়, সাধু সঙ্গের অভাবে সৎগ্রন্থাদির পাঠই অনেক সময়ে সাধু-সঙ্গের ফল উৎপাদন করে। সৎ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ভক্তমাল, শ্রীনরোত্তম দাসের প্রার্থনাবলি প্রভৃতি গ্রন্থ—বৈষ্ণবভক্তগণের নিত্য পাঠ্য। ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ আপন আপন রুচি অনুসারে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাদি গ্রন্থ

পাঠ করিতে পারেন। তবে আমার মনে হয় শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ অসম্প্রদায়িকতা ও বিশ্ব-জনীন উদারতার জন্য সকল সম্প্রদায়েরই পাঠ্য। অস্মদ্দেশে কথকতা ও হরি সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণও ভক্তিসাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এই প্রসঙ্গে আমি কতকগুলি চির-স্মরণীয় সুললিত সংস্কৃত শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। কিন্তু সেগুলি স্মরণমঙ্গল, অর্থাৎ নিত্য পাঠ্য, অতএব তাহাদের শতাবৃত্তি বা সহস্রা বৃত্তি হইলেও পাঠকের বা শ্রোতার উপকার ব্যতীত অপকার নাই। এই শ্লোক গুলির পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা আবৃত্তি বিষয় বিমুগ্ধ চিত্তকে চৈতন্য বিশিষ্ট করিবার যে অব্যর্থ উপায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১। হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

২। প্রাণ প্রয়াণ পাথেয়ং সংসার-ব্যাধি-ভেষজং।
রোগ-শোক-হরং পুংসাং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

৩। মহতা পুণ্য পণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্ত্বয়া।
পারং দুঃখ দধের্গন্তুং ত্বর যাবন্নভিদ্যতে॥

৪। যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

৫। যদচ্যুত কথালাপ-কর্ণ পীযুষ বর্জ্জিতং।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্॥

৬। তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

৭। তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ সিন্ধুঃ গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ॥

৮। বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তেচমধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

৯। শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনা বিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা ব্যক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজ নিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

১০। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥

১১। চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্॥

১২। নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

১৩। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মনি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

১৪। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

১৫। সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

কতিপয় ভক্তি-রসাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-রসের অনন্ত প্রস্রবণ। উক্ত মহাগ্রন্থে ভীষ্ম মুখে কুন্তী মুখে, দ্রৌপদী মুখে, বৃত্রাসুর মুখে, রুক্মিণী মুখে গোপীগণ মুখে, ধ্রুব প্রহলাদি ভক্তমুখে এবং উদ্ধবাদি মুখে যে সমস্ত শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে তৎসমুদয় উদ্ধৃত

করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভক্ত পাঠকগণ স্বয়ং ঐ সকল অনুপম শ্লোক পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। উপসংহারে আমি ভক্তি পথের প্রধান কণ্টক গুলি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শাস্ত্র বলেন—

জাতি বিদ্যা মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবন মে বচ।
যত্নেন পরিহর্ত্তব্যাঃ পঞ্চৈতে ভক্তি-কণ্টকাঃ॥

অর্থাৎ, জাত্যাভিমান, বিদ্যাভিমান, মহত্ত্বাভিমান, রূপাভিমান এবং যৌবনাভিমান এই কয়টা ভক্তি-পথের প্রধান কণ্টক। এ সকলকে যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। তারপর,—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ হৃদয়ে যতকাল ভোগলালসা বা মোক্ষ কামনা থাকে ততকাল উহাতে ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হয় না। এ পাপ হৃদয়ে ভক্তি-কণ্টক সকলই বর্ত্তমান। ভোগলালসাও সমধিক বলবতী। জনি না কবে কোন জন্মে ভক্তি দেবীর কৃপাকণা লাভে কৃতার্থ হইতে পারিব।

কেলি কদম্ব।

১

এই ত কদম্ব মূলে।
আমার লাগিয়া পরাণ বঁধুয়া
দাঁড়াইত কুতুহলে॥
(সই এই ত কদম্ব মূলে)

২

দুটি করে তুলি অধরে মুরলী
ডাকিত শ্রীরাধা বলে'।
শুনি বাঁশী স্বর ব্যাকুল অন্তর
পরান উঠিত জ্বলে॥
(সই পরাণ উঠিত জ্বলে)

৩

ত্যজিয়া যাবট আমি সন্নিকট
ভেটিতাম শ্যামরায়।
সেও ক্রোড়' পরি ধরিত গো ধীরি
হইয়া পাগল প্রায়॥
(সই হইয়া পাগল প্রায়)

৫

তুলি নানা ফুলে চম্পক, বকুলে
প্রেমসূতে মালা গাঁথি॥
পরা'ত উরসে মনের হরষে
হেরিত নয়ন ভরি॥
(সই হেরিত নয়ন ভরি)

৫

দু'বাহু পসারি হৃদয়েতে ধরি
কহিত মরম বাণী।
পিয়াসী চকোর প্রেমেতে আগোর
চুমিত বদনখানি॥

৬

(আবার) মুখখানি লইয়া বুকেতে ধরিয়া
কহিত মধুর স্বরে।
(রাই) আমি যে তোমার চরণের দাস
বিকানু জনম তরে॥
(দেখো চরণছাড়া ক'রোনা গো)

৭

এ হেন পিরীতি আরতি বাঢ়ায়ে
কোথায় লুকাল কান।
(আমি) অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া মরি
না যায় নিলাজ প্রাণ।
(সই না যায় নিলাজ প্রাণ)

শ্রীনন্দকুমার মিত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

ভক্তি

আষাঢ়
১৩৩৮

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

আনন্দলীলা-রসবিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

হে চির অনর্পিত প্রেম-ধনবিতরণকারী গোরহরি! তোমার কোটী-চন্দ্র সুশীতল রাতুলচরণযুগলে এ দীনহীন অভাজনের কোটী কোটী প্রণাম। কলির সন্ধ্যায় যখন জীবগণ কলির প্রবল শাসনে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল, যখন ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার ব্যভিচার লোকসমাজে অবাধে চলিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে তুমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া নিজ কারুণ্যরসে বিভোর হইয়া জীবের দুঃখ দূর করিতে আসিয়া উদয় হইয়াছিলে। কেবল উদয় হইয়াই নিবৃত্ত হওনাই, তুমি নিজে আচরণ করিয়া কি ভাবে কলুষিত জীবের

হৃদয়ের কালিমা সকল দূর হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া কলিপীড়িত মুমূর্ষু জীবকে রক্ষা করিয়াছিলে। দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া, জীবগণকে অসমর্থ দেখিয়া, ভোগপরায়ণ জীবের উদ্ধারজন্য প্রেমেরহাট পত্তন করিয়াছিলে। যাহারা ভাগ্যবান ছিল, তাহারা সেই প্রেমেরহাটে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত প্রেমসুধা পান করিয়া ভবের বিকারজনিত দারুণ পিপাসার শান্তি করিয়াছিল। আর আমার মত যে মুগ্ধ—মায়ার দাস ছিল, সে তখনও বঞ্চিত ছিল, এখনও বঞ্চিত আছে।

তোমার দয়ার সীমা পরিসীমা নাই। তুমি অমন সাধের গোলকধামকেও পরিত্যাগ করিয়া সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিয়া প্রেমসুধা বিতরণ করিলে। যে হরিনাম বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, তোমার কৃপায় জীব সেই নাম তরঙ্গে হাবুডুবু খাইল—নাম গানে মাতোয়ারা হইয়া মনের আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। শুধু তোমারই দয়ায় বিরস জীবকুলের নীরস জিহ্বা নামরসে সরস হইল। আপামর সাধারণ প্রেম-সুধারসের আস্বাদ পাইয়া সংসারের সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইল। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সাধু গুরুমুখে শুনিতে পাই, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নানারূপে নানালীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছ, কিন্তু কলিযুগের কথা আলোচনা করিয়া দেখি তুমি কলিকবলিত জীবগণকে সমান ভাবে প্রেমরস আস্বাদনের অধিকার দিয়াছ। পাপী তাপী, দীন দুঃখী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, উচ্চ নীচ কিছুই বিচার কর নাই, সকলকে সমান করিয়া প্রেমাস্বাদনে ধন্য করিয়াছ, তাইত তোমার প্রেমপ্রচারের ভঙ্গী দেখিয়া রসিককবি প্রেমানন্দ দাসের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"

তুমি প্রেমিকের প্রাণ, পাষণ্ডের ত্রাণকর্ত্তা, ভক্তের জীবনধন, অভক্তের পাবন, সাধুর আনন্দ, পাপীতাপীর আশাভরসা স্থল, তোমার তুলনা জগতে নাই, একমাত্র তুমিই তোমার তুলনা।

তুমি তখন আসিয়াছিলে বলিয়া এখন যে নাই তাহা ত নয়, তুমি তোমার অনন্ত শক্তিতে এখনও বিরাজিত আছ, এখনও লীলা করিতেছ, তবে তোমার সেই সুর-নর-মুনি-মোহন লীলা, "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" প্রভু হে, দীনের ভাগ্যে কি সে ভাগ্যবানের কৃপালাভ ঘটিবেনা? আমি ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণ ভবার্ণবে পড়িয়া, কাম ক্রোধাদি জলজন্তুসমাকুল ভীম তরঙ্গে সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত, তাহার উপর আবার দুর্ব্বার বাসনারূপ প্রবল পবনে উত্তেজিত হইয়া দিবানিশি ঘুরিয়া মরিতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণতরি দিয়া তোমার আচরিত পথে লইয়া চল, প্রলোভনে পড়িয়া যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ ভুলিয়া কুপথে না যাইয়া পড়ি। কৃপা করিয়া দীনের আশা পূর্ণ কর, এবার তোমার অভয়পদে আমার ইহাই প্রার্থনা।

দীন—শ্রী—

ভোগ বিরাগের বিবাদ।

(শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি)

জীব জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগবিরাগে,
ভোগবিরাগে বিরাগে ভোগে দ্বন্দ্বলাগে,
ভোগ বিরাগে॥

ভোগ বলে এ সংসার সুখের বাজার,
বৈরাগ্য বলে মরুভূমি মরীচিকাসার,
এসব মায়ার বিকার॥

ভোগ বলে আমার সব এই স্ত্রী কন্যা তনয়,
বৈরাগ্য বলে এরা সব পথের পরিচয়,
এরা কেউ কার নয় ॥
ভোগ বলে লাবণ্যময় মধুর যৌবন,
বৈরাগ্য বলে মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন,
থাকে ক'দিন তেমন ॥
ভোগ বলে কত সুধা রমণী অধরে,
বৈরাগ্য বলে বড়শি-পিণ্ড যেন সরোবরে,
মৎস্য মারিবারে ॥
ভোগ বলে দেহের শোভা করি পরিপাটি,
বৈরাগ্য বলে জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটী,
বৃথা আঁটা আটী ॥
ভোগ বলে কোমল শয্যায় শয়নকরি সুখে,
বৈরাগ্য বলে শ্মশানশয্যা মনে যেন থাকে,
দিবে অগ্নি মুখে ॥
ভোগ বলে রাখি রথ গজ বাজি দ্বারে,
বৈরাগ্য বলে মুদ্‌লে আঁখি সব ফাঁকি যে পরে,
মায়ায় ভুল'নারে ॥
ভোগ বলে বহু দাসদাসীর প্রভু হই,
বৈরাগ্য বলে আর কে প্রভু জগৎপ্রভু বই।
জীবের প্রভুত্ব কই ॥
ভোগ বলে সম্মান পাই রাজার দরবারে,
বৈরাগ্য বলে কি হবে যমরাজার দুয়ারে,
তাক ভাবনারে ॥

ভোগ বলে অতুল ধনের আমি অধিকারী,
বৈরাগ্য বলে নিদানকালে গুন্‌দড়ি বাঁশ ধারি
ঘুচ্‌বে জারি জুরি ॥
ভোগ বলে তবে কি সব কিছুই কিছু নয়,
বৈরাগ্য বলে সব দেখ ঐ ভোজেরবাজি ময়,
চিরদিন নাহি রয় ॥
বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান,
দীন মহেন্দ্র বলে কর সবে হরিগুণগান'
হবে ভোগ অবসান ॥ *

* ভক্তির নূতন গ্রাহকগণের অনেকেই প্রথম হইতে পত্রিকা চাহেন, কিন্তু আমাদের নিকট ১৪শ বর্ষ হইতে পত্রিকা আছে। তাহার পূর্ব্বের পত্রিকায় অনেক মহাত্মার সুললিত প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল। তাঁহারা পত্রিকা না পাইয়া সেই সকল পত্রিকা হইতে ২।১টী ভাল ভাল প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতে বলিলেন। বেশী পারিব না তবে মধ্যে মধ্যে গন্থ বা পন্থ ২।১টী অবিকল অথবা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বলিখিত লেখকের নামেই প্রকাশ করিব। ভক্তির পুরাতন পাঠকগণ পুনরুক্তির জন্য ক্ষমা করিবেন। বলা বাহুল্য এটীও পূর্ব্বপ্রকাশিত পুরাতন লেখা।—(ভঃ সঃ)

শ্রীশ্রীঅমিয়নিতাই চরিত

[ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস]

(১৬)

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছে, তাহারা দধি দুগ্ধ প্রভৃতি উপহার লইয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোক গৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে শ্রীভগবান ভাবিয়া

মনে মনে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহারা নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন, সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে "ন'দের চাঁদ" কি "সোনার মানুষ" প্রভৃতি সুমধুর নাম দিতেছেন।"

(শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত)

অপরদিকে প্রভুর বৃহৎ একদল শত্রুও হইয়াছে। তাহারা প্রভুর শ্রীবৃদ্ধিতে বড়ই ঈর্ষাপরায়ণ হইল। চরিতামৃতে আছে—

"তবে শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥"

তখন হোসেন সাহ ছিলেন গৌড়ের রাজা, আর দবির খান ও সাকর মল্লিক (পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া ইহাদের নাম হইয়াছিল শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ) ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। গঙ্গার ধার ছত্রভোগ পর্য্যন্ত হোসেন সাহের অধিকার ছিল। তৎ পরপারে প্রবল প্রতাপ উড়িষ্যার রাজা, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা। সুতরাং হোসেন সাহই নবদ্বীপের রাজা আর এই রাজার দৌহিত্র, চাঁদ কাজী নদীয়ার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। বহু সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি নবদ্বীপের একপ্রান্তে, বেলপুখুরিয়া নামক স্থানে বাস করিতেন। শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায় নামক দুইজন ব্রাহ্মণ এই সময় নবদ্বীপে কোটালের (সহর কোতোয়াল বা police officer) কার্য্য করিতেন। ইহাদের বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে বলিব। এক প্রাচীন পদে বর্ণিত আছে—

"হরি বোল বোলরব কেন শুনি নদীয়ায়?
মাধা জেনে আয়, জেনে আয় মাধা জেনে আয়॥

শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর-গুণমণি।
সেই অবধি নবদ্বীপে শুনি হরি ধ্বনি॥
শ্রীবাস বাম্‌না বেটার নিজে জাতি নাই।
জাতিনাসা অবধূত ধরে দিল ঠাঁই॥
শান্তিপুরের বুড়া গোঁসাঞি আগে ছিল ভাল।
পাগলের সঙ্গ ধৈরা সেও পাগল হৈল॥
নিতা পাগল, চৈতা পাগল, আর এক পাগল অদে।
তিন পাগলে নৈদায় মিলি রাধা বলি কাঁদে॥
যারে মাধা কাজী পাড়া আনগে কাজীগণ।
এক কালে ভাইঙ্গা দিব সাধের সঙ্কীর্ত্তন॥
চল সকলে এককালে বাম্‌না পাড়া যাই।
শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গাতে ভাসাই॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের গৃহে কপাট দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। বাহিরের লোকের তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল না। তাহারা এই নবীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা অদ্ভুত জল্পনা কল্পনা ও আন্দোলন করিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"কেহ কহে এগুলা সকল নাকি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর॥
কেহ বলে আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥

কেহ বলে হেন বুদ্ধি পূর্ব্ব সংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গ দোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাই তাতে আছে বাই।
এত দিনে সঙ্গ দোষে ঠেকিল নিমাই॥
কেহ বলে পাশরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥
কেহ বলে আরে ভাই! সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানা বিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবার সনে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক না দেখিলে হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ বহিরঙ্গ লোকের এই সমস্ত আলোচনা শুনিলেন। তখন সেই কারুণ্য বারিধি প্রভুর চিত্ত জীবের দুঃখে হাহাকার করিয়া উঠিল। তাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—

"একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরি দাস!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বহি আর, না বলাবে, না বলিবা,—
দিবা অবসানে আসি আমাকে কহিবা॥"

তোমরা ভিক্ষা করিবে যাহারা কৃষ্ণ নাম না বলিবে, আমি চক্রে হস্তে তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিব। তোমরা এই নবদ্বীপে, ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, সাধু অসাধু, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে কৃষ্ণ নাম দান কর। তাঁহারা উভয়েই পরম করুণ, বিদেশী এবং শক্তি সঞ্চার সক্ষম। নবদ্বীপে জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার কার্য্য এই প্রথম। এবং প্রভু উপযুক্ত হস্তেই এই ভার ন্যস্ত করিলেন। ভক্তগণ, প্রভুর অপূর্ব্ব আদেশ বাণী শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন! নিতাই হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া—তখনই প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশ কে লঙ্ঘন করিবে। পথে আসিয়া দুই জনে পরমানন্দে হাসিতেছেন, আর নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে বলিতেছেন "তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ—এই আমাদের ভিক্ষা, গৃহস্থ তাঁহাদের দ্বারে এই তেজঃ পুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ হইয়া—যাহার যেমন শকতি চাউল প্রভৃতি লইয়া ভিক্ষা দিতে আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ত চাউল ভিক্ষা লইতে আসেন নাই? তাঁহারা নিতাইর সুধা মধুর অপূর্ব্ব বাণী শুনিয়া স্তম্ভিত হইতেছেন। নিতাই বলিতেছেন, ভাই সব তোমরা—

"বলকৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই! হই এক মন ॥"

যাহারা ভাল লোক তাঁহারা এই সন্ন্যাসীদ্বয়ের আকার ও আর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহারা দেখিল ইহারা ত কোন অভাব জানায় না। ইহাদের প্রার্থনাও ত বড়ই বিচিত্র। "আহা কি দায়! ইহা বলিয়া তাহারা কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিল।

কেহ বলিল এ দুই জন পাগল। যাহারা শ্রীবাস আঙ্গিনায় নিশীথে প্রবেশ করিতে না পাইয়া প্রভুর বিদ্বেষী হইয়াছে তাহারা "মার মার করিতে

লাগিল এবং বলিতে লাগিল "তোমরা দুষ্ট সঙ্গ দোষে পাগল হইয়াছ—আমাদিগকে আবার পাগল করিত আস কেন ? নিমাই পণ্ডিত সকলকেই পাগল করিল, সভ্য ভব্য লোকও তাহার সঙ্গে পাগল হইল।"কেহ বলিল ইহারা চোরের চর, ছল করিয়া লোকের বাড়ীর সংবাদ লইতে আসে। সৎলোকে এমন কাজ করিবে কেন ? এবার আসিলে, আমরা কাজীর নিকট ধরিয়া লইয়া যাইব।

"ঠিক কথা—ইহাঁরা চোরেরই চর। ননীচোর—ব্রজ গোপীর বসন চোর, ভক্তজনের মন চোর বলিয়া যিনি প্রসিদ্ধ, সেই চোরেরই ইহাঁরা চর। সে চোর সত্যই সবাকার অবিদ্যা হরণ করিয়া থাকেন ; চাই কি, তোমাদেরও ঐ চোরের হাতে পড়িতে হইবে।" (অচ্যুত বাবু)

এই সকল কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস হাস্য করেন। "কৃষ্ণবল" ব্যতীত কাহাকেও কিছু বলেন না। দিবাবসানে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া প্রচার বৃত্তান্ত অবগত করান।

[জগাইমাধাই উদ্ধারের সূচনা]

"প্রেমে মত্তোয়ারা নিতাই নাগর।
অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর॥
প্রেম ভরে অন্তর গর গর।
না জানেন পঁহু কে আপন পর॥
হেন দয়া কোথা এ ধরণী পর'
দেয় প্রেম বেদ বিধি অগোচর॥
পাতকী উদ্ধার কার্য্য নিরন্তর।
পতিতের দুঃখে নেত্র বহে ঝর॥

যাচি প্রেম দেয় সবে অকাতর।
অফুরন্ত যেন ভাণ্ডার সুন্দর ॥
কানু দাস কহে জুড়ি দুই কর।
পদে দিহ স্থান এ দীন কিঙ্কর ॥"

"হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুক প্রিয় ও চঞ্চলের সহিত নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমতঃ নগর ভ্রমণ করিত, গঙ্গা তীরাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু সন্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, তবে তিনি যে কখন কোথায়, এ ঘাটে কি ও ঘাটে, এ পারে কি ও পারে উঠিবেন,—তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুম্ভীরের ন্যায়, নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীর হইতে "শ্রীপাদ উঠ" "শ্রীপাদ উঠ" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ্ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেন, তবে কটির ডোর খুলিয়া তাহার দুই পা ছাঁদিয়া, দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভী সে কখন কখন নিতানন্দকে ধরিত, কিন্তু ধরিয়া সে নিত্যানন্দের কি করিবে? কেহবা হাসিয়া উঠিত, কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাসি ও ধমক দুইই সমান। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটী শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোখ পাকাইয়া মুখ ব্যাদন করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন; শিশু, মা কি বাবা, বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আসিল, তখন হরিদাস তাহাকে বুঝাইয়া—পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখনও বা নিত্যানন্দ ষাঁড় দেখিয়া এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ষাঁড় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া

কখন তাঁহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল, যদি ষাঁড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে "আমি মহেশ, আমি মহেশ" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক্ !"

(শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত)

শ্রীনিত্যানন্দ এইবার এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সেই ঘটনাই আমরা এখন বিস্তার করিয়া বলিব।

"শুভানন্দ রায় নবদ্বীপের জমীদার, রাজা বলিয়াই কথিত হইতেন। ইঁহার রঘুনাথ ও জনার্দ্দন নামে দুই পুত্র। জগন্নাথ মাধব যথাক্রমে ইহাদেরই পুত্রদ্বয়ের নাম ; এই জগন্নাথ ও মাধবই জগাই মাধাই নামে প্রসিদ্ধ।"—(অচ্যুত বাবু।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহর কোতোয়ালের পদ তাহাদেরই ছিল। ধনী সন্তান, কুলীন ব্রাহ্মণ, বড়লোকের ছেলে, নগরের কর্ত্তা, এরূপ লোক কুপথে যাইলে যেরূপ হয়, তাহাদেরও সেইরূপই হইয়াছিল। তাহারা নগরের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়াছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া লোকের উপর যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিত। লোকের গৃহে চুরি, ডাকাতি, গৃহদাহ, জাতিনাশ, ঘর লুণ্ঠন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত।

"মহাদস্যুপ্রায় দুই মত্তপ বিশাল॥
সে দুইজনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলয়ে কোটাল।
মদ্য মাংস বিনে আর নাহি যায় কাল॥ (চৈঃ ভাঃ)

"গোবধ, ব্রাহ্মণবধ যত পাপ হয়।
পাপমধ্যে কোন পাপ বাকি নাহি রয়॥" (প্রেম বিলাস)

নিত্যানন্দ ও হরিদাস দেখিলেন, তাহারা পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকেই কিলাইতেছে। আপনা আপনি মদখাইয়া কোন্দল করিতেছে—আবার পরক্ষণেই গলাগলি করিয়া ভাব। কখনও বা কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দিয়া বলিতেছে, আজি নদীয়ার ব্রাহ্মণদিগের জাতিনাশ করিব। তাহারা সমস্ত পাপই করিয়াছে কেবল বৈষ্ণব নিন্দারূপ মহাপাতক তাহাদের দেহে আশ্রয় করে নাই। সর্ব্বদা মাতালের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে সুতরাং বৈষ্ণব নিন্দা করিবার সুবিধা ও সুযোগ ঘটেনাই। বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিলেও ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। পরচর্চ্চা করার তুল্য বড় পাপ আর নাই।

(ক্রমশঃ)

"গোরা চিতচোরা।"

(শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায়।)

দেখিনু নিশিতে স্বপনমাঝে।
কেমনে নাচিছে মোহন সাজে॥
　　গৌরবরণ সুন্দর যুবা।
　　যিনি কোটীকাম মনোলোভা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি প্রেমেতে ভোরা।
নাচিছে গাহিছে আপন হারা॥

হরি হরি বোল বলিয়া সঘনে।
হাসিছে কাঁদিছে আপন মনে॥

শুনি মোহন কণ্ঠস্বর তাঁর।
বাঁশরীর ধ্বনি মানিছে হার॥

শুনিয়া তাহার নামের ধ্বনি।
দেখিয়া তাহার মুরতিখানি॥

কুল মান প্রাণ গেল বিকা'য়ে।
প্রাণহীন দেহ র'য়েছে প'ড়ে॥

সুন্দর সুন্দর সুন্দর সে যে।
মধুর মধুর মধুর হাসে॥

ভরপুর প্রেমে ইতিউতি ধায়।
প্রেম দিঠে পুনঃ ইতিউতি চায়॥

সে ঘুমঘোর কেনগো ভাঙ্গিল।
সে গোরাচাঁদ কোথা চলি গেল॥

মানস আমার করিয়া চুরি।
কোথায় লুকাল গৌরহরি॥

বলগো সজনি কি করি উপায়।
কোথা গেলে সে চিতচোরে পাই॥

বলগো সজনি কি উপায় করি।
গোরাহীন প্রাণ রাখিতে নারি॥

"অনন্ত" কহিছে হ'ওনা কাতরা।
এখনি মিলাব তব চিতচোরা॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌর-চরিত কথা বা বিশ্বজনীন বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম।

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ)

যথার্থই সেই পরম উদ্ধত প্রভু, অপরিসীম বিদ্যাদর্পী, অপরিসীম বলশালী, অতুলনীয় রূপবান্, অতুলনীয় জ্ঞানী, গুণবান্, রহস্যপ্রিয় নবীন যুবকটী গয়ায় পিতৃকার্য্য করিতে যাইয়া শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম-দর্শনে অপর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কি যেন এক অভাবনীয় আকর্ষণে দেহ মন তন্ময় হইল। মুখখানি অরুণরাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। দেহ-যষ্ঠি কম্পিত হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপ্লুত হইল। এ বারিধারার আর বিরাম নাই। ইহা যেমন গয়াক্ষেত্রকে তৎকালে আর্দ্র করিল, তেমন নবদ্বীপ-ভূমিকে আর্দ্র করিবে। জগৎকে পবিত্র করিবে।

সেই প্রভু নবদ্বীপে ফিরিলেন। নবদ্বীপবাসী এবার তাঁহার নূতন মূর্ত্তি দেখিলেন।

"যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণবিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
পরম সুনম্র হই প্রভুকথা কয়। (মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ)

প্রভু নম্রতার আধার হইলেন। ভগবদ্ভক্তির অফুরন্ত প্রস্রবন বুকের ভিতর লইয়া উহাই জগৎকে শিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু আজ বিনয়ে দীনাতিদীন। আজ তিনি ভগবদ্ভক্তের সেবা-পরিচর্য্যা ভিক্ষা

করিতেছেন। দেখাইতেছেন, ভক্তসেবা ব্যতীত ভক্তি সঞ্জাত হয় না। তাই গঙ্গার ঘাটে করজোড়ে ভক্তগণের প্রতি নিবেদন করিতেছেন,

তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই।
এত বলি কার পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙারয়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।

* * *

আপন দাসের হয় আপন কিঙ্কর।

আরও—

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥ (মধ্য ২য়)

এই যে কিঙ্কর-ব্রত মানুষের সেবায় মানুষের যোগ্যতা, ইহাই মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। তাহার জ্ঞান-গুণ-গরিমা যাহা কিছু অর্জ্জন সমুদয়ই কি এই সেবাধর্ম্মের অনুধাবনের নিমিত্ত নহে? এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষাদাতা স্বয়ং ভগবানই জগতে মানুষ হইয়া মানুষের সেবা-কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তি, যথা—

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥

ইহা তাঁহার বিশেষ প্রতিজ্ঞা। স্থূলতঃ তিনি সর্ব্বজীবের সেব্য ও প্রতিপালক, ধাতা, পোষ্টা ও ত্রাতা। কিন্তু এ যুগে তিনি দয়া, প্রীতি ও সেবার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছেন। মূর্খ, নীচ, নির্গুণ ও পতিতের প্রতি তাঁহার সমধিক কৃপা ও সেবার আয়োজন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের চিহ্নিত বিশেষত্ব।

"সর্ব্বভূত কৃপালুতা প্রভুর চরিত।
সভার সম্মানে ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥"

ইহাই ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। গ্রন্থকার এই বিশ্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মই তাঁহার আদর্শ হৃদয়দেবের পূতচরিত্র-প্রসঙ্গে পুণ্যময়ী লেখনী-মুখে সন্নিবেশ করিয়া যাইতেছেন।

উহা আরও সুস্পষ্টভাবে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা (মধ্য ৫ম)—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং।
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং ত্বমেব॥
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
প্রদ্রুহ্যবাজ্ঞো নরকং প্রয়াতি॥
বৈষ্ণবে হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধমে পীড়াকরে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায় আরো দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
শ্রদ্ধাকরি মূর্ত্তি পূজে ভক্তে না আদরে।
মূর্খে নীচে পতিতেরে দয়া নাহি করে।
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার॥
বলরাম শিবপ্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনারে॥

"শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্তে না আদরে।
মূর্খে, নীচে পতিতেরে দয়া নাহি করে।"

গ্রন্থকারের এই দুই কথা ... প্রকট মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় সমাজে অবতীর্ণ। ইহাই যথার্থ নাস্তিকতা। ইহাই দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রভুর অবতার।

গ্রন্থকার ভাগবতধর্ম্মে পরনিন্দা কিরূপ বর্জ্জনীয়, দেখাইতেছেন,—

কাহারো না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। (মধ্য ১০ম)

স্বয়ং প্রভুর মুখে উহা এইরূপে প্রকাশ—

আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পরহিংসে সেই যায় নাশ॥ (মধ্য ১৯)

পরনিন্দা পরপীড়া বর্জ্জন, জীবে দয়া ও সেবাধর্ম্মই ভগবদ্ভক্তি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধনা।

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত সব মোর দাস" সব মোর নিজ জন। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত কে আমার পর? কাহাকে ছাড়িব? সুতরাং জীবমাত্রের পীড়া আমার অসহনীয়।" এতেকে যে পরহিংসে সেই যায় নাশ।" পাঠক, বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উদারতা ও প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে পাঠ করুন।

"সবার সম্মানে ভাগবতধর্ম্ম হয়।" ইহা সুপ্রসিদ্ধ কার ভাষ্য মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্তকরি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্যকরি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।"

"সমানো দ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।" শ্রীভগবদ্গীতার এই সুমধুর বাক্য অনুসারে সমগ্র বিশ্বকে উদ্বেগশূন্য, ভীতিশূন্য, শান্তিময় করিতে, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রীতিদ্বারা মধুময় করিতে একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মই সমর্থ। দেশ, কাল, সম্প্রদায়, মতে সীমাতে ইহা আবদ্ধ নহে। "সভার সম্মান ভাগবতধর্ম্ম হয়।" একথা স্মরণ করিলে ক্ষুদ্রতার লেশ নিঃসংশয়িতরূপে মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়। বিশ্বনাথের পরিপূর্ণ প্রেমধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বাঙ্গালী এই পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি একদিন তাহার ঘরের ছেলের সুবর্ণসুন্দর কান্তিতে পূর্ণ প্রকটিত দেখিতে পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত তাঁহারই অকৃত্রিম উজ্বল কীর্ত্তিগাথা। (সেবা ৪-৩)

পারের নাবিক

(শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

সংসাররূপ পঙ্কিল প্রবাহযুক্ত, ক্ষুব্ধতরঙ্গায়িত বিপদসঙ্কুল মহার্ণবের তীরে দণ্ডায়মান ছিলাম। মহার্ণবের সেই ভীষণ গর্জ্জন আমার পরপার গমনের যাবতীয় আশা নির্ম্মূল করিয়া দিতেছিল। কত পারের যাত্রী আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে কত মহাজনের পারের তরী তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে। কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না—সকলেই নিজের লইয়া ব্যস্ত। সম্মুখে অশ্রান্ত প্রলয়গর্জ্জন পবনে পবনে বহিয়া আসিতেছে। সকলেই আত্মহারা। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত, পাপ ধূলিধুসরিত এই অধম আমি পারের যাত্রী। আশা পরপারে যাইব। সেখানে পরম কারু-

নিক মঙ্গলময়ের স্নেহ আলোক দিবানিশি অবিশ্রান্ত ধারায় বিচ্ছুরিত হইয়া সাধক জীবন মথিত করিয়া তুলিতেছে। আমি ক্ষুদ্র হইলেও—নীচ হইলেও, জগতের সকলের নিকট ঘৃণ্য হইলেও সেই আলোকের প্রার্থী। সকলকে বলিতেছি আমি পরপারের যাত্রী। কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না—কেহ একবার ফিরিয়াও দেখে না। সকলেই ব্যস্ত। তারপর প্রবল উচ্ছ্বাসিত ব্যাকুল জলধি মথিত করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল চির-বাঞ্ছিত, গন্ধে বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, অকাশ ভুবন আলোকিত করিয়া ঐ গৈরিক বস্ত্রধারী মহাপুরুষের পারের তরী আসিয়াছে।—জটাজুট সমন্বিত কাষায় আলখাল্লা পরিহিত, মহা জ্যোতি বিশিষ্ট দেহভার লইয়া মহানাবিক দণ্ডায়মান। তদ্দর্শনে মনপ্রাণ ব্যাকুল হইল। মহা-পুরুষের হৃদয় হইতে এক বৈদ্যুতিক জ্যোতি আমার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। ওগো পারের কর্ত্তা! তুমি আসিয়াছ, আমাকে উদ্ধার কর—রক্ষা কর—অন্ধনয়ন চির উন্মিলিত কর—আমার চির প্রার্থিত আশা সফল কর। অসহ্য এই পাপের বোঝা নামাইয়া লও। তুমি দয়াময় তবে দয়া নিশ্চয়ই লাভ করিব। তুমি শিবময় সুতরাং মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। তুমি রক্ষাকর উদ্ধার কর। পারের কর্ত্তা অধমের দিকে কৃপা দৃষ্টি করিলেন। সেই মুহুর্ত্তে উন্মাদবৎ তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত হইলাম পরপারে যাইবার কড়ি চাহিলেন। আমি বলিলাম আমার যাহা কিছু জীবনের সৎবৃত্তি আপনার শ্রীচরণে দিয়াছি। প্রসন্ন বদনে স্নেহ মধুর কথা প্রকাশ হইল। আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেবল অশ্রুজল তাঁহার রাতুল চরণ যুগল সিক্ত করিল। তারপর বলিলাম "ওগো! আমি যে তোমার কাছে চির বিক্রীত হইতে আসিয়াছি"।

তিনি কৃপা করিলেন—বলিলেন "তোমাকে গ্রহণ করিয়াছি"।

এইবার সমুদ্রের করাল ভৈরব গর্জ্জন শান্ত হইয়াছে। যাবতীয় পৈশাচিক অট্টহাস্যের অবসান হইয়া চির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বিকশিত হইয়াছে। গন্ধে, বর্ণে শোভায় শোভায় পৃথিবী শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। কেবল দেখিতেছি সেই কাষায় আলখাল্লা পরিহিত শ্রীমহানাবিক এবং এই ক্ষুদ্র অভাজন। তরণী চলিয়াছে—বেশ বুঝিয়াছি আমি চির মঙ্গলময়ের নিকট চির বিক্রীত হইয়াছি। তিনি নব নব রূপে আমার মানসনেত্রে উদিত হইতেছেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। পরে জানিতে পারিলাম তিনি শ্রীনারায়ণ কিন্তু নাবিকের বেশ ধারণ করিয়া পতিত অভাজনকে উদ্ধার করিতে এই বেশে উদয় হইয়াছেন।

বিধি ও মানুষ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন।)

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবী জুড়িয়া যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক। এই সব আন্দোলনের একটী লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট। বর্ত্তমান পৃথিবীর তরুণ সম্প্রদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আদিষ্ট শাসন মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা যুক্তি চায়। ভগবানের প্রেমে বা মরণের ভয়ে, স্বর্গের আশায় বা নরকের আশঙ্কায় তাহারা বর্ত্তমানের ভোগ সুখ ছাড়িতে চাহিতেছে না। তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া কোনই লাভ নাই। এই মনোভাব পৃথিবী ব্যাপী। ইহা বর্ত্তমান যুগের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। পৃথিবীতে যে সব ধর্ম্ম

রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটিই বাহিরের একজন কর্ত্তার শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের শাসন, কোন মহাপুরুষের শাসন, কোন মণ্ডলীর শাসন বা কোন গ্রন্থের শাসন; কিন্তু সবই বাহিরের শাসন। বাহিরের শাসন অচল হইয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া কি ধর্ম্ম থাকিবে না? ধর্ম্ম থাকিবেই, ধর্ম্ম কখনই নষ্ট হইতে পারে না। ধর্ম্ম আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, বাঁধিয়া রাখে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের, এখন তাঁহাকে ভুলিয়া দুঃখ পাইতেছি। ধর্ম্ম আমাদিগকে আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, তিনি বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বাশ্রয়। এই ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, ইহা নষ্ট হইবে না। বর্ত্তমান যুগে অনেক ভাললোক নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাবাদী। কিন্তু তাহাদেরও একটা সিদ্ধান্ত বা নীতি আছে এবং তাহারাও সেই নীতি-অনুসারে চলিতে চায়। সুতরাং, কে বলে তাহারা সকলেই ধর্ম্মহীন? পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থা বদ্‌লাইতেছে, আমরা এক নব-জগতে যাইতেছি। সে জগতে প্রতিযোগিতা থাকিবে না, সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইবে। বহিঃস্থ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে চলার জন্যই প্রতিযোগিতার জন্ম হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অর্থই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, সংগ্রাম,—কুরুক্ষেত্র। বাহিরের কর্ত্তার হুকুম অন্ধভাবে জড় বস্তুর মত মানিয়া লওয়াতেই এই কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক বড় হইয়া, কর্ত্তা হইয়া, শাসক হইয়া, মালিক হইয়া থাকিতে চায়। ফলে স্বার্থ-সংঘর্ষ ও সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। একদল মালিক হইতে চাহিলেই আর একদল বিদ্রোহী হইবে। আমি নিজ জীবনে যে সুখ, সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা চাই, অন্য সকলেরও সেই সুখ সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতায় তুল্যরূপ অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে আর গোল থাকে না। ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীনতা না পাইলে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা হইতেই পারে না। ইহাই যুগ লক্ষণ। সুতরাং বাহিরের ঈশ্বর, বাহিরের বেদ, বাহিরের গুরু, ইহাদের শাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

ভয়ে বা লোভে ইহাদের নিকট আর কেহ মাথা নোয়াইবে না। কিন্তু, তাই বলিয়া, ঈশ্বর, বেদ বা গুরু কি থাকিবেন না? খুব থাকিবেন, খুব ভাল করিয়া সত্য-রূপেই থাকিবেন। কিন্তু, এই ঈশ্বর, এই বেদ ও এই গুরু মূলে অন্তরের বস্তু, প্রেমের বস্তু। গদা চক্রের ভয়ে নহে, বাঁশির প্রেম রসে। ইহাই গীতা ও ভাগবতের ধর্ম্ম, ইহাই নব বৃন্দাবনের বাণী, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শিক্ষা। (বীরভূমি ৮-১২)

বৈরাগ্যের প্রবোধ।

দুর্গেশ ঠাকুর শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে এক খড়ের কুঁড়ে ঘরে বাস করিতেন। হারাধন বণিক তাহার শিষ্য। হারাধন সম্পত্তিশালী, স্ত্রী-পুত্রবন্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। ধনের পিপাসা তার খুবই ছিল। ভগবানে ভক্তি থাকিলেও অর্থাশক্তি কম ছিল না। পয়সার হিসাব তার কোনদিন গোলমাল হইত না। সে বলিত, "আসলে দু'টাকা ছাড়া যায়, কিন্তু সুদের এক পয়সাও ছাড়া যায় না। সুদই কারবারের লক্ষ্মী।"

হারাধনের সংসার বেশই চলিতে ছিল। হঠাৎ একটী পুত্রের মৃত্যু হইল। হারাধনের স্ত্রী কান্দিয়া পাগল হইল। হারাধন পুত্র-শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। দিনে দু'বেলা দুর্গেশ ঠাকুরের কাছে যাইয়া কেবল শোকের কান্না কান্দিতে লাগিল। ঠাকুর মহা উৎপাতে পড়িলেন কতবার তাহাদিগকে তীর্থ পর্য্যটনে যাইতে বলিলেন। তাহারা তাহাতে রাজী হইল না। পুত্র ত গিয়াছেই, আবার তীর্থগমনে কতকগুলি টাকা যাইবে। হারাধন হিসাবের ঘরে খুব টন্‌টনে!

ঠাকুরকে তারা ছাড়ে না। ঠাকুর একবার কামাখ্যায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন। হারাধন জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কামাখ্যায় যাইবেন কেন? ঠাকুর তখন একখানি পত্র বাহির করিয়া দিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

"শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু নিবেদনঞ্চাগে

বাবা গত বিশুদ্‌বার মারা গিয়াছেন। আপনকার টাকার কলস ও সোনার গহনা যা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা নিয়া যাবেন। লোক সাথে আনিবেন। বাবার মরণ কালের আজ্ঞা, আপনকার ধন আপনাকে দিতে। পত্র পাঠ আসিতে অন্যথা করিবেন না। বাবা মরণকালে কলসের টাকা ঢালিয়া গণিয়া পাচ জনের সাক্ষাতে দেখিয়া ছিলেন, তাতে ষোল হাজার সাত শ বাইশ টাকা সওয়া সাত আনা আছে।"

সেবক শ্রীকুঞ্জলাল মণ্ডল।

গাতি খালি।

হারাধন পত্র পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। মনে ভাবিল ঠাকুরের এত টাকা—সঙ্গে যাইলে অবশ্য কিছু লাভ হইতে পারে। হারাধন সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। স্ত্রীও সঙ্গে চলিল। তখন তীর্থ-পর্য্যটনে তাহার মন ব্যাকুল হইল। একদিন পরে কালীনগরে আসিল। সেখানে গণেশ বাবুর বাসায় অতিথি হইল। গণেশবাবু পরম ভাগবত, পরম ভক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাশয়।

সন্ধ্যার পরে গণেশবাবু ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" গণেশবাবু ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন— "বড় ছেলেটীকে ত আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তার নাম ছিল সুকুমার, আজ আমার বয়স বাহান্ন বৎসর, আমার বয়স যখন পঁচিশ, তখন সে জন্মে। আজ সাতাশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহা কিছু রোজগার করিয়াছি সমস্ত তাহার

পাছে ব্যয় করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া ছিলাম, সে এম্‌-এ, বি-এল হইয়াছিল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ দিয়া ছিলাম। তে-বাড়ীয়ার রায় বাহাদুর বিশনবাবুর কন্যার সঙ্গে। বিশনবাবুরও মাত্র এক কন্যা। কন্যাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালীক, তিনিও কন্যাগত প্রাণ। খুব আদরের কন্যার সঙ্গে আদরের ছেলের বিবাহ দিয়াছিলাম। এই গ্রামে যত ভদ্রলোক সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, এমন বিবাহ অতি অল্পই হয়। যেমন ছেলে তেমন রূপগুণময়ী মেয়ে। সুকুমারের কপাল ভাল, তাই এমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী সরস্বতীর মত গুণবতী স্ত্রী লাভ করিল। তে-বাড়ীয়ার লোকেরাও বলিতে লাগিল, বিশনবাবুর কন্যার খুব কপাল, তাই এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পরম সুন্দর বরের হাতে পড়িল। এই রূপে ত বিবাহ হইল! আমি সস্ত্রীক আজ এক বৎসর পরমানন্দেই ছিলাম। সুকুমারের চাকুরি হইলে আর চাকুরি করিব না, ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করিব এইরূপই মনস্থ করিয়াছিলাম।

সে এম-এ, বি-এল হইলেও ওকালতি করিল না। তারপরে সে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইল। দুই শত টাকা মাহিনা। আমি সহরের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব লইয়া রায় বাহাদুর বিশনবাবুকে আনিয়া খুব এক ভোজনোৎসব করিলাম। তাহাতেও প্রায় তিনশত টাকা খরচ হইল। ভাবিলাম ভগবানের আশীর্ব্বাদ—এত দিনে সংসার-গারদে মুক্তি পাইলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া একবার শ্রীভগবানের স্মরণ মননে উপবেশন করিব। কিন্তু পনের দিন চাকুরি করিবার পরই সে তিন দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করিয়াছে। আমার আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মায়া-মোহে এত কাল নাচিয়া ছিলাম, তাহার কুজ্ঝটীকা অপসারিত হইয়াছে। সংসারাভিনয়ের এক অঙ্কে যবনিকা পতিত হইয়াছে।"

ঠাকুর বলিলেন—তাইত হারাধনের মুর্খ অপদার্থ ছেলের মরণে স্বামী

স্ত্রী আজ প্রায় দুবৎসর শোকে দুঃখে মৃতপ্রায় আছে। আর তুমি এমন বিশ্ববিজয়ী গুণবান পুত্রের শোকে ত আত্মহারা হইবেই!

গণেশবাবু—না প্রভু, আত্মহারা হইব কেন? ভুল বুঝিয়া ছিলাম, তাহার সংশোধন হইল। পথ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার পথে আসিলাম। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইল। আমি আমার রব সর্ব্বদা ছিল, তা৺ার উৎপাত গেল। স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম ঘুম ভাঙ্গিল, এখন বেশ আছি।

হারাধন ও তাহার পত্নী বসিয়া সব শুনিল। তাহাদের মনের ক্ষোভ কতক মিটিয়া গেল। আবার সকলে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে তেলিহাটী উপস্থিত হইলেন, চন্দ্রবাবুর বাড়ী উঠিলেন। চন্দ্রবাবুও ঠাকুরের একজন শিষ্য।

সন্ধ্যার পরে চন্দ্রবাবু এবং অন্যান্য সকলে ঠাকুরের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" চন্দ্রবাবু বলিলেন; "প্রভো! তা আর কি বলিব। কোন সন্তানাদি ছিল না, ভালই ছিলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে এক কন্যা হইল। আপনিই তার নাম সতী রাখিয়া গেলেন। সতীর বয়স ক্রমে তের বৎসর হইলে মোহনপুরের জমিদার কেদারবাবু নিজে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতি তখন বি এল পাশ করিয়াছে। বয়স মাত্র একুশ বৎসর। দেখিতে রাজপুত্রের মত। যেমন বড়মানুষের ছেলে, তেমন বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত, তেমন নম্র। তাহার স্বভাবে বিলাসিতার লেশ মাত্র ছিল না।

কেদার বাবু সতীকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। পাঁচখান মোহর আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমিও দেখিলাম এমন সংসারে, এমন ছেলের সঙ্গে সতীর বিবাহ শ্লাঘনীয়। গত বৈশাখ মাসে খুব ধুমধাম করিয়া

বিবাহ দিলাম। জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যোতির জ্বর হইল। কলিকাতার রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন চিকিৎসা করিলেন। পনের কুড়ি দিনের মধ্যে রোগ কঠিন হইল। শেষে সকলের পরামর্শে প্রথম এ্যাস সাহেব তারপরে বার্ড সাহেবকে দেখান হইল। রোগ আর হটিল না। গত আষাঢ় মাসে জ্যোতি আমাদের মায়ামমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তার নিত্য ধামে চলিয়া গেল। তার শোকে কেদার বাবুর স্ত্রী একেবারে উন্মাদিনী; কেদার বাবু শোক সংবরণে অসমর্থ হইয়া দিন রাত মদ খাইয়া মাতাল। আর আমরা স্ত্রীপুরুষে জীবন্মৃত। সতী যখন সম্মুখে আসে তখনই এক দুর্বিসহ যাতনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। কি করি একবার মনে করিলাম বাল বিধবার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। মুখেও দু'চার কথা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বলিয়া ছিলাম, শুনিয়া সতী একদিন আমাকে বলিল, "হাঁ বাবা! তুমি ম্লেচ্ছ না যবন? তাহাদের মধ্যে বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ লইয়া—তাহাদের মধ্যে বিবাহ হাটের গরু বেচা কেনার মত। একটা কিনিল, পছন্দ না হইলে বেচিয়া আসিল। সীতা সাবিত্রীর জগতে বিবাহ যে ইহ-পরকাল লইয়া সেখানে স্ত্রী-সাধনার সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী। সেখানে স্বামী স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ। আমার এ অঙ্গের অর্দ্ধেক যে, সে আমার সঙ্গেই আছে। সুতরাং আমার আর অর্দ্ধ অঙ্গের বিনিময় কিরূপে হইবে। তবে যদি এই দেহের অর্দ্ধেক কাটিয়া লইতে পার, এবং সেই অর্দ্ধেকের বিবাহ দাও, দিতে পার। কিন্তু তার মধ্যেও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা আছে। কেবল তোমাদের ইচ্ছায় তাহা সম্ভব নহে।"

তের বৎসরের মেয়ের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমরা আমাদের ইতর সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

সত্যদর্শন

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

(৫)

আমরা এই একজন গৃহস্থের দৃষ্টান্ত হইতে আরও অনেক ভাবে সত্যগ্রহণ করিতে পারি। বাহির হইতে দৃষ্ট ওই একজন গৃহস্থের অন্তঃপুরে চলুন। সেখানে ওই আকর্ষণের কতভাব! মধুরভাবে তিনি তাঁহার গৃহিণীকে লইয়াই গৃহস্থ; তাঁহাদের উভয়ের কেহই পৃথকভাবে গৃহস্থ নহেন, উভয়ে যুগলে এক হইয়াই গৃহস্থ। আবার দেখি, তাঁহাদের উদ্বেল ভাবপ্রবাহ যেন অবসাদে শান্ত হইয়া উভয়কে একটু একটু স্বতন্ত্র করিয়াছে, এবং উভয়কে বিভিন্ন পিতৃত্ব ও মাতৃত্বভাব বিশিষ্ট করিয়াছে। সেখানে প্রকৃতি গৃহিণী আপনা হইতে কত বিভিন্ন ব্যষ্টি প্রসব করিয়াছেন, এবং মাধুর্য্যহীন কেবল বাৎসল্যে মণ্ডিত হইয়া সেই প্রসূত বহু ব্যষ্টিকে পালন করিতেছেন। কখন বা সখ্যভাবে সন্তানেরই সহ হাস্যপরিহাস করিতেছেন, কখন সন্তানেরই সেবিকারূপে দাস্যে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন পানীয় যোগাইতেছেন, শ্রান্ত সন্তানকে বীজনও করিতেছেন, আবার কখনও বাৎসল্যে সন্তানের আশ্রয় হইয়া—তাহার সকল ভার লইয়াছেন, তাহার চোখের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন, কখনও বা তাড়ন-ভর্ৎসনও করিতেছেন! এ সংসারে পুরুষ কর্ত্তা হইয়াও গৃহকর্ম্মে নিষ্ক্রিয়, শুধু গৃহিণীদত্ত কর্ত্তৃত্ব লইয়াও গৃহমধ্যে মাত্র সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব গৃহিণীর ভিতর দিয়াই পরিস্ফুট! গৃহিণী তাঁহাকে কর্ত্তা বলেন,

তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য লইয়া গৃহস্থিত পরিজনগণকে রক্ষা করেন, তাই তিনি কর্ত্তা ও রক্ষক, নতুবা পরিজনবর্গ তাঁহার কোন কার্য্যেই—কর্তৃত্ব দেখিতে পায় না, বরং দেখে তিনিও তাহাদেরই মত গৃহিণীর নিকট অন্নপ্রার্থী। যতকিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গৃহিণীরই ভাণ্ডারে। আর গৃহিণী কি করিতেছেন? পুত্রকে ভাবপুষ্ট বা যুবক দেখিয়া তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে একটি স্বতন্ত্র গৃহস্থরূপে গড়িতেছেন, কন্যাকেও বিবাহ দিয়া অন্যত্র একটি স্বতন্ত্র গৃহস্থ গড়িবার সহায়তা করিতেছেন। প্রকৃতিই এ বিশ্বে গৃহিণী, এইরূপে তিনি এক গৃহস্থ হইতে বহু গৃহস্থ গড়িতেছেন! পুরুষ কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্রীর অধীন—মহামায়ার অধীন,—তাঁহার কর্ত্তৃত্ব আর তাঁতে নাই! তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্নের জন্যও তাঁহাকে কর্ত্রীর নিকট প্রার্থনা করিতে হয়! ইহাই মহামায়ার খেলা! ইহাই বহির্মুখী কেন্দ্রের বিশ্বলীলা!

সকল অন্তঃপুরেই কিন্তু এই বহির্মুখী বিশ্বলীলার বিকাশ নাই। সকল গাছেই ফল ও বীজ জন্মেনা, ফুল পর্য্যন্তই কোন কোন গাছের বিকাশের সীমা দেখা যায়। পাঠক, চলুন ওই আর একজন গৃহস্থের অন্তঃপুরে যাই। এখানেও গৃহস্থ যুগলে, কিন্তু পিতৃত্ব-মাতৃত্ব বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন হইয়া নহে! এখানেও মধুর ভাব, কিন্তু সে ভাবে অবসাদ নাই! এ মাধুর্য্যের ভিতর দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের অভাব নাই বলিয়া বুঝি এ যুগলের বহু হইয়া ওই সকল আস্বাদনাকাঙ্ক্ষাও জাগেনাই! এখানে শুধুই ভাবের প্রবাহ বহিতেছে! এখানে গৃহিণী কত ভাবে গৃহীকে সেবা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, তিনি কখনও দাসী, কখনও সখী, কখনও বা বাৎসল্যময়ী ভর্ত্রী বা পালিকা, আবার কখনও উভয়ে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়েই একভাবে মধুরে। গৃহীও কখন সেবকরূপে, কখন সখারূপে, কখনও বা ভর্ত্তা বা পালকরূপে, আবার কখনও বা

পার্থক্যবিহীন মধুর। যদি আকার সাদৃশ্যে বিচার না করিয়া শুধু ভাবসাদৃশ্যে বিচার করা যায়, তবে এই যুগলের কে কর্ত্তা কে কর্ত্ত, কে পুরুষ কে প্রকৃতি,—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। উভয়েই উভয়ের ভাবে বিভোর। যদি অপর কেহ তাঁহাদের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত একবার পরিচিত হ'ন, অমনি তিনি তাঁহাদের গৃহস্থালীরই একজন হইয়া পড়েন। এমনি কত অপরজন,—যাঁহাদের বাহিরে পৃথক পৃথক গৃহস্থালী থাকিলেও, তাঁহারা এ অন্তঃপুরেরও পরিজন; যেন এ অন্তঃপুরে বহুকে আনিয়া একত্র করা হইতেছে, কিন্তু এখান হইতে আর বহু গড়া হইতেছে না। এ গৃহস্থালীর কার্য্যভার সকলেরই, আবার প্রত্যেকেই নির্লিপ্ত। তাই কখন এ গৃহের ভাণ্ডার কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। পাঠক, আমি এমন ভাষা জানিনা যদ্বারা এই অন্তঃপুরের সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারি। আপনার আশেপাশে যদি এমন কোন গৃহস্থ দেখিতে পান, তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের অন্তঃপুর দর্শন করিবেন। দেখিবেন সে গৃহস্থালীর শোভা শুধু ভাব বিকীর্ণ করিয়াই কালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু সে ভাব চিরকাল বিশ্বে বর্ত্তমান থাকে; ভবিষ্যতে কত গৃহস্থ সেই ভাব পাইয়া ধন্য হয়। যে গাছের পুষ্পশোভা পর্য্যন্তই বিকাশের সীমা তাহার ফুলের গন্ধ বড় মৃদু ও মধুর; তাহার গন্ধ বাতাসে মিশাইয়া থাকে। এইপ্রকার গৃহস্থের জীবন ভাবরূপে, এইপ্রকার গাছের জীবনও গন্ধ-রূপে পরিণত হইয়া অনন্ত সত্যের অনন্তভাবে সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকে।

গৃহস্থের পূর্ব্বোক্ত দুই অন্তঃপুরে এক সত্য দুই ভাবে বিকশিত; বহির্মুখীভাব ও অন্তর্মুখীভাব; বিকার ও পরিণাম। সত্যের এই দুই ভাবই বিশ্বে নিয়ত বর্ত্তমান। বহির্মুখীভাবে পুরুষ কখন মহামায়া প্রকৃতির পার্শ্বে কখন বা পদতলে তদধীন হইয়া বর্ত্তমান! অন্তর্মুখী-

ভাবে যুগলে নিত্যানন্দময়, সচ্চিদানন্দময়;—উভয়েই উভয়ের অধীন এবং উভয়ে মিলিয়া স্বাধীন! এই দুই দল,—বীজমধ্যস্থ দল বা দাইল, যাহা অঙ্কুরোদ্গমকালে উহার প্রকৃত দুই পত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে,—বিষয় ও আশ্রয়, সত্ত্বা ও তাহার প্রকাশ বা মূর্ত্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিয়াই এক সত্যের বর্ত্তমানতা সম্ভব করে, এক বৃক্ষের প্রকাশ সম্ভব করে। ইঁহারা এক রসনদীর দুই কূল রূপে বর্ত্তমান হইয়া উহার প্রবাহ বহিতেছে! মূল যুগল হইতে এই রসপ্রবাহে উৎস উঠিতেছে, বৈচিত্রময় বিশ্বে বহু বিচিত্র প্রবাহের মধ্য দিয়া বহির্মুখে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার একই সঙ্গে কত যুগলের মধ্যদিয়া অন্তর্মুখে প্রবাহিত হইয়া মূল যুগলে যাইয়া উপনীত হইতেছে! সেই রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ" —সচ্চিদানন্দের রসলীলার প্রকাশই বিশ্ব! এ রসলীলার বিরাম নাই!

ভজন ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ সম্বন্ধে নিষ্ঠালাভ ঘটলে বিক্ষিপ্ত মানবমন একনিষ্ঠ হইয়া বিশেষসম্বন্ধে রুচিসম্পন্ন বা তদভিমুখী বা অন্তঃমুখী হয়, এবং আপনাতে আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। এই আকর্ষণে পড়িলেই মানবের ভাবনেত্র বা অন্তঃদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন সে এই বিশাল বিশ্বময় ভাবের খেলাই দেখিতে থাকে, এবং ভাবনিধির অনন্তভাবে প্রভাবিত এই বিশ্বলীলায় লীলার সহায়ক বা সাথীরূপে আপনাকে বোধ করিয়া লীলাতেই লীলাময়কে এবং বিশ্বকেও পাইয়া থাকেন। এই পাওয়াই সম্পূর্ণ হওয়া, অভাবমুক্ত হওয়া। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকেরা ভাবনেত্রে বা অন্তঃদৃষ্টিতে এই রসলীলা দর্শন করিয়া উহার প্রকাশের যে চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, আসুন পাঠক, আমরা একবার সেই চিত্রখানি দেখি। আমাদের অবশ্যই কামনাকলুষিত চিত্তে দর্শন হইবে কিন্তু রসতো কামনা কলুষিত নহে, উহা চিরপবিত্র, এই বোধস্বরূপ

শ্রদ্ধা থাকিলে, একটু আভাস—একটু পরিস্ফুট পরোক্ষজ্ঞান ত হইবে, উহাই লাভ।

ইতঃপূর্ব্বেই আমরা রসের দুইটি প্রবাহ দেখিলাম, বহিঃমুখ প্রবাহ ও অন্তঃমুখ প্রবাহ, বা বিপ্রলম্ভ ও মিলন। এই প্রবাহে দুই কুলের মধ্য দিয়াই,—প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যদিয়াই,—আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্য দিয়াই,—প্রিয়া ও প্রিয়ের মধ্যদিয়াই প্রবাহিত হইতেছে! প্রিয়ত্বই রস, যাহা দুইকুলের সংযোগ সাধন করিয়া রহিয়াছে। জগতে আমরা প্রিয় ও প্রিয়া দেখি, কিন্তু উহা যেন অসম্পূর্ণ। জগতে যত অভাব আছে সকলগুলিকে একত্র করিয়া তদ্বারা যদি কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত করা যায় অথবা যে মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া মানবের সকল প্রার্থনীয় বা কাম্যবস্তু বর্ত্তমান হয়, তাহাই সম্পূর্ণ প্রিয়, এবং প্রিয়ের সকল আকর্ষণ যাহাতে বর্ত্তমান হয়, তাহাই প্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রিয়া। প্রিয়া না হইলে প্রিয়কে প্রিয়বোধ করা যায় না; তাঁহার সকল আকর্ষণকে আশ্রিত করিতে না পারিলে—প্রকৃতিস্থ হইতে না পারিলে—রসোপলব্ধি করা অসম্ভব। অপ্রকৃতিস্থ জনের রসোপলব্ধি হয় না। সুতরাং আমাদিগকেও প্রকৃতির মধ্য দিয়াই রসচিত্র দর্শন করিতে হইবে।

বিপ্রলম্ভ বা বিরহরসের চতুর্ব্বিধ প্রকাশ দৃষ্ট হয়, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। মিলনরসের ও বিরহের প্রকাশের পরম্পরাক্রমে চতুর্ব্বিধ প্রকাশ হইয়া থাকে, যথা,—সংক্ষিপ্ত মিলন, সংকীর্ণমিলন, সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ মিলন এবং সমৃদ্ধিমান মিলন।

ক্রমশঃ

নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

"ভক্তির্ভবতু সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২[illegible]শ বর্ষ, [illegible] সংখ্যা,
শ্রাবণ ১৩৩৫

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতিরত্ন

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া।
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা
নমুনা প্রতি খণ্ড ৶০ তিন আনা, ভিঃ পিতে ১৵০ আনা

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী" প্রেস হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৬শ বর্ষ } ভক্তি { শ্রাবণ
১২শ সংখ্যা } { ১৩৩৫

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

—*—

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

নিবেদন

মুক্তি চাহিনা আমি,—
ভক্তি থাকুক্ চরণে তোমার,
হে মোর জীবনস্বামি!
দীন-দরিদ্র, অনাথ-আতুর,
কাঁদে যারা নিশিদিন,—
ঘৃণ্য যাহারা, পতিত যাঁহারা,
সমাজে যাহারা হীন;—
তা'রা প'ড়ে রবে, কাঁদিবে নিয়ত,
পাইবে না তব নাম;
আমি কি শুধুই তব নাম গেয়ে,
পূরাব মনস্কাম?

তা'রা প'ড়ে রবে, কেমনে আমি গো,
লইব নিজের মুক্তি ?
সে মুক্তি চাহিনা ; থাকুক্ আমার,
তোমার চরণে ভক্তি ।
তাই ল'য়ে আমি, তব নাম গাহি,
গাহিতে শিখাই সবে ;
দুঃখীর সনে কাঁদি আমি ওগো
চিরদিন এই ভবে ।
মোর যত 'ভাল',— তোমারি সে দেওয়া,
তোমারেই ফিরে দিব ;
'মন্দ' আছে যত, আমারি সেগুলি,
সেগুলি আমি-ই নিব ।
দুঃখীর দুঃখ, আর্ত্তের ব্যথা,
সেগুলি আমারে দাও ;
তা'র বিনিময়ে, তা'দের হৃদয়ে,
শান্তি ঢালিয়া দাও ।
ব্যথিতের ব্যথা দাও মোরে,—আর
বহিবারে দাও শক্তি ;
আর যেন মোর হৃদয়েতে থাকে, —
তোমাতে অচলা ভক্তি ।
আমারে দুঃখ দিয়ে যেন ওগো,
জুড়ায় দুঃখীজন ;
সুখ নিয়ে মোর, দাও মোরে দুঃখ,
এই মোর নিবেদন ॥

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবস্থা

(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত।)

আজকাল এই যে নানাদিক হইতে, নানাপ্রকারে, নানাজনের দ্বারা ভুবন-মঙ্গল হরিনামের পুণ্য-প্রবাহ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া জন সমাজে প্রবাহিত হইতেছে, এই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অনেকটা বিদ্বেষিতার রাহু গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নানা সমাজে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইতেছে, ইহার কারণ কি? নিদান কি? এই বিষয় তেমন করিয়া কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। আমার মনে হয় ইহার কারণ, ইহার নিদান যদি জানিতে হয় তবে মূল খুঁজিতে হইবে। যখন ভারতের আপামর সাধারণে বড় সুদিন সমুদিত হইতে দেখিয়াছিল, সেদিনের নবোদিত দিনমণি আমাদের দ্বিজমণি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর। গুণমণি গোরাশশীর বিমল কিরণজালে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার ভক্ত-কমল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মধুগন্ধে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ঝাকে ঝাকে মধুকর মিলিত হইয়া মধুর ঝঙ্কারে কর্ণ রসায়ন করিয়া ছিল। একথা সত্য কি না, বৈষ্ণব পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঠক মাত্রেই তাহা বলিতে পারেন।

কেহ হয়ত ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, আবার কেহ হয়ত বলিবেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি এতই অপ্রাচীন যে, সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না?" উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, ছিল, জগতে নূতন কিছুই হয় না। এককালে যাহা নষ্ট হইয়া যায়, কালে তাহাই পুনঃ স্থাপিত হয় মাত্র। ভক্তিযোগ ছিল কিন্তু সে একপ্রকারের আর এ এক প্রকারের। এ ভক্তি শাস্ত্রে ছিল কিন্তু আচরণে ছিল না, যাহাও আচরণে ছিল তাহাও

জ্ঞান কর্ম্মের আবরণে এমন আবৃত ছিল যে, সহজে তাহা কেহ ধরিতে পারিত না। এক্ষণে যেন সে আবরণ পরিমুক্ত হইল।

সে কালের বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেন এ কালের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলিকা বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে এখন সেই কলিকা প্রস্ফুটিত, মধুভরে ঢল ঢলাইত, যেন অনুকূল অনিল প্রবাহে উদ্দাম নৃত্যমান! সে কালের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যেন বালিকা, পিতামাতার শাসনাধীনা, আর এ কালে যেন সেই বালিকা নবযৌবনারম্ভে নবপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উদ্দাম প্রেমতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া নিজ প্রাণকান্তের কমনীয় কণ্ঠে কান্তিময়ী রাগমালা পরাইতে ছুটিয়াছে। সে কালের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যেন নিভৃতে নীরবে লুকাইয়া লুকাইয়া কাত্যায়নীর ব্রত করিতেছিল, একালে যেন সেই মনচোরার মুরলীরবের মোহন আকর্ষণে জ্ঞান ছাড়িয়া, কর্ম্মফেলিয়া, দেহ গেহ কুল ধর্ম্ম লজ্জা ধৈর্য্য আত্মীয় স্বজন ভুলিয়া নিজ প্রাণকান্তকে দেখিতে পাগলিনীরন্যায় যমুনা পুলীনে ছুটিয়াছে। তাহা হইলেই পাঠকগণ, বুঝিয়া দেখুন সে কালে আর এ কালে কত পার্থক্য।

এত পার্থক্য কেন জানেন? সেকালের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কেবল শাস্ত্রের উপদেশে চলিত আর এ কালের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম স্বয়ং তিনি প্রচার করিয়াছেন। শুধু প্রচার নয়, স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই জন্যই ইহার এত গরিমা। সুতরাং নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন, আমার ন্যায় কঠিন হৃদয় বিশিষ্ট পাঠক ভিন্ন কে অস্বীকার করিবেন যে, যেদিন এই শুভদিনের প্রথম উন্মেষ, সে দিনের উজ্জ্বল দিনমণি অশেষ গুণমণি আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নহে।

ঘোর কলির অন্ধকারে জীব সুপথ ভুলিয়া কুপথে চলিয়াছিল, সেই সুর্য্যের বিমল কিরণে নিজপথ দেখিতে পাইল, আপনার অমূল্যধন হারাইয়া কাঙ্গালী হইয়াছিল এই আলোকে সে সেই হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়া ধন্য হইল, অপার আনন্দে আত্মহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

বলিতে গেলে এক কথায় বলিতে হয় যে, ভারতে সেই একটী দিনের মত দিন হইয়াছিল। আর হয় নাই—হবে না।

লীলাময়ের ইচ্ছায় আবার যেদিন সেই দিনমণি অস্তগমন করিয়াছেন ভারতেও সেই ক্ষণে কুহু রজনীর সমাগম হইয়াছে। তবে যতক্ষণ সেই দিনমণির সন্ধ্যারুণরাগ বিভাষিত ছিল ততদিন সেই কমল বনের শোভা নষ্ট হয় নাই, তার পর যখন তাহাও গেল তখন কমল বনের শোভা কমিল, সুগন্ধের আকর্ষণে আগত অলিকুল কোথায় লুকাইল, ভ্রমর ঝঙ্কৃত কমল বনে ভেককুলের "মক্ মক্" রব উঠিল। ভারতে ঘোর নিশীথিনীর মসীনিন্দিত তমোরাশী আসিয়া সকল শোভা ডুবাইয়া দিল।

তাহা হইলে একথা বেশ বুঝাযায় যে, যাহার প্রভাবে ও অভাবে এত পরিবর্ত্তন সেই দুর্দ্দিনদিনমণি শ্রীগৌরচন্দ্রই এই বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের নিদান। জীবের দুর্ভাগ্য বসেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক এত দিন তাঁহাকে ভুলিয়া ছিল, এখন সমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই আবার তাঁহার পবিত্র আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে চারিদিকে সুপবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহাও যে সেই কলি-কলুষহারী—দিনমণি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের তত্ত্বালোচনার ফল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই—থাকিতেও পারে না।

সমালোচক তুমি হয় ত এ কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, কিন্তু বিচলিত না হইয়া স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ১৪০৭ শকের পর-বর্ত্তী সামাজিক অবস্থা যথার্থই জগতের এক স্মরণীয় কিনা? এমন বিশ্ব প্রেমিকতা যে ভারতে আর কখনও উদিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কেহ বলিতে পারিবে না। শুধু ভারত নয়, তোমার অভিজ্ঞতা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর যতটুকু স্থানের বিবরণ জানিতে পারিয়াছ, তাহার মধ্যে কোন স্থানে, কোন কালে এরূপ হইয়াছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দিতে পারিবে

কি ? গৌরাঙ্গ সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে যেভাব হইয়াছে তাহা আর কখন হয় নাই, হইতেছে না, হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

সমগ্র গৌড়মণ্ডলের রাজা মহারাজা, রায় রাওল প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবর্গ রাজ-মন্ত্রী, রাজ-প্রতিনিধি এবং যাবতীয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ; যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িগণ ; বৈদিক, দার্শনিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত-মণ্ডলী, স্ত্রীলোক, বালক, জড় অন্ধ, খঞ্জ এমন কি নীচমূর্খ যবন, চণ্ডাল, চেরি, মদ্যপ, লম্পট, নরঘাতক প্রভৃতি। সমাজের উচ্চতম উচ্চ হইতে নীচতম নীচ পর্য্যন্ত একসূত্রে গাঁথা,এক অপূর্ব্ব বস্তুর প্রভায় প্রতিভাত, আহা সে কি অপূর্ব্ব ! কি অলৌকিক !! কি পবিত্র দৃশ্য !!! সকল হৃদয়েই বিশ্ব-প্রেমিকতার উজ্জ্বল প্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত,সকল হৃদয়েই সমান ঈশ-প্রেম সকল দেহেই সমান বৈষ্ণবীয় লক্ষণ, সমান সাত্ত্বিক বিকার, সকলেই যেন কি এক অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির পূততরঙ্গে নৃত্যমান। সত্য করিয়া অকপটে বল দেখি ভাই, এই গৌড়মণ্ডলে এমন সুখের দিন কি আর কখনও হইয়াছে ?

বৈষ্ণব পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহারা বৈষ্ণব জগতের পরিচয় সমধিক অবগত আছেন তাঁহারা তো জানেনেই, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা বৈষ্ণব ইতিহাস অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণব মহাত্মাগণের পরিচয় অবগত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌরাঙ্গ সমাজ কত বড় উন্নত সমাজ , কতবড় একতার উচ্চ নিদর্শন, কেমন বিশ্ব প্রেমিকতার উজ্জ্বল আদর্শ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকট কালে এই ঔজ্জ্বল্য সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল ; তৎপরে গৌর সূর্য্য অস্তমিত হইলেও তৎপ্রভা-প্রদীপ্ত সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত গৌর-সমাজ নিতান্ত মলিন হয় নাই। আচার্য্য রাধামোহন, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকটী উজ্জল নক্ষত্র সগৌরবে

গৌড়মণ্ডল আলো করিতেছিলেন। এই সকল নক্ষত্রের অস্তগমন হইলে পরই গৌড়মণ্ডলের শুভ লগ্নের অবসান ঘটে। ক্রমে দুষ্ট গ্রহ নিজ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

ক্রমশঃ

উপদেশ মালা

[শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।]

১। পৃথিবীর নশ্বর শোভায় আকৃষ্ট হইও না, এ দৃশ্যমান শোভা অপেক্ষা অনন্তগুণ শোভাময় অবিনশ্বর শোভার স্থান আছে। সময়কে অপব্যয় করিও না। বকুল ফুল সুগন্ধময়, মুক্তা গন্ধহীন ; তাই বলিয়া মুক্তা দিয়া বকুল ফুল ক্রয় করিও না, মুক্তার সৌন্দর্য্য স্থায়ী কিন্তু ঐ বকুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী।

২। চাটু বাক্যে ভুলিও না, চাটুকারের মুখ ও মন সমান নহে। তোমার যাহা আছে না আছে নিজ অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর।

৩। যাহা পাওয়া যায় না তাহার প্রয়াস করিও না। সাধ্য বিষয়ের সাধন কর, শক্তির যাহা অসাধ্য তাহা কল্পনায় আনিয়া কেবল ক্লান্ত হইবে, প্রাপ্তব্য বস্তুও হারাইবে।

৪। যশঃ অক্ষুন্ন হয় না, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। যশঃ শুনিয়া গর্ব্বিত হইও না, অনেকে তোমার নিন্দাবাদও অবশ্য করে। নিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইও না, অনেকে তোমার প্রশংসাবাদও অবশ্য করে। যশে উৎসাহ কর, নিন্দায় সংযত হও, সমাজে উচ্চাসন পাইবে।

৫। চিরদিন সমান যায় না, যখন যেমন অবস্থা আসিবে তখন সেই অবস্থার মত চলিবে। তুমি এক সময় বড় ছিলে এখন ছোট হইয়াছ, ইহা ভ্রান্তি। দেখ, বড় অবস্থাতেও তুমি যে সাড়ে তিন হাত ছিলে, ছোট অবস্থাতেও সেই ৩॥০ হাতই আছ। অতএব মানুষ ছোট বা বড় হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; যে মানুষ সেই মানুষই থাকে। মান সম্ভ্রম, গৌরব, সম্পত্তি তোমার নহে। অতএব তোমার যাহা ছিল সমস্তই আছে, মনকে অতীত স্মৃতির পথ হইতে ফিরাও, দেখিবে তুমি সুখী, দুঃখী নহ।

৬। সুখ দুঃখ স্থায়ী নহে উহাতে মুগ্ধ হইও না। শশাঙ্ক শোভিত শারদাকাশ বা ঘন-ঘটাচ্ছন্ন প্রাবিড়াকাশ দুই-ই ক্ষণস্থায়ী, শতবার দেখিয়াও কেন ভ্রান্ত হও?

৭। সু-সময়ের বন্ধুকে বিশ্বাস করিও না, ভোজের বাটিতে কখনও লোকের অভাব নাই।

৮। বিদ্যাহীন দেশে বাস করিও না, যে দেশে বিদ্যালয় নাই বালক লইয়া সেথানে বাস করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভাবী আশা শূন্য হইবে।

৯। যে কুকার্য্যে যায় সে-ই গুপ্তপথে চলে, সু সাধু কেন অপথে যাইবে? দেখ লম্পট ব্যক্তিরা বারাঙ্গনা লইয়া অন্ধকারে গুপ্ত পথে গা ঢাকিয়া চলিতেছে। আর ঐ দেখ নব-পরিণীত বর-কন্যা বাদ্য বাজাইয়া আলো জ্বালিয়া এক দোলায় আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাইতেছে।

১০। নির্ব্বোধ মনুষ্যই অহঙ্কারের দাস, বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহা হইতে পৃথক থাকে। অহঙ্কার প্রচণ্ড নৈদাঘ মধ্যাহ্ন, আর বিনয় যেন বাসন্তি বৈকাল।

১১। আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিও না, আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানও করিও না, নীরবে কর্ত্তব্যের পথে চল। উৎকৃষ্ট হইতে অনেক প্রয়োজন।

১২। যদি ভাল হইতে চাও, নিজের মন্দ গুণের নিত্য বিচার করিও। আম খাইয়া আঁটী ফেলিতে জান! আঠা বাছিয়া বেল খাইতে জান! চরিত্রের আঠা ও আঁটী ফেলিতে এত উদাসীন কেন? খাস বেলে আঠা কম, সু আম্রের আঁটী ছোট।

১৩। তোমাকে সকলেই যখন ভালবাসিবে, কেহ তোমার নিন্দা বা দ্বেষ করিবে না, তখন জানিবে তুমি কিছু ভাল হইতে পারিয়াছ।

১৪। উপকার করিয়া স্বমুখে তাহা বারম্বার বলিও না, ভস্মে ঘৃত ঢালা হইবে।

১৫। প্রশংসা শুনিবার জন্য উন্মত্ত হইও না, তোষামোদ প্রিয় হইয়া পড়িবে। তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তি শীঘ্রই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়; মস্তপায়ীর ন্যায় তাহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণীত।

১৬। সরলচিত্ত হও, বাক্যে ও কার্য্যে সদিচ্ছায় উৎসাহ দাও, সন্তোষ বাক্য বল, কিন্তু তোষামোদ কাহারও করিও না, মান হারাইবে। অলীক গুণারোপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসার নাম তোষামোদ।

১৭। চাটুকার বড়ই ছোট। স্পষ্টবাদীর প্রতি কেহ সন্তুষ্ট নহে, কিন্তু ন্যায় রাজ্যে তাহার আসন অতি উচ্চে।

১৮। কর্কশ বাক্য বলিও না। সত্য কথাও প্রিয় করিয়া কহিবে, সকল ব্যক্তিই কোমলতার পক্ষপাতী।

১৯। তোমার যাহা আছে তাহা লইয়াই সুখে থাক, প্রয়াস বৃদ্ধি ভাল নয়।

২০। লোকে যাহা বলে তাহাই ঠিক, তুমি আপনাকে যাহা ভাব তাহা ঠিক নহে।

২১। যাহার প্রতি কেহ অসন্তোষ না হয়, তাহার শীঘ্রই যশঃ বিস্তার হয়।

২২। বিনয়ী, প্রিয়বাদী হও, সকলেই বন্ধু হইবে, আর উদ্ধত হও, জগৎ বিপক্ষ হইবে।

২৩। যদি সুখের ইচ্ছা থাকে, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর। যদি সুখের সাধ থাকে আপন অবস্থায় সন্তোষ থাক। যদি সুখের প্রয়াসী হও সকলের সহিত বন্ধু ব্যবহার কর।

২৪। ধনবান হইতে চাও, উপার্জ্জনশীল ও মিতব্যয়ী হও, ফাঁটা হাঁড়িতে যতই জল ঢাল দাঁড়াইবে না।

২৫। সুখের সাধ সুখে মেটে না, আশা ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়।

২৬। যাহা করিবে অগ্রে বলিও না, কার্য্যে পরিণত কর সকলেই দেখিতে পাইবে।

২৭। যাহা করিয়াছ তাহা সকলেই দেখিয়াছে, তবে আর স্ব-মুখে তাহা বলিয়া লাভ কি ?

২৮। জগতে কীর্ত্তি রাখ, মরিলেও তাহা মরিবে না।

২৯। কীর্ত্তিদ্বারা পরিচিত হও, অকীর্ত্তি সহজেই হয়।

৩০। সুন্দর দেহেও ব্রণ হয়, সুযশ রক্ষায় বহু যত্ন করিবে।

৩১। দুর্ম্মুখ ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ। দুর্ব্বাক্য, দুর্ব্ব্যবহার, দুরভিসন্ধি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে।

৩২। যাহার কার্য্যে হরি সন্তোষ হন, তাহার প্রতিই যথার্থ জগৎ তুষ্ট হয়। নিন্দাবাদ ও প্রশংসাবাদ, ঈশ-মন্তব্য লোক মুখে প্রকাশ পায় মাত্র।

৩৩। আপন ধর্ম্ম আপনি নষ্ট করিও না, জগতে কেহ চিরদিন থাকিবে না।

৩৪। কাহারও মনে কষ্ট দিও না, সর্ব্বদা মনে রাখিও দুর্ব্বলের নীরব বেদনা ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করে।

৩৫। শত্রুরও মনে কষ্ট দিও না, সে যদি অগ্নিতে প্রবেশ করে, তুমিও কি তাহাই করিবে? শত্রুকে যদি দণ্ড দিবার ইচ্ছা থাকে, ক্ষমা কর। তুমি যাহার অপকার নীরবে সহিবে, বজ্রনির্ঘোষে তাহার মস্তকে শত অপকার পতিত হইবে।

৩৬। সদুপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিও ফল পাইবে। সদুপদেশের মালা গাঁথিয়া গলায় পর।

বর্ষ-শেষে আমার কথা

সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ! অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের অপার করুণা-ভঙ্গীতে এক দুই করিয়া ভক্তি পত্রিকা আজ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া নিজের মহামহীয়সী শক্তিরই পরিচয় দিতে চলিয়াছেন। কত বিঘ্ন, কত ঝড় ঝাপ্টা যে এই সুদীর্ঘকাল দেবীর উপর দিয়া গিয়াছে তাহা অন্তরঙ্গ সেবকগণই জানেন। আমরা দুর্ব্বল অর্থহীন সেবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আপনাদের পাঁচজনের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়া সাধ্যমত দেবীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি। তজ্জন্য আমরাও যেমন কৃতার্থ হইয়াছি আপনারাও দেবীর আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভাদ্র মাসের শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে যে মহাপুরুষের হৃদয় নিহিত ভাব-রাশী লইয়া এই পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশ হইয়াছিল, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাপুরুষের মহানুভাব সকল তিল তিল

করিয়া প্রবন্ধাকারে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রকাশ হইতেছিল এই সুদীর্ঘকাল সে উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতটুকু সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। আমরা মহাপুরুষের আদেশ পালন করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

ভক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করাই যে এই ভক্তি পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য তাহা বোধহয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। কিন্তু এই তত্ত্বালোচনা একমাত্র ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে হইবার উপায় নাই। শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা সগুণ পঞ্চভূতাদি প্রপঞ্চের ভিতরে দণ্ডায়মান জীব কি করিয়া ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার অধিকারী হইবে?

তাঁহার লীলা-গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে প্রাণে শক্তি জাগিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয় পরিখা ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, আমরাও সেই আশায় তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আনন্দ লাভের অনুকূল হইবে বলিয়া যেন তেন প্রকারে ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। শুভ কার্য্যে বহু বাধা বিঘ্ন থাকিলেও যতটুকু কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহাই যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইবার ভক্তির প্রবন্ধের কথা কিছু বলিব। কেহ কেহ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, ভক্তির লেখা আরও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ হওয়া দরকার। একথার উত্তরে এইমাত্র বলিব যে, বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব, বড় বড় ছন্দ সম্পন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ অনেক পত্রিকায় হইতেছে—আমাদের ভক্তি সে জন্য নয়; পবিত্র মনে প্রেমময়কে ডাকিতে প্রাণের যে ভাব, যে উচ্ছ্বাস আইসে তাহা সরল ভাবে লিখিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রকাশ করাই ভক্তির ব্রত। তাহাতে যদি কবিত্ব হয় হউক, তাহাতে যদি গাম্ভীর্য্য থাকে থাকুক, নতুবা অপরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বড় কঠিন সমাস যুক্ত কথা দিয়া কবিত্বের পরিচয়

দিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ভক্তির কলেবর বর্দ্ধিত করিতে চাই না। সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস পাঠে যেমন প্রাণে শান্তি হয়, তেমনটী বুঝি আর কিছুতেই হয় না। যাঁহার সকলই অনন্ত, তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে আমাদের কি ভাষা, কি জ্ঞান, কি বিচার শক্তি আছে? ভাবগ্রাহী প্রেমময়কে প্রাণের ভাব জানানই যথেষ্ঠ এবং উহাই তাহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাই আমরা ভক্তগণের প্রাণের উচ্ছ্বাস যেমন তেমনই হউক না কেন প্রকাশ করি। ভক্তির লেখকগণের নিকটও তাই আমাদের প্রার্থনা, সরল প্রাণে প্রাণের কথা সরলভাবে আলোচনা করুন, যাহাতে ভাবের মাত্রা দেশ দেশান্তরে জন সাধারণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া নিজেরও আনন্দ লাভ হউক সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সুখী করিতে সমর্থ হউক।

যাঁহার অপার কৃপায় আজ ভক্তির ছাব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইল, তাঁহারই কৃপা স্মরণ করিয়া আগামী ভাদ্র মাস হইতে সাতাইশ বৎসর আরম্ভ হইবে। আশাকরি যেমন স্নেহের দৃষ্টিতে ভক্তিকে এতদিন দেখিয়া আসিতেছেন, আমাদের শত ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও তাহা ভুলিয়া ভক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কেহ কৃপণ হইবেন না। ইহাই ভক্তির বর্ষশেষে আমার বিনীত নিবেদন।

দীন—সম্পাদক

ভক্তির প্রথম বর্ষ হইতে অনেকে চাহিতেছেন কিন্তু আমাদের নিকট ১৪শ বর্ষ হইতে আছে। মূল্য প্রতি বর্ষ ডাক মাশুল সহ ১৵০ এক টাকা তিন আনা মাত্র। একত্রে সকলগুলি লইলে ১৲ এক টাকা হিসাবে দেওয়া হয়'　　(ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ)

গীতি-নাট্যে ভক্তির উপকরণ

"ভক্তি" পত্রিকার বিগত "বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ" সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "স্মরণ-মঙ্গল শ্রীহরিনাম" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে আমি লিখিয়াছিলাম "অস্মদ্দেশে কথকতা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণও ভক্তি সাধনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।" আমি জানি সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের রচিত "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দর্শন করিয়া কোন এক মহাত্মার হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি সংসারের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার নিজ মুখেই আমি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমাদের দেশে "যাত্রা-গান" আজ কাল অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালে "পাঁচালী" ও "যাত্রার" গান শুনিয়া অনেকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। অধুনাও কোন কোন গীতিনাট্যে ভক্তির উপকরণ অন্বেষণ করিলে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদিচ্ছায় অধুনা বহু গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। সকলগুলি অবশ্য চিত্তাকর্ষক বা সুখ পাঠ্য নহে। তথাপি সেগুলি পাঠ করিলে অথবা তাহাদের অভিনয় দর্শন করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। আমি অদ্য দুই খানি গীতিনাট্য হইতে নিম্নে ভক্তিরসাত্মক দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহোদয়গণের চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিতেছি। ভবিষ্যতে "পাঁচালী" এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও ভক্তি-রসের উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্য কোনও ভক্তের একটী আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করুন :—

"দেখা দাও।—পূর্ণিমার সান্ধ্যগগনে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রবিকাশের মত, মৃদুমন্দসঞ্চারী নৈশপবনবক্ষে দূরাগত মুরলীধ্বনির ধীর আন্দোলনের মত, দিনমনিদর্শনাকাঙ্ক্ষিনী কমলিনীর উষাকালীন অবগুণ্ঠন উন্মোচনের মত, পূর্ণভাবময়, পূর্ণপ্রেমময় সচ্চিদানন্দ! এই সংসার তাপ তাপিত দীনাত্মার হৃদয় খানিতে আসিয়া দেখা দাও। তুমি যে এ দাসকে উন্মাদগ্রস্ত করে'ছ হরি! একদিন তন্ময়চিত্তে তোমার নবনীরদ বিনিন্দিত শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারী মনোমোহন মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হ'য়ে ছিলাম, তাই স্বপ্নযোগে সেই ধ্যানের ছবি, সেই ঢল ঢল স্বর্গীয় লাবণ্যমাখা প্রেমময় রূপ আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করে' ছিলে। সেই অবধি আমাকে যে পাগল ক'রেছ হরি। তোমায় দেখ্‌বো বড় বাসনা—বড় বলবতী ইচ্ছা আবার সেই স্বপ্নের ছবি একবার জাগ্রৎ অবস্থায় দেখ্‌বো। দেখ্‌ছি বটে, বিশ্ব তোমার স্বরূপ বিকাশ, কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমি, তোমার এ বিরাট মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারি না। হে হরি! তাই কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন, সত্য সনাতন ব্রহ্মণ্যদেব! আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু ধরে, ঠিক্ ততটুকু হ'য়ে সেই স্বপ্নের মোহন মুর্ত্তিখানির মত একবার এসে দেখা দাও দয়াময়!

নাথ! জ্ঞানীরা বলেন তুমি নিরাকার, কিন্তু অজ্ঞান আমি, আমি ত তোমাকে নিরাকার দেখি না।

প্রবাহিনীর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস যাঁর করুণার অনন্ত প্রবাহ, বিজলী বিকাশে যাঁর অঙ্গজ্যোতি প্রকটিত, নীলাকাশে পূর্ণ সমুদিত সুধাংশু, সরসিবক্ষে নব-বিকশিত সৌরভ-পূরিত শতদল, দিগন্ত-প্রসারী নীলাম্বুরাশির অনন্ত বিস্তৃতি, গগনমণ্ডল স্পর্শোন্মুখ তুঙ্গ ভূধর-শৃঙ্গ যাঁর এক একটী অঙ্গ শোভামাত্র, বাসন্তী প্রভাতে কোকিলের কলকণ্ঠ, গুণ গুণ রবকারী অলির মৃদুল ঝঙ্কার, পাপিয়ার সুমধুর তান, ভক্তের

ভক্তিপূর্ণ গান যাঁর মহিমা কীর্ত্তন মাত্র, বৃক্ষ লতা গুল্মাদির হরিদ্বর্ণ যাঁর অনন্ত রূপের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব মাত্র, বায়ু যার নিশ্বাস, চন্দ্র-সূর্য্য যার চক্ষু, কে তাঁরে নিরাকার বলে? না—না তুমি নিরাকার নও, তুমি সাকার, তুমি অনন্ত—সামান্য মানব বুদ্ধির অতীত, নিত্য চৈতন্যময়। তুমি বিরাট, তুমি মহান্, তুমি অমেয়, তুমি অচিন্ত্য, তুমি অবাঙ্মনসোগোচর।"

বালকরূপী ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনে আর একটী ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাস শ্রবণ করুন—

"কে এ বালক! বালকের করস্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল! মূহূর্ত্তের মধ্যে আমার দগ্ধ-হৃদয়ে যেন শান্তির অমিয়-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হ'য়ে গেল! সব শান্তিময়! সব শান্তিময়!! সব শীতল! সব শীতল!! আ মরি মরি! এ কোন্ দেশ রে! ব্রহ্মাণ্ডের যত সুখ, যত শান্তি, যত যত পবিত্রতা, যত সরলতা সবই এইস্থানে সমাবিষ্ট হ'য়েছে। এ আকাশে, শত শত শরতের চন্দ্র, স্নিগ্ধ—অতিস্নিগ্ধ রশ্মিধারা বর্ষণ ক'চ্ছে। ওরে সব শুভ্র! দুগ্ধফেন নিভ শুভ্র? সব শুভ্রমূর্ত্তি! আহা আহা। মন, প্রাণ, নয়ন, সব জুড়িয়ে গেল রে! সব শান্ত, স্থির, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক—কবিত্বময়, দেবত্বময়, সব সুধাময়! তরুপত্র, কুসুম স্তবক, নবদূর্ব্বাদল, প্রত্যেক বস্তু হইতে সুধাধারা বিগলিত হ'চ্চে। এ কোন্ বালক! কার হৃদয় জুড়ান ধন রে! বালকের স্পর্শ অতি শীতল, অতি কোমল, অতি মধুর। বালকের হাসিতে অমৃত, বালকের কণ্ঠস্বরে অমৃত, বালকের কথা অমৃতময়ী। কিন্তু বালক বড় চতুর! এমন কৌতুকপ্রিয়, এমন ছলনাপটু, অথচ এমন প্রেমময় বালক কে কবে দেখিয়াছ ভাই? বুঝি এই বালকের ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই অন্ধ বিল্বমঙ্গল একদিন বলিয়াছিলেন—

হস্তৌ নিক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥

কৃষ্ণ! বল পূর্ব্বক হাত দুখানি ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি এই হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবেই বুঝিব তোমার পৌরুষ বটে!"

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, বি এ।

বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে ভক্তির ২৬শ বর্ষ শেষ হইল, ভাদ্র হইতে ২৭শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। অনেকের নিকট ভক্তির বার্ষিক ভিক্ষা বাকী আছে, পুরাতন গ্রাহক সকলেই জানেন, আমরা সামর্থহীন। দেবী নিজের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন। বর্ষ শেষ হইল, দয়া করিয়া পূর্ব্বের বাকী ভিক্ষার সহিত আগামী বর্ষের ১৸৹ টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ৫ই ভাদ্রের মধ্যে টাকা বা কোন সংবাদ না পাইলে ৬ই ভাদ্র হইতে আমরা ভাদ্রমাসের পত্রিকা ভিঃ পি করিতে আরম্ভ করিব। কাহারও আপত্তি থাকিলে সত্বর জানাইবেন। পূর্ব্বে না জানাইয়া শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া ভক্তি ভাণ্ডারের ক্ষতি করিবেন না ইহাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন। বলাবাহুল্য মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইলে গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা হয়।

ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(২৭)

নিত্যানন্দ ও হরিদাস, দূরে থাকিয়া দেখিলেন সেই দুইজন মাতাল মারামারি, গালাগালি করিতেছে আর লোকে দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। নিত্যানন্দ লোকের নিকট ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা বলিল "গোসাঞি! এই দুই জন ব্রাহ্মণ, ইহাদের পিতা মাতা ভাল লোক ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে এই নদীয়াতেই ইহাদের বাস। উচ্চ বংশে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ইহাদের বংশে কোনও দোষ নাই, ইহারাই কুলাঙ্গার। চিরদিন এইরূপ পাপকর্ম্মে লিপ্ত, কোন পাপই ইহাদের বাকি নাই। নদীয়াবাসী ইহাদের দেখিয়া ভয়ে সশঙ্কিত।

সমস্ত শুনিয়া, নিতাইর কোমল চিত্ত করুণায় বিগলিত হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের উদ্ধার কামনা করিলেন। ভাবিলেন—

"এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥ চৈঃ ভাঃ

নিতাই ভাবিতেছেন, প্রভু পাতকী তারণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এমন পাতকী আর কোথায় পাইবেন? তিনি লুকাইয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। লোকে তাঁহার মনোভাব না বুঝিয়া উপহাস করে, যদি প্রভু অনুগ্রহ করিয়া এই দুই জনকে উদ্ধার করেন

তবেই জগতের লোক তাঁহার মহিমা বুঝিবে। এই দুই জনকে যদি প্রভুর বাণী শুনাইয়া আবিষ্ট করিতে পারি তবেই আমি প্রকৃত প্রভুর দাস। মদের পরিবর্ত্তে যদি ইহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মাতাল হয়, একবার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে তবেই আমার জীবের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সার্থক হয়। লোকে এখন ইহাদের ছায়া মাড়াইলেও গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হয়, যদি ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া লোকে গঙ্গাস্নানের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করে তবেই আমার চৈতন্যদাস হওয়া সার্থক হয়। ধন্য দয়াল নিতাই! পতিত জীবের দুর্গতি দূর করিবার জন্যই তোমার অবতার। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হরিদাসকে বলিলেন, হরিদাস! ইহাদের দুর্গতি দেখ, ব্রাহ্মণ হইয়া ইহাদের কি অসদাচরণ। পরকালে ইহাদিগকে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করিতে হইবে? যখন যবনগণ তোমাকে প্রহার করিয়া তোমার জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখনও তুমি তাহাদের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলে, এখন যদি তুমি মনে মনে ইহাদের শুভ কামনা কর তবেই ইহারা উদ্ধার পাইবে। তোমার সঙ্কল্প প্রভু অন্যথা করেন না, ইহা আমি ভালরূপই জানি। জগতের লোক প্রভুর প্রভাব দেখুক যে, তিনি এই দুই জনকে উদ্ধার করিলেন। পুরাণে বর্ণিত অজামিল উদ্ধারের ন্যায়, প্রভু-কর্ত্তৃক এই দুই পাপীর উদ্ধার জগতে ঘোষিত হউক। হরিদাস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ভালরূপই জানেন। তিনি নিতাইর কথা শুনিয়া স্থির বুঝিলেন এইবার দুই পাপী উদ্ধার হইল। হরিদাস তখন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, শ্রীপাদ, তোমার যাহা ইচ্ছা প্রভুরও তাহাই ইচ্ছা, আমাকে তোমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা বৃথা। আমাকে ভাঁড়ানও যা আর একটা পশুকে ভাঁড়ান ও তা। "নিতাই হাসিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হরিদাস! আমরা প্রভুর আজ্ঞা বহন করিয়া বেড়াইতেছি।

প্রভুর আদেশ সকলেই যেন শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করে। বিশেষতঃ যাহারা অধিক পাপী তাহাদের প্রতি এই আদেশ বিশেষ করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দুই জনের প্রতি বলিবার মাত্র ভার দেওয়া আছে। আমরা বলিব, যদি তাহারা নাম না লয় তখন যাহা করিবার তিনিই তাহা করিবেন। তখন নিতাই ও হরিদাস প্রভুর আজ্ঞা জানাইবার জন্য জগাই মাধাইয়ের নিকট গমন করিলেন। তাহা দেখিয়া সাধু লোকেরা নিষেধ করিল যে, ইহারা নাগাল পাইলে প্রাণে হানি করিতেও পারে। আমরা যখন ইহাদের ভয়ে দূরে দূরে থাকি তখন তোমরা কোন সাহসে নিকটে যাও ? ইহারা সন্ন্যাসী বলিয়া মানিবে না।

প্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাস লোকের নিষেধ শুনিলেন না। তাঁহারা মহাকুতুহলে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে তাহাদের নিকট গমন করিলেন। নিতাই বলিলেন "হরিদাস" চল আজ দুই ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা শুনাইয়া আসি। তাহারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি ! আমাদের আজ্ঞা পালন করিবার কথা তাহাই করিব।

উভয়ে দুই ভাইয়ের নিকট আগাইয়া গেলেন। জগাই মাধাই মদ খাইয়া উন্মত্তের মত বসিয়া আছে, নিতাই বলিলেন "তোমরা কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণকে ভজনা কর এবং ভুবন মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ নাম লও এই আমাদের ভিক্ষা। ভাই সব তোমরা কি জান না, তোমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিমাই পণ্ডিতরূপে নদীয়ায় শচীদেবীর গর্ভে জন্ম নিয়াছেন ? তোমরা সব অনাচার ছাড়িয়া তাঁহাকে ভজনা কর।" দুই ভাই মদে চুর হইয়া আপন মনে হেঁট হইয়া বসিয়াছিল। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া চোক পাকাইয়া বলিল—কি এতবড় স্পর্দ্ধা, তোমাদের প্রাণে ভয় নাই ? আমাদিগকে এত বড় কথা বলা, ধর ত ভণ্ড বেটাদের ? এই বলিয়া দুই ভাই তাঁহাদের ধরিতে ছুটিলেন, আর অমনি নিতাই ও হরিদাস ধর্ম্মনাশ

আশঙ্কায় ছুটিলেন। জগাই মাধাই দুই জনেই স্থূলকায়, থপ্ থপ্ করিয়া ছুটিতেছে। চঞ্চলের শিরোমণি নিতাই, হরিদাসের হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। পাছে থাকিয়া জগাই মাধাই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে—"থাম থাম বেটারা" আবার পিছন হইতে চেঁচাইয়া বলিতেছে—"ধরলুম ধরলুম" কিন্তু মদের ঝোঁকে তাহারা তেমন ছুটিতেও পারিতেছে না, এবং নাগালও পাইতেছে না। এই অবস্থা দেখিয়া নিতাই বলিতেছে "খুব ত বৈষ্ণব করিলাম, এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচিলে হয়।"

হরিদাস বলিলেন—ঠাকুর তোমার পাল্লায় পড়িয়া বুঝি অপমৃত্যুই হয়, এত লোক থাকিতে কিনা গেলে এই মাতাল বেটাদের কৃষ্ণ ভজা করিতে? শাস্তি খুব হ'ল। এখন যে প্রাণ কণ্ঠাগত।

দুই প্রভু এই বলিয়া ছুটিতেছেন। আর পিছু হইতে জগাই মাধাই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে,—"থাক্ থাক্ বেটারা—জানিস্ না এখানে জগা মাধা আছে? এখন যে বড় ছুটে পালাচ্ছিস্? একবার দাঁড়া, পিছু ফিরে চেয়ে দেখ।" তাহাতে—

"ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ বলিয়া॥"

হরিদাস আর চলিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—চঞ্চলের সহিত আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালসদৃশ যমনের হাতে রক্ষা করিলেন এবার বুঝি চঞ্চলের বুদ্ধিতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়।

নিতাই বলিতেছেন—বেশ, যত দোষ বুঝি আমার। আর আমাদের প্রভুটীর কথা বুঝি ভুলিয়া যাইতেছ? তিনি যে একেবারে রাজার মত আজ্ঞা করিয়া বসিলেন। তাঁর আজ্ঞা পালন না করিলেও নয়, কিন্তু ফল ত খুবই হইতেছে, লোকে আমাদিগকে "ভণ্ড" "চোর" ব্যতীত ভাল কথাও

কিছুই বলিতেছে না। তুমিত নিজের প্রভুর দোষ দেখিতে পাওনা! আমরা দুইজনে গিয়াইত বলিলাম, এখন দোষের ভাগী হইলাম আমি একাকী।"

এদিকে জগাই মাধাই খানিক ছুটিয়া মদের ঝোঁকে পড়িয়া গিয়া ছ। কি ঘটনা হইয়াছে তাহাদের আর জ্ঞান নাই।

দুই প্রভু পিছু ফিরিয়া তাহাদের অবস্থা দেখিলেন। তখন তাঁহারা হাসিতে হাসিতে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন মদনমোহন বেশে ভক্তগণের মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই ও হরিদাস আসিলেন। নিতাই বলিলেন "প্রভু! আর আমরা তোমার আদেশ পালন করিতে যাইব না। সাধুকে ত কৃষ্ণনাম লওয়াইতে সকলেই পারে! কিন্তু যাহাদের পাতকের সীমা নাই এমন যে দুই দস্যু জগাই ও মাধাই, তাহাদিগকে যদি নাম লওয়াইতে পার তবেই তোমার বড়াই বুঝি। প্রভু, এই দুই ভাইকে কৃষ্ণনাম দিয়া তোমার পতিতপাবন নামের পরিচয় দাও।"

দয়াল নিতাইর হৃদয় আজ এই দুই পাপীর দুর্গতি দেখিয়া করুণায় পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন "প্রভু, তোমার কথায় আমরা লোকের দ্বারে দ্বারে যাই, আর তাহারা দূর দূর করিয়া খেদাইয়া আসে। তোমার ভক্ত-গণ তোমাকে চিনে, কিন্তু তাহাতে বাহিরের লোকের কি? মহাপ্রভু তখন ক্রোধভরে বলিলেন—

—"জানোঁ জানোঁ দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"

নিতাই বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি খণ্ড খণ্ডই কর আর যাই কর, সে দুই-জন উদ্ধারে বাকী থাকতে আমি আর প্রচার করিতে বাহির হইতেছি না।

নিতাইর আর্ত্তি দেখিয়া প্রভু হাসিলেন, বলিলেন "শ্রীপাদ! তুমি যাহার মঙ্গল চিন্তা করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তাহাকে উদ্ধার করিবেন।

মহাপ্রভুর বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিলেন এই দুই পাতকীর এতদিনে উদ্ধার হইল।

তখন হরিদাস, অদ্বৈত প্রভুর নিকট নিতাইর নামে নালিশ করিতেছেন। হরিদাস বলিতেছেন—ঠাকুর, প্রভু কিনা এমন চঞ্চলের সহিত আমাকে পাঠান? আমি একদিকে থাকি, তিনি একদিকে চলিয়া যান। এই বর্ষায় গঙ্গার জলে কুম্ভীর ভাসিতেছে, তিনি একবার জলে নামিলে আর উঠিতে চান না। সাঁতার দিয়া কুম্ভীর ধরিতে যান। অনেক খোসামোদ করিয়া যদি ডাঙ্গায় তুলি তবে ছোট ছোট ছেলে দেখিলে তাহাকে চোখ রাঙাইয়া ভয় দেখান। অবিবাহিত মেয়ে দেখিলে বলে বিবাহ করিব। আমি যদি ভাল কথা বলি তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া তাড়া করিয়া আসে। বলে তোর অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? আর তোর সেই চৈতন্য—যাকে ঠাকুর ঠাকুর করিস্ সেই বা আমার কি করিতে পারে? এসব কথা আমি প্রভুর নিকট আর কি বলিব তোমাকেই বলিতেছি। আর আজ দুই মাতালের হাতে দৈবক্রমে এবং তোমার প্রসাদেই প্রাণ রক্ষা পাইয়াছি।"

শ্রীঅদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ইহা আর বিচিত্র কি? যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন হয়। মাতালের সহিতই মাতালের মিলন উপযুক্ত। তিন মাতালের একত্র হওয়াই উচিত। তুমি নিষ্ঠাবান লোক, তুমি ইহার ভিতর যাইও না। নিত্যানন্দ সকলকে মাতাল করিবে। আমি উহার চরিত্র ভালরূপই জানি। তুমি ঠিক জানিও শীঘ্রই সেই দুই মাতাল এই বৈষ্ণবগোষ্ঠির ভিতর আসিবে।" বলিতে বলিতে শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধাবেশ হইল। তিনি দিগম্বর হইয়া নানাকথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"চৈতন্যের সকল কৃষ্ণভক্তির কথা

শুনিব, চৈতন্য কেমন নাচে গায় তাহার শক্তিও দেখিব। দেখিও কাল দুই মাতাল আসিবে নিমাই ও নিতাই তাহাদের সহিত মিলিয়া নাচিবে। সেই দুইজন সকলকে একাকার করিবে, চল অমরা দুইজনে জাত লইয়া এখান হইতে পলাইয়া যাই।" শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ দেখিয়া হরিদাস হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন জগাই মাধাই উদ্ধার হইল। শ্রীঅদ্বৈতের কথা বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে? কেবল অদ্বৈতের শক্তিতে হরিদাস তাঁহার কথা বুঝিলেন।

জগাই মাধাই নগরের স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া বাস করিত। এইরূপে দৈবযোগে তাহারা এই ঘটনার পর গঙ্গার ঘাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে জগাই মাধাই দু'জনের ভয়ে একাকী কেহই বাটীর বাহির হইতে পারে না। রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছে, বাদ্য শুনিয়া জগাই মাধাই দেখিতে আসিল। দুইভাই মদে একেবারে চুর হইয়া আসিয়াছে। দ্বারে কপাট দেওয়া আছে, তাহারা ঢুকিতে পারিল না। বাহিরে থাকিয়া কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া তালে তালে নাচিয়া তাহারা সারা নিশি যাপন করিল। ক্রমে প্রভাত হইল। ভক্তগণ কীর্ত্তন শেষ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন সম্মুখে জগাই মাধাই। সাক্ষাৎ বিভীষিকা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নিমাই চাঁদ এক পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। দুই ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, নিমাই পণ্ডিত! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? একি মঙ্গলচণ্ডীর গান? আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে! আমাদের বাড়ীতে যাইয়া তোমাকে একরাত্রি গান গাহিতে হইবে। "নিমাই বা তাঁহার ভক্তগণ একথার কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহারা "ধরিল" "ধরিল" এই কথা বলিয়া পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গায় নাইতে চলিয়া গেলেন।

ভক্তের ভগবান। নিমাই পণ্ডিতকে জগাই মাধাই তাহাদের বাড়ীতে আহ্বান করিলেন। ইহাতেই তাহাদের উদ্ধারের সূচনা হইল। সে কিরূপ পরে বলিতেছি।

ক্রমশঃ

ডাঃ—শ্রীভোলানাথ ঘোষ দাস।

সত্যদর্শন

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

(৬)

পূর্ব্ব হইতেই আছে এমন রতি মিলনাভাবে প্রিয়াকে যে অসম্পূর্ণ বা অভাবময় অবস্থায় লইয়া ফেলে তাহাই পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বস্থিত অনুরাগ-জাত বলিয়াই উহার নাম পূর্ব্বরাগ। অন্তরে প্রিয়তত্ব মূর্ত্ত, বাহিরে প্রত্যক্ষে প্রিয় নাই; চিত্তে প্রিয়ের আকর্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষবিশ্বে প্রিয় অপ্রকাশিত, ইহাই পূর্ব্ব-রাগের অবস্থা। প্রিয়শূন্য বিশ্বের ভাব চিত্তে প্রবেশ করিয়া তত্র প্রতিষ্ঠিত প্রিয়ভাবের সহিত দ্বন্দে মাতিয়া চিত্তে ক্ষোভ উৎপন্ন করে। ইহা যেন প্রিয় ও অপ্রিয়ের দ্বন্দ, দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের একত্রা-বস্থান; ভিতরে প্রিয় বাহিরে প্রিয়শূন্য বিশ্ব, ভিতরে আলোক বাহিরে অন্ধকার, এ যেন আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ। ভিতরে অমৃতের

পূর্ব্বরাগ।

অনুভব, বাহিরে উহার অন্বেষণ, এবং তজ্জনিত ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতাই অন্তরস্থ মাধুর্য্যের মূর্ত্ত পরিমাণ। প্রেমময়ের প্রেম বা আকর্ষণ ব্যাকুলতার আকারে এই রসে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে। কৌশলে মনোভাব প্রকাশ, স্মৃতি উদ্‌ঘাটন, চিন্তা, প্রবল আসক্তি, নানা সংকল্প, বিশ্রামহীনতা, কৃশতা, বিষয়-নিবৃত্তি বা অপর বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা, লজ্জা-হীনতা, দুর্নিবার অভিলাষ, উদ্বেগ, বিলাপ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, ব্যাধি, মোহ বা মুর্চ্ছা, এবং সময়ে সময়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রসের প্রকাশের সীমা।

পূর্ব্বরাগের পরই সংক্ষিপ্ত মিলন। এ মিলনে সন্দেহ বর্ত্তমান থাকে, লজ্জারূপে বাধা উৎপাদন করতঃ মিলনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ত মিলন।

প্রিয় ও প্রিয়া এক অখণ্ড তত্ত্ব। কিন্তু যখন প্রিয়ের স্নেহ প্রিয়াকে বিগলিত ও প্রসারিত করিয়া ফেলে, তখন স্বতঃই, প্রিয়ত্বের সেই সঙ্গে সমভাবে প্রসারণ ঘটে না বলিয়া, প্রিয়াতে ঈর্ষা উৎপন্ন হইয়া উভয়কে খণ্ডিত করিয়া ফেলে। তখন প্রিয় প্রিয়ার প্রত্যক্ষ হইলেও পরস্পর অমিলনে বা বিয়োগে অবস্থান করেন। এ যেন বাহিরে আলোক ভিতরে অন্ধকার। প্রিয়া আপন প্রণয়কে প্রিয়ের স্নেহ অপেক্ষা বিস্তৃত দেখিয়া মানিনী হয়েন। সম্মুখে প্রিয় উপস্থিত, কিন্তু সন্দিগ্ধ অনুভবে তাঁহার প্রিয়ত্ব মলিন, অথচ দ্বিতীয় প্রিয় নাই বলিয়া মিলনের জন্য ব্যাকুলতাও সেই সঙ্গে বিদ্যমান। যাহার জন্য তৃষ্ণা তাঁহা অপেক্ষা তৃষ্ণারই বাহুল্য বা আধিক্য, এ বুঝি সঙ্কুচিত প্রিয়কে বিস্তৃতরূপে দেখিবার জন্য অভিমান! এই মানের কম্পনে সঙ্কুচিত প্রিয়ের এবং তদুত্থিত রসের প্রসারণ সাধিত

মান বা খণ্ডিত রস।

হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রসারণ না হয় ততক্ষণ মিলন হয় না। মানে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহা উদাসীনতা-শঙ্কা-চাপল্য ক্রোধ-গর্ব্ব-দোষকল্পনা-আত্মগোপন-গ্লানি-দুশ্চিন্তা প্রভৃতি স্থূলবিকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার এই মানোপশমের জন্য প্রিয় যেমন প্রসারিত হইতে থাকেন, তেমনি তাঁহার প্রসারণ কম্পনে প্রিয়াও সঙ্কুচিতা হইতে থাকেন। বিনয় প্রকাশ, নিজ মহিমাখ্যাপন, কৌশলে সন্তোষসাধন চেষ্টা, শরণ গ্রহণ, উপেক্ষা প্রকাশ এবং আকস্মিক ভয় উৎপাদন প্রভৃতি ভাবে মানোপশম সাধিত হয়।

সঙ্কীর্ণ মিলন।

মানোপশমের পর সঙ্কীর্ণ-মিলন ঘটিয়া থাকে। সঙ্কুচিত প্রিয়ের প্রসারণ এবং প্রসারিত প্রিয়ার সঙ্কোচন, উভয়ের এই উভয় প্রকার গতির মধ্যপথে যে মিলন, উভয়েই পথিমধ্যে থাকায় অত্যন্ত অল্পকালের জন্য সঙ্কীর্ণ ভাবেই হইয়া থাকে।

প্রেমবৈচিত্ত্য।

মানোপশমে সঙ্কুচিতা প্রিয়া ক্রমপ্রসারণশীল প্রিয়ের প্রিয়ত্বকে আর আপনার সঙ্কুচিত আশ্রয়ে যখন ধরিয়া রাখিতে পারে না, উহা কেবলই বাড়িয়া চলে, তখন প্রেমবৈচিত্ত্যের অবস্থা। এই রসে প্রিয়ের অঙ্কে স্থাপিতা প্রিয়া বিরহে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ইহা অনুরাগের পরমোৎকর্ষ ভাব! প্রিয় প্রতিক্ষণে প্রিয়ার দৃষ্টিতে কেবলই নূতন হইতে থাকেন। প্রিয়ার সঙ্কুচিত আধারে অনন্ত নূতনত্বের ক্রমবর্দ্ধনশীল বিকাশ যেন আর ধরে না, প্রিয়া তখন আপন আয়ত্বের অতীত প্রিয়কে ক্ষণে ক্ষণে হারাইয়া ফেলেন! প্রিয় যতই প্রসারিত হন, প্রিয়াও ততই হারায়। প্রিয় অঙ্কে প্রিয়া তাই কেবলই বিরহ অনুভব করেন! রসশাস্ত্র প্রেমবৈচিত্ত্য রসোদ্ভূত যে সকল মহাভাব

বিকারের কথা বলিয়াছেন এ জগতে তাহা অতুলনীয়, আ ম আজ আপনাদের অবগতির জন্য উহার উল্লেখমাত্র করিব, বুঝাইবার দুষ্প্রয়াস আমার নাই; আমারই যাহা হৃদ্গত হয় নাই, কেমন করিয়া আমি তাহা আপনাদের হৃদ্গত করাইব?

প্রেমবৈচিত্ত্য রস হইতে পরম অমৃতোপম মহাভাবের উদয় হইয়া থাকে। রূঢ় এবং অধিরূঢ় এই দুই ধারায় উহার গতির প্রকাশ হইয়া থাকে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রকাশই রূঢ় আখ্যায় অভিহিত হয়। তখন মধুরতম প্রিয়ত্ব মণ্ডিত প্রিয়কে অনিমেষনয়নে দেখিবার আকাঙ্খা হয়; যদি দর্শনকালে অক্ষিপক্ষ উহার স্বাভাবিক পতনের দ্বারা দর্শনে বাধা দেয়, তাহাও তখন অসহ্য হইয়া পড়ে। দেখিয়া দেখিয়াও আশা মেটে না, কল্পকাল ধরিয়া দেখিলেও, অধিকক্ষণ দেখিতেছি মনে হয় না। প্রিয়ের সুখেতেও প্রিয়ার মনে দুঃখের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় দেহ ক্ষীণ এবং চিত্ত অধীর হইয়া পড়ে, নিমেষের ক্ষণমাত্র অদর্শন যেন কতদিনের অদর্শন বলিয়া বোধ হয়। এই রসাশ্রিতা প্রিয়ার নিজ চিত্তক্ষোভের কথা দূরে থাকুক, অপর কেহ তাঁহার নিকটে থাকিলে তাহারও চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রূঢ় মহাভাব পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবের দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলা হয়। তদাশ্রিতা প্রিয়ার সুখ ও দুঃখের সহিত যদি সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাণীর সমবেত সুখ ও দুঃখের তুলনা করা হয়, তবে উহা সাগরের জলরাশীর সহিত জলবিন্দুর তুলনার মত হইবে।

মোদন এবং মাদন এই দুই ভাবে অধিরূঢ় মহা ভাবের প্রকাশ। এখানে পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক প্রকাশ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে কেমন? চিত্ত সত্ত্বগুণাবলম্বন করতঃ চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করিলে প্রাণ দেহস্থিত পঞ্চভূতের এক বা একাধিক ভূতাশ্রয় করিয়া দেহক্ষোভ উৎপন্ন

করে। যথা, ক্ষিতি অবলম্বনে স্তম্ভ বা জড়তা, অপ বা রস অবলম্বনে অশ্রু-প্রবাহ, তেজ অবলম্বনে স্বেদ বা ঘর্ম্ম এবং বৈবর্ণ্য, বায়ু অবলম্বনে রোমাঞ্চ কম্প ও স্বরভেদ, এবং আকাশ অবলম্বনে মূর্চ্ছা বা সমাধী অথবা প্রলয়। এই অষ্টবিধ চিত্ত এবং দেহ ক্ষোভক লক্ষণগুলিকে সাত্ত্বিক বিকার বলে। অত্যন্ত প্রকাশিত অথচ গোপনযোগ্য দুই একটি লক্ষণের সমাবেশের নাম ধুমায়িত সাত্ত্বিক ভাব। কষ্টে গোপন করা যায় এমন দুই তিনটি লক্ষণের সমাবেশকে জ্বলিত স্বাত্ত্বিক ভাব, গোপন করা যায় না এমন চারি পাঁচটি লক্ষণের যুগপৎ উদয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্তির নাম দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। আর উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবে ছয় সাত কিম্বা আঠটী লক্ষণই যুগপৎ উদিত, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি উত্তরোত্তর বাড়িয়া অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিলে উহাকে সুদ্দীপ্ত প্রকাশ বলা হয়। প্রিয়ার সাত্ত্বিকভাবের এই সুদ্দীপ্ত অবস্থা দর্শনে প্রিয়ের চিত্তে আনন্দোন্মাদ বা দিব্যোন্মাদ আনিয়া দেয়। যদি প্রিয় দূরে থাকিয়া লোকমুখে প্রিয়ার এই অবস্থার কথা শুনেন, তখনই তাঁহাতে মোহ অথবা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রিয়ার এই ভাব সাক্ষাদ্দর্শনে প্রিয়ে মোদন এবং লোকমুখে শ্রবণান্তর এই মোদন (ই) মোহনরূপে প্রতিভাত হয়। প্রিয়ের সুখবিধানের জন্য প্রিয়ার স্বচ্ছন্দে অসহ্য দুঃখ স্বীকার এই মহাভাবের একটি অঙ্গ। সম্পূর্ণা প্রিয়াতে এই যে প্রকার চেষ্টা উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বস্থিত সমগ্র প্রাণী-জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং সর্ব্বত্রই ক্ষোভ বিকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই নাম মাদন। এই অবস্থায় প্রিয়া সর্ব্বভূতে এমন কি জড়েও প্রিয়কে দর্শন করেন, এবং কেবল আপনার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আপনার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রিয়ের প্রকাশময় সর্ব্বভূতে মিলিত হইতে চাহেন, যদি তাহাতেও প্রিয়কে ধরিতে পারেন!

ইহার পর যে মিলন তাহাতে এক প্রিয়া অনন্ত হইয়া পড়েন, এবং অনন্ত প্রসারিত প্রিয়ের সহিত অনন্তভাবে মিলিতা হইয়া,—

সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ মিলন।

প্রতিক্ষণে নূতনত্ব প্রাপ্ত প্রিয়ের সহিত প্রতিক্ষণে নূতন হইয়া মিলিয়া ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যে সম্পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন, তাহারই নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। এ জগতে ইহার তুলনা না থাকিলেও অবশ্যই কেহ এ রস উপলব্ধি করিয়াছেন। নতুবা এ রসের নামই বা কে আনিল? বর্ণনাই বা কে করিল? আমরা না জানিলেও, নিশ্চয়ই সেরূপ কেহ আছেন, এবং তাঁহার কৃপা হইলেই আমরাও এ রসের সন্ধান এবং পরিচয় পাইব! প্রেমময়ের প্রেমলীলা কখনই অসম্পূর্ণ রহিবে না!

প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রত্যক্ষ দেশ ব্যবধান বা স্থানের দূরত্ব হেতু

প্রবাস।

যখন প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর মিলিত হইতে পারে না, আপনাপন প্রেমোত্থিত অনুভব সকল প্রেরণ করতঃ পরস্পর বিচ্ছেদ দুঃখ অপসারণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহারই নাম প্রবাস। এ অবস্থায় উভয়েই সঙ্কুচিত, কিন্তু কেহই এ সঙ্কোচন রাখিতে ইচ্ছা করেন না, উভয়েরই মধ্যে একটি তীব্র প্রসারণ চেষ্টা থাকে। প্রিয়া, এই অবস্থায় যে স্বতন্ত্র দেহ এই বিচ্ছেদের কারণ হয় মধ্যে মধ্যে তৎপ্রতি একান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবদেহ সহায়ে প্রিয় অভিমুখে ধাবিতা হয়েন, এবং প্রত্যক্ষ দেহটিকে সমাধিতে রক্ষা করেন; এই অবস্থার

সমৃদ্ধিমান মিলন।

পর যে মিলন উহা প্রাণহীন দেহে প্রাণের নব সঞ্চারের মত অত্যধিক শক্তিময়, অপরিমেয়, উচ্ছ্বাসময় হইয়া জাগতিক বিধি নিষেধের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, এবং সমগ্র বিশ্ব উহার প্রবাহে ডুবিয়া গিয়া বৈচিত্র্যহীন বহুত্বরহিত স্বাতন্ত্র্য শূন্য এক হইয়া যায়! তখন সকলই অন্তর্মুখ— সকলই মহাকারণ নিমগ্ন!

"হের এ নিকুঞ্জে মধুর যুগল মিলন রে !
রাধাশ্যাম ! রাধাশ্যাম ! বল আনন্দ বদনে রে !!
দোঁহার ভাবে দোঁহে ভোর হসিত আনন রে !
নয়ন ভাসিছে যেন অমিয়া সাগরে রে !!
দেহভাব নাহি মনে, জ্ঞানের অতীত রে !
কোথা ছার এ সংসার ডুবিয়া গিয়াছে রে !
অভাব নাহিক হেথা, প্রেমানন্দ পূর্ণ রে !
আঁধার ঘুচায়ে উঠে তুরীয় আলোক রে !
জ্ঞান-যোগ-ধ্যানানন্দ প্রেমেতে মিশাল রে !
চরণসরোজে হের জুটিল সকলি রে !
মহাকারণ আনন্দে ভাসিছে সংসার রে !
দীনের দীনতা গেল হারায়ে আপনা রে !"

এ মিলন সবিশেষে নির্ব্বিশেষ,—সাকারে নিরাকারে,—রাধায় শ্যামে ! একদিন এই বিশ্ব ওই মিলনে ছিল, তখন ভাবরূপে ছিল। সেই ভাবজগৎ বা ভাবরূপী বিশ্বে এখনও আছে, তবে বহির্মুখতাপ্রযুক্ত সেই সেই ভাবজগতের উপর মায়ার একটি কঠিন আবরণ পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্ব তাহাই। কিন্তু আপন স্বভাব বিশ্বের অন্তরে নিয়ত বর্ত্তমান, তাই মায়ার আবরণরূপ দেশব্যবধান ইহাকে স্থির থাকিতে দিতেছে না ! সমগ্র বিশ্ব তাই চঞ্চল হইয়া খুঁজিতেছে,—বাহিরেই খুঁজিতেছে,—সে যে বহির্মুখ, তাই বাহিরেই খুঁজিতেছে। কোন্ প্রবাসে তাহার প্রিয় অবস্থিত ! সে প্রিয়কে ভুলিতেও পারিতেছে না ! পাইতেছেও না !! প্রত্যক্ষ সমগ্র বিশ্ব এই বিপ্রলম্ভরসে নিমজ্জিত !

ওই মিলনই বিশ্বকে পাইতে হইবে। ওই মিলনই—বিশ্ববাসী জানুক আর নাই জানুক—তাহাদের সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য। মিলনই

যে তাহার লক্ষ্য, তাহা মানবের স্বভাবেই প্রকাশিত। প্রত্যেক মানবই মিলন চাহে, কিন্তু মিলনকেন্দ্র কোথায় তাহা না জানাতে, স্বতন্ত্র মানব কেহ কাহারও সহিত মিলিত হইতে পারে না; বরং পরস্পরের স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইবার চেষ্টায় একে অপরকে আঘাত করে ও প্রতিঘাত লাভ করে, এবং এইপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে মিলনের পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন বিরোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্বে বহির্মুখ মানবের সকল মিলন চেষ্টারই এইরূপ পরিণতি! তথাপি মানবের মিলন-চেষ্টারও বিরাম নাই!

আমাদের কি মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই? আছে, আমরা মিলনকে সত্য করিয়া বুঝিতে পারিলেই আমরা মিলিত হইতেও পারিব। আমরা প্রত্যেকেই সত্য করিয়া আকর্ষণপথে সেই আকর্ষণসত্ত্বা কৃষ্ণের সহিত —সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইতে পারি। যখন সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, তখন পরস্পরের পৃথক-মিলনের আর প্রয়োজন থাকিবে কি? এক মিলন-কেন্দ্রে,—যাঁহাতে সকলেই আকৃষ্ট, সুতরাং পরোক্ষভাবে মিলিত আছেই,—সকলে উপস্থিত হইলে, কোন পৃথক চেষ্টা না করিয়াও সকলেই আপনাআপনি মিলিত হইয়া যাইবে। ইহাই সত্য মিলন! এ মিলনে বিরোধ নাই!

সেই মিলনকেন্দ্র কোথায়? এ বিশ্বে তাঁহার প্রকাশ কোন্ স্থানে? নামরূপে বিচিত্র এই বিশ্বে নামরূপেই তাঁহাকে প্রথমে ধরিতে পারা যাইবে। প্রণবই সেই নাম-রূপ।

"সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই বিষয়ও আশ্রয়রূপী যুগলের সম্মিলিত রূপই প্রণবস্বরূপ, এবং উহার উচ্চারণই সেই নাম! যদি উহাকে আরও পরিস্ফুট দেখিতে চাও,

তবে দেখ সেই সচ্চিদানন্দ সমগ্র বিশ্বের অন্তর আকর্ষণ করিয়া,—হরণ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াই আজ বিশ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; সুতরাং বিশ্বসমক্ষে তাঁহার এই রূপই 'হরি' রূপ। ইহাই প্রণবের পরিস্ফুট রূপ। 'হ' শব্দে তাঁহার নির্ব্বিশেষ ভাব, এবং 'র' শব্দে তাঁহার সবিশেষ ভাব; এতদুভয় ভাবের একত্রে বর্ত্তমানতা এই 'হরি' শব্দেই প্রকাশিত। অস্তি অর্থেই উহাতে 'ই' সংযুক্ত! ওঁ হরি ওঁ !! *

* সত্যদর্শন প্রথম ভাগ শেষ হইল, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে লেখাটা একটু কঠিন ভাবের হওয়ায় কোন কোন পাঠক আমাদিগকে অনুযোগ করিয়াছেন। রসতত্ত্ব আলোচনা কঠিন ব্যাপার, লেখক সাধ্যমত সরল করিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতেছি বহু পাঠক বেশ সন্তুষ্ট হন নাই। যাহা হউক ইহার পরে প্রেম-ধর্ম্ম নামক দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থিত প্রকাশ বন্ধ রাখিলাম। পাঠকগণের আগ্রহ বুঝিলে পরে প্রকাশ আরম্ভ করিব। লেখক মহাশয় আশা করি তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না। (ভঃ সঃ)

ষড়রিপু।*

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ঘোষ, ই, এম, ডি,)

ইন্দ্রিয়গণ সংযত কর গো তোমার।
রিপু ছ'য়ে বলি দেও হ'য়ে তৎপর॥
যদি বল রিপুচয় বড়ই প্রচণ্ড।
কিরূপে তাদের আমি করি লণ্ডভণ্ড॥
তাহার বিশেষ কথা শুনহ এখন।
যেই রূপে ষড়রিপু হইবে দমন॥
বিকার রহিত গৃহে পাঠাও কামেরে।
শান্তি হ'বে না, হইবে বৃদ্ধি পুনর্ব্বারে॥
ক্রোধেরে দিবেক ল'য়ে ক্ষমার আবাসে।
তাহ'লে পাইবে তুমি সুখ অনায়াসে॥
লোভ, মোহ বাঁধিবে যে বিবেক প্রস্তরে।
ঘুচিবেক অপযশঃ, যশ হবে পরে॥
মদ, মাৎসর্য্যে ধৈর্য্য ত্যাগ কুণ্ডে ফেল।
তরিতে ভবের মাঝে না রহিবে জংল॥
নারায়ণ সদা স্মর যদি চাও মুক্তি।
অভয় দানিয়া কোলে লবে আত্মাশক্তি॥

---

* বিগত ফাল্গুন মাসে ষড়রিপু প্রকাশ হয়, নকলকারীর ভ্রমবশতঃ এই অংশটুকু প্রকাশ হয় নাই। পাঠকগণ ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত ষড়-রিপুর পরে এইটুকু মিলাইয়া লইবেন। (ভঃ সঃ)

(২৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ)